দ্বিতীয়া
ও
অন্যান্য গল্প

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সংকেত ভবন
৩ শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রিট
পোঃ আঃ এলগিন রোড
কলিকাতা
প্রাপ্তিস্থান

প্রকাশক :
শ্রীবিমলচন্দ্র দত্ত, 'সঞ্চয়ন পাবলিশার্স', ৮৪।এ, ক্লাইভ ষ্ট্রিট, কলকাতা



প্রথম সংস্করণ : ১৩৫০
দাম দু' টাকা বারো আনা

মুদ্রাকর : শ্রীবিজয় রায় "ভবানীপুর প্রেস"
৩৯, আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলকাতা

শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু-কে

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের অন্যান্য গ্রন্থ :

কবিতা

শবরী, মৈনাক, শিবির,

সোনার কপাট,

রাজধানীর তন্দ্রা

ছোটোগল্প

শ্মশানে বসন্ত,

কানামাছি

উপন্যাস

পূর্বরঙ্গ

ছোটোদের গল্প

ছাতুবাবুর ছাতা,

ছায়ামূর্তি,

ঘনশ্যামের ঘোড়া

গল্পগুলি ১৯৩৮-এর সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪৩-এর জুন—এই ছ-বছরের মধ্যে নানা সময়ে লেখা। প্রত্যেকটি গল্পই ইতিপূর্বে নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। শেষ গল্প 'কানামাছি' শ্রীপ্রতিভা বসু সম্পাদিত 'ছোটোগল্প' সিরিজে সম্পূর্ণ একটি বই হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিলো এবং উৎসর্গ করা হয়েছিলো শ্রীযুক্ত অশোক মুখোপাধ্যায়-কে।

প্রচ্ছদপটের ছবিটি এঁকে দিয়েছেন শ্রীযুক্ত বংশীলাল চন্দ্রগুপ্ত। তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

দ্বি তী য়া

সা প

গ লি

মা টি

নে শা

মৃ ত দে হ

রা হু

দ য়া

মৃ ত্যু তি থি

ব ট গা ছ

টি বি

কা না মা ছি

দ্বিতীয়া

কে জানতো অতুল আবার বিয়ে করবে! বন্ধু ও আত্মীয়দের অসংখ্য অনুরোধের উত্তরে যে শুধু ফিকে হেসে অন্য বিষয়ে কথা পাড়তো, হঠাৎ যে তার কাছ থেকেই এ-খবর পাওয়া যাবে, প্রথমে এ-কথা বিশ্বাস করাই যায় না। পৃথিবীতে কত আশ্চর্য ঘটনাই না ঘটে!

অতুল লিখেছে: কাকিমা, জয়পুরেই শুভকাজ শেষ হবে। এখান থেকে তোমার বৌমাকে নিয়ে সোজা ল্যান্সডাউন রোডে উঠবো। আমার বিশেষ ইচ্ছে বৌভাত ইত্যাদি যে-সমস্ত সামাজিকতা নিতান্তই আবশ্যক তোমাদের ওখানেই সুসম্পন্ন হয়। জানোই তো এ-বার আমোদ-আহ্লাদের জন্য এ-সব নয়, নিতান্তই কর্তব্যবোধে……ইত্যাদি।

চিঠিটা পড়ে জয়া খুব খুসি।

পুরন্দরকে বললো, "হ্যাঁ গো, তারিখটা দেখো দিকিনি ওরা কবে আসবে। মাগো, আজকালকার ছেলেদের নিয়ে তো পারবার জো নেই। পাঁজি না হয় না-ই মানবি বাপু, তবু এ-সব শুভকাজে গুরুজনদের খুসি করবার জন্যেও অন্তত……"

অতুলের রুগ্ন হাবা ছেলেটির কাছে গিয়ে সে বললো, "জানিস খোকোন, তোর নতুন মা আসছে যে।" জয়ার চোখ জলে ছলছল করে উঠলো।

নির্বোধ শিশু কিছু বুঝলো না। অবুঝ চোখে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো।

জয়ার উৎসাহের সীমা নেই। অতুলের কাছে হয়তো কোনো রকম

উৎসবই এবারে নিষ্প্রয়োজন কিন্তু, আহা, যে-মেয়েটি চেলি পরে নতমুখে এখানে এসে দাঁড়াবে তার জীবনে এই-ই তো প্রথম উৎসব। তা-ছাড়া সেই সব বিগত দিনের কথা স্মরণ করে অতুলের মন সেদিন নিশ্চয়ই ভারি হয়ে উঠবে, হৈ-চৈ ও আনন্দ-কোলাহলের আবহাওয়ায় তবু যতটা তাকে ভুলিয়ে রাখা যায়—

বাড়িটা রীতিমতো সাজানো হয়েছে।

অনেক আত্মীয়-স্বজন এসেছে। আগামীকাল ভোরেই অতুল তার নব-বধূকে নিয়ে পৌঁছবে। মঙ্গল-ঘট থেকে সানাই পর্যন্ত কিছুরই অভাব নেই। তিনতলার সবচেয়ে ভালো ঘরটা ফুলশয্যার জন্যে নিখুঁতভাবে সাজানো হয়েছে। তার পাশের ঘরটিতেই নতুন-বউ এসে সেদিন থাকবে।

নারী-সুলভ কৌতূহলেরও জয়ার শেষ নেই। রাত্রে পুরন্দরকে বললো, "হ্যাঁ গো, তোমাকে যে মাইক্রোফোনের কথা বললুম, সেটার খেয়ালই নেই, কেমন ? এতো তুমি ভুলে যাও ! তোমাকে নিয়ে পারিনা বাপু। মেয়েরা সবাই এসেছে। ঘরে বসে কি রকম মজা করে আড়ি পাততুম বল দিকিনি ?"

হেসে পুরন্দর বললো, "নতুন আর কী শুনতে বল ? আমাকে তুমি যা বলেছিলে, কিংবা বীণাকে অতুল যা বলেছিলো, সেই পুরনো কথাগুলোই নতুন করে আবার শুনতে : তোমাকে ভারি ভালোবাসি কিংবা, বীণাকে কি আর সত্যিই ভালোবাসতুম ? কাকা-কাকিমা নেহাৎ জোর করে বিয়ে দিয়েছিলেন বলেই তো······" পুরন্দর অতুলের গলা নকল করতে চেষ্টা করলো। "মাইক্রোফোনের কথা ভুলে গিয়েছি। ভালোই হয়েছে।"

সকাল ছ-টাতেই অনেকগুলো মোটরকার আর ট্যাক্সি বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো। সানাই উঠলো বেজে, মেয়েরা বাজালো শাঁখ। জয়া তুড়তুড় করে একতলায় নেমে এলো। ভিড় করে এলো মেয়েরা। পুরন্দর ষ্টেশনে গিয়েছিলো। সে নামলো মাঝের বড় গাড়িটা থেকে আর সেই

সঙ্গে প্রায় লাফিয়ে নামলো অতুল : পরনে দামি-স্যুট। সে-গাড়িতেই নতুন বউ রয়েছে : সাড়ির উপর ওভারকোট, গলায় সিল্কের মাফলার। জয়া ছুটে এলো : ওমা এই বউ! রঙ ময়লা, বয়েস বাইস-তেইসের কম নয়। রুক্ষ চুলগুলো খানিক এলোমেলো। কপালে চন্দন নেই। মুখে পাউডার, ঠোঁটে লিপ-ষ্টিক, হাতে ভ্যানিটি-ব্যাগ। এ কেমন বউ?

অতুল খুসিতে টলমল করছে। "কাকিমা," জয়ার কাছে এসে সে বললো, "তোমাদের মেয়েলি কাণ্ডগুলো কিছু কমিও। কাল ওর একটু ঠাণ্ডা লেগেছে, জলে-টলে বেশিক্ষণ না দাঁড়ানোই ভালো। আর ট্রেনে তো এতোটুকু বিশ্রাম পায়নি। ছেলে-মানুষ, ঘুম-টুম একটু বেশি দরকার।"

জয়া প্রথমে একটু চমকে উঠলো। সামলে নিলো পরক্ষণেই। "যা-না, তোকে আর জ্যাঠামো করতে হবে না। কি বেশেই এসেছিস! আজকের দিনে ধুতি পরলে কি জাত যেতো? এখন গাঁটছড়া বাঁধি কী করে?" নব-বধূর হাত ধরে সে বললো, "এসো বৌমা···এই অতুল, নে আঁচলের এই খুঁটটা ধর্।" অতুল একমুখ হেসে আঁচল ধরে বললো, "আহা, দেখো-দেখো, হোঁচট খেয়ে পোড়ো না।"

শাঁখ বাজছে, সানাই বাজছে। দরজা ধরে জয়ার বড় মেয়ে দাঁড়িয়ে। সবারেও সে দরজা ধরেছিলো।

"দোর-ধরুণী কৈ?···"

"কেরে, সানু?···বেশ-বেশ, কটা নোট নিবি?" মনি-ব্যাগটার ভেতর থেকে অনেকগুলো নোট অতুল বার করলো।

থতমত খেয়ে সানু একদিকে সরে গেলো।

মেয়েরা উলু দিচ্ছে। দোতলায় বধূ-বরণের জায়গায় তারা এসে থামলো। সানুই তার বৌদির পা থেকে হাই-হিল জুতোটা খুলে দিলো। এখানে দুধে-আলতায় দাঁড়াতে হবে।

"কাকিমা, দেখো ওর শরীর ভালো নয়। সর্দি হয়েছে। জলে-টলে

বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হলে আবার আমাকেই ভুগতে হবে।...কাকাবাবু, কাকাবাবু কোথায় গেলেন! দেখিয়ে দিন না কী করে দাঁড়াতে হয়। এ-সব তো আপনাকেও আগে ভুগতে হয়েছে।" জয়া অবাক হোলো। অতুল হঠাৎ এ-রকম মুখর হোলো কী করে? কাকাকে ভুগতে হয়েছে, কিন্তু তাকেও কি হয়নি?

এমন সময় গুটি পাঁচ-ছয় কুঁচোকুঁচো ছেলেমেয়ে নিয়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে শান্তি এসে দাঁড়ালো। "আসতে আমার কী দেরিই হোলো গো! সেই কোন ভোরে উঠে, ঘর-দোর নিকিয়ে, রান্নার উজ্জুগ করে, কত্তার চা করে দিয়ে...আসতে কি আর পারি কাকিমা!" শান্তি সত্যিই হাঁপাচ্ছে। কোলে মাস ছয়েকের শিশু। শীর্ণ তার দেহ, চোখের কোলে কালি, পরনে গরদের লালপেড়ে কোঁকড়ানো সাড়ি। তার দীপ্তিহীন চোখ আর শীর্ণ দেহ আজ যেন উৎসাহে হঠাৎ জ্বলজ্বল করছে। "কাকিমা, রিক্সভাড়াটা পাঠিয়ে দাও না।" আবার একটু থেমে, "কৈ গো, আমাদের বৌ কোথায় গেলো?"

অতুল এতোক্ষণ অস্বস্তিতে অস্থির হয়ে উঠছিলো। কাকিমার যেমন কাণ্ড! অত করে লেখা হোলো শান্তিকে আজকের দিনে যেন খবর না দেওয়া হয়, আর তাকেই কিনা...! না আছে এর কাণ্ডজ্ঞান, না আছে বুদ্ধিশুদ্ধি। পরে একদিন বৌকে নিয়ে না হয় নিজেই সে একবার দেখা করে আসতো। তবু আবহাওয়াকে লঘু করার জন্যে সে বললো "তুই চশমা নে শান্তি। জ্বলজ্যান্ত মানুষটা পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর তুই চারদিকে বৌ-কৈ বৌ-কৈ করে অস্থির হয়ে উঠেছিস!"

এতোক্ষণে শান্তি নব-বধূকে আবিষ্কার করেছে। "ও, এই আমাদের বৌ!" একটু থেমে, "তা কী করেই বা চিনবো বল দাদা, না আছে মুখে চন্দন, না আছে লাল চেলি।" আরো একটু থেমে একটু ইতস্তত করে, "...আমি ভেবেছিলুম আরো কচি হবে। বীণা যখন এসেছিলো এর চেয়ে..."

শান্তি কথা শেষ করতে পারলো না। অতুল তাড়া দিলো,— "কাকিমা, কতক্ষণ আর দাঁড় করিয়ে রাখবে? না-ও না বাপু চট করে। ঠাণ্ডা লাগলে তখন আমাকেই তো···"

"অমন করছো কেনো দাদা," অনুযোগের সুরে শান্তি বললো, "ওতে যে অমঙ্গল হয়! আজকের দিনে এ-সব করতেই হবে। কোট-পেণ্টুলুন পরলেও তুমি তো আর সত্যি সায়েব হয়ে যাওনি।" তার কোলের ছেলেটা এমন সময় চীৎকার করে কেঁদে উঠলো। "আর পারিনে বাপু, এ এক ঝকমারি! ···আহা ষাট্-ষাট্, বেস্পতিবার সকালে কি বললুম গো···"বলতে-বলতে দ্রুতপায়ে শান্তি পাশের ঘরে চলে গেলো।

বরণ শেষ হোলো। ফর্‌সা কাপড়ের উপর আলতার গোলাপি ছাপ ফেলে নব-বধূ এগিয়ে গেলো। শাঁখ বাজছে, সানাই বাজছে, মেয়েরা উলু দিচ্ছে।

"কাকিমা এবার চায়ের বন্দোবস্ত কর দিকিনি। ওর আবার সকাল-সকাল চা না পেলে মাথা ধরে।" তেতলার ঘরে গিয়ে অতুল বললো।

চায়ের কথা জয়ার মনেই ছিলো না। তাড়াতাড়ি বন্দোবস্ত করতে বেরিয়ে গেলো। ঘরে অনেক ছেলেমেয়ের ভিড়। অতুল ধমক দিয়ে উঠলো, "এই, তোরা গোলমাল করিসনে।" কয়েকজন কিশোরী মেয়ে যারা নব-বধূর সঙ্গে আলাপ করবার চেষ্টা করছিলো, অতুলের ধমক শুনে মুখে কাপড় দিয়ে হাসতে লাগলো। কে একজন মুখরা কি একটা অস্পষ্ট টিপ্পনি কাটলো। এমন সময় জয়া ফিরে এলো, পিছনে শান্তি। আঁচলটা সে কোমরে জড়িয়েছে।

বৌয়ের কাছে গিয়ে নিতান্ত অন্তরঙ্গ সুরে সে প্রশ্ন করলো, "তোমার নাম কি ভাই?"

"সুষমা।" এই বোধ হয় নব-বধূর প্রথম কথা।

"আমার দেওরের কোলের মেয়েটির নামও সুষমা। কিন্তু ও নাম হলে হবে কি, ছিরি-ছাঁদ যদি একটু আছে!"

"সব সময় কি আর নামের সঙ্গে মানুষটার মিল হয়। এই ধর না যেমন তোর নাম শান্তি, কিন্তু···" অতুলকে থামিয়ে জয়া বললো, "এই নে. চা-টা ধর।"

ঘরের একমাত্র চেয়ারে বসে অতুল চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিলো।

"তুমি নীচে যাওনা দাদা," শান্তি অনেকটা শাসনের সুরেই বললো, "তোমার সামনে বৌদি খাবে কী করে?"

"কেনো মুখ দিয়ে।" পেয়ালায় আর এক চুমুক দিয়ে অতুল বললো, "আজকাল আর সেকেলে লজ্জা আছে নাকি!"

"ওমা সে কি কথা গো?" গালে হাত দিয়ে শান্তি সত্যিই অবাক হোলো, "সেদিন নেই বলে কি বৌ-মানুষ প্রথমদিনেই বরের সঙ্গে বসে চা খাবে? এই তো ধর না, আমার যখন বিয়ে হোলো। সে তো আর বেশি দিনের কথা নয় বাপু। আমাকে তখন কত কথাই শুনতে হয়েছে। বরকে পান দিতে গেলে ননদ-শাশুড়ী হাঁ-হাঁ করে উঠতো, বরকে···"

"কাকিমা, চায়ে মিষ্টি কম হয়েছে···"

"আর যে-দিন প্রথম শ্বশুরবাড়ি এলুম ননদ কি বললো জানো? বললো, সত্যি বলছি ভাই, এ-মাগীর জন্যেই তো আমার বৌদি মরলো। সে না মরলে তো আর এ আসতো না···"

"এক গেলাস জল নিয়ে আয় দিকিনি।"

"সে কি দাদা! চা খাবার পরেই জল খাবে?"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ, শিগগীর যা।"

"জল আমি আনছি। কিন্তু একটু পরে খেয়ো।" শান্তি বেরিয়ে গেলো। কোনো রকমে তাকে ঘর থেকে অন্য কোথাও পাঠাতে পারলে অতুল বাঁচে। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই সে ফিরে এলো; একহাতে জল অন্য কোলে তার ছোটো ছেলে। অতুলকে জল দিয়ে সুষমাকে বললো, "এই ভাই আমার ছোটো ছেলে। নাম রেখেছি বুধি, বুধবার হয়েছে কি না।

জানো, এখনোতো ছ-মাসও পুরো হয়নি কিন্তু কি রকম হামা দিয়ে বেড়ায়! কথাও বলে। আমার শ্বশুরবাড়ির সামনের দিকটায় এক ময়রা ভাড়াআছে—আমাদের অবস্থাতো খুব ভালো নয়। সেই ময়রার ঘরেই রাতদিন বুধি থাকে। সমস্ত ঘর জুড়ে চ্যাট-চ্যাট করছে, তারা বাতাসা আর মুড়কি করে কিনা, তার ওপরই বুধি হামা দিয়ে বেড়ায়। দুটি মুড়কি মেঝেয় ছড়িয়ে দাও, ব্যাস। আর ভাবনা নেই। যাই বল, ছেলেটা বেশ শান্ত।”

শান্তি তার কনিষ্ঠপুত্রকে আদর করতে লাগলো।

এমন সময় তার তৃতীয়া কন্যা চোখমুখ ফুলিয়ে কাঁদতে-কাঁদতে এসে হাজির, “মা আমার বাঁ-কানের মাকড়িটা কোথায় পড়ে গেছে।”

“এঁ্যা! বলিস কী রে? সোনার জিনিস বছর ঘুরলোনা···”, ছেলেকে ভুম করে মাটিতে নামিয়ে শান্তি ব্যস্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। “কোথায়-কোথায় গিয়েছিলি মুখপুড়ি মেয়ে? কেবল ধিঙ্গিপনা। বাপকে এখন বলবি কী? তোকে তো চাবুক পেটা করবে, আমারো কী দুর্গ্যতি করে কে জানে!” শান্তির স্বরে স্পষ্ট ভয়ের আভাস। মিনিট পনেরো ধরে সমস্ত বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজে হাঁপাতে-হাঁপাতে শান্তি আবার উপরে এলো, “সব্বোনাশ হয়েছে দাদা। এখন কী বলি! ও-তো আর আমাকে আস্ত রাখবে না।”

“আঃ অত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন? কত দাম হবে বল না ছাই···”

“সাত টাকা চোদ্দ আনা লেগেছিলো।”

“এই নে, নোটটা রেখে দে। শিবনাথকে দিস। সে আর একটা করিয়ে আনবে।” অতুল একটা দশ-টাকার নোট বার করলো।

ক্রমশ বেলা বাড়ছে। “কাকিমা, ওর স্নানের জন্যে গরম জলের বন্দোবস্ত করে দিও। ঠাণ্ডা লেগেছে। আবার না বাড়ে। আমি ততক্ষণ একটু কাজ সেরে আসি।”

অতুল বেরিয়ে গেলো।

"কৈ বৌদি, তুমি তো ভাই কথা বলচো না?" শান্তি যেন একটু অনুযোগের সুরে বললো। "তা নতুন বউ, একটু লজ্জা-টজ্জা করবে বৈকি। তবে ভাই আমাদের তো আর লজ্জা করলে চলবে না। আমাদের আসতে হয় ভাঙা সংসার জোড়া দিতে। আমরা তো আর বাড়ির প্রথম বউ নই।...আমি যখন প্রথম শ্বশুরবাড়ি গেলুম, সেদিন বিকেল থেকেই কত্তার ও-পক্ষের কচি-কচি ছেলে দুটোকে দেখতে হোতো। জানো ভাই, প্রথম দিন থেকেই আমাকে হাঁড়ি ঠেলতে হয়েছে। অবশ্য আমাদের অবস্থা খারাপ, তাই। কিন্তু দাদা বড় চাকরি করে, তার তো আর ও-সব বালাই নেই। তবুও নিজের সংসার তোমাকে নিজেই গুছিয়ে নিতে হবে! ও-পক্ষের ছেলেটিকে তোমাকেই তো মানুষ করতে হবে।" একটু থেমে, "আহা, বাছা যেন ভালো হয়ে ওঠে। তুমি ভয় পেওনা বৌদি, এমন কিছু শক্ত ব্যামো নয়। কি-রকম যেন হাবা ধরণের, মুখ দিয়ে নাল পড়ে। দাদার অনেক টাকা আছে কিনা তাই সায়েব ডাক্তারদের দেখায়। নইলে আমাদের ঘরে ও-রকম কত আছে। বড় হলে সেরে যায়। সেরে যায় বৈ-কি বৌদি, তুমি ভেবো না।"

স্নানাহারের পর সুষমাকে নিয়ে মেয়ের দল আবার উপরে এলো। অতুলের কড়া আদেশ দুপুরে ঘুমুতে হবে, কেউ যেন না বিরক্ত করে। একে ট্রেনে ঠাণ্ডা লেগেছে, তার উপর এই সব হাঙ্গামা। অনেক পরিশ্রম হয়েছে বৈকি।

মেয়েরা অবশ্য ঠাট্টা করে বলেছে, "আজ রাত্রে ফুলশয্যে কিনা!"

শান্তিও তার সঙ্গে উপরে এলো।

"তুমি ভাই ঘুমিয়ে নাও খানিক, নইলে দাদা আবার রাগ করবে।"

"তুমি বোসো না। আমার ঘুম পায়নি।"

শান্তি বসলো। কিন্তু কথা না বলে সে থাকতে পারে না। "জানো,

দাদা আমাকে নীচে নিয়ে গিয়ে বললো তার ও-পক্ষের বউ-এর গল্প তোমার সঙ্গে যেন না করি। হ্যাঁ ভাই, তাও আবার কেউ করে নাকি। তবে আমার যে ননদ, তার মত অমন ডাক-সাইটে মেয়ে তুমি আর দুটি পাবে না। আমি যখন নতুন-বৌ হয়ে গেলুম, আমাকে শুনিয়ে-শুনিয়ে সে কত কথাই না বলতো। আগেকার বউ-এর চেয়ে আমি নাকি অনেক কুচ্ছিত, সে বউ ছিলো লক্ষ্মী আমি তার প্যাঁচার যুগ্যিও নই, এ-রকম কত সব কথা। তখন তো ছেলেমানুষ ছিলুম, তাই প্রথম-প্রথম কত কাঁদতুম। পরে সব সয়ে যায় ভাই। এখন আর গায়েও লাগে না।" একটু থেমে খানিক কী ভেবে শান্তি বললো, "তা ভাই তুমি মনে দুঃখ পেয়ো না, আমাদের আগেকার বউ ছিলো সত্যিই সাক্ষাৎ লক্ষ্মী যেন—কী রূপ, কী গুণ! ছেলে হবার সময় মরে গেলো। কত ডাক্তার এলো, বদ্যি এলো। হু-হু করে টাকা বেরিয়ে গেলো, কত কাটাকুটি করা হোলো। কত সে-সব যন্ত্রপাতি। কিন্তু কেউ তাকে ঠেকাতে পারলো না। হাতের নোয়া আর মাথার সিঁদুর নিয়ে ড্যাং-ড্যাং করে চলে গেলো। কত ভাগ্যি থাকলে স্বামী-পুত্তুর রেখে ও-রকম করে যেতে পারে! দাদা তো পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলো। আবার বিয়ে করার কথা বললে তো মারতে আসতো। তার ছবিকে চন্দন পরানো, মালা পরানো, কত কাণ্ডই করতো! তবে পুরুষরা ভাই, ওই এক জাত তাদের কাঁদতেও যতক্ষণ হাসতেও ততক্ষণ। ভেতরে-ভেতরে আসলে তারা ছেলেমানুষ। তখনকার দাদাকে দেখলে কে বলতো দাদা আবার নিজেই দেখেশুনে বিয়ে করবে? এখন কি আর সে-বউ-এর কথা তার একটুও মনে আছে নাকি? দেখলে না, তোমাকে নিয়েই এখন ও অস্থির! তোমার সর্দি লেগেছে, যেন জলে না দাঁড়-করানো হয়, চা না খেলে তোমার মাথা ধরে—কত কী! আমার ভাই এমন হাসি পাচ্ছিলো!"

বাইরে জয়ার গলা শোনা গেলো, "শান্তি, শান্তি কোথায় রে?"

"এই যে কাকিমা, বৌদির ঘরে।"

জয়া এসে বললো, "চল্ল বাপু আমরা নীচে যাই। বউ এখন বিশ্রাম করুক। অতুল নইলে তো খেয়ে ফেলবে।"

"বৌদি এখন ঘুমুবে না বললে, তাই একটু গল্প করছিলুম। আমাকে আবার বিকেল-বিকেল ফিরতে হবে কিনা, তাই ভাবলুম এখন একটু গল্প করে নি। রাত্তিরে তোমরা তো আমোদ করে আড়ি পাতবে, হুল্লোড় করবে—তোমাদের অনেক সময়। কিন্তু আমি আর কখন সময় পাবো বল?"

তবু আরো খানিক পরে শান্তিকে নেমে আসতে হোলো। তার কোলের ছেলেটা ভারি কান্নাকাটি লাগিয়েছে। সে না গেলে কিছুতেই থামবে না।

বিকেলের কিছু আগেই অতুল ফিরলো। জয়ার ঘরেই তার শান্তির সঙ্গে দেখা। ফিরে যাবার জন্যে শান্তি প্রস্তুত হচ্ছিলো। অতুলকে দেখে বললো, "এই যে দাদা, তোমার সঙ্গে আমার যে কতকগুলো দরকারি কথা ছিলো। উনি ওঁর ছোটো ভাই-এর কথা তোমাকে বলতে বলেছেন তোমার আপিসে তার যেন একটা চাকরি করে দাও। তুমি যে বলবে—না তা সম্ভব নয়—তা আমি শুনবো না। এ তোমাকে করে দিতেই হবে। আর তা-ছাড়া, এই শীতে ছেলেমেয়েগুলো ভারি কষ্ট পাচ্ছে। গরম জামা নেই। তাদের একটা করে গরম জামা যেন তুমি করিয়ে দাও। এই পুঁটলিতে জামার মাপ রয়েছে। উনি বলেছেন শ্বশুরবাড়ি থেকে লোকে কত পায়। শ্বশুর-শাশুড়ী নেই বলে কি উনি কিছুই পাবেন না? তা-ছাড়া তুমি যখন মস্ত চাকরি করছো তখন তোমার তো দেখাই উচিত। —অবশ্য তুমি জিনিসপত্তর যে দাওনা তা তো নয়। সে তো আমি জানিই। তুমি কত দাও! তবু ওঁর মন ভেজে না। —তা বাপু ওদের এই জামাগুলো করিয়েই না হয় দিয়ো—আর হ্যাঁ, আমার পিস্‌শাশুড়ীর কাছে খবর পেয়েছি যে তাঁদের গাঁয়ের বটতলার শিবের

কাছে হত্যে দিলে এমন অসুখ নেই যা সারে না। তোমার ছেলের জন্যে একবার দেখো না!" অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে শান্তি অতুলের মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

"হ্যাঁ, গণ্ডাগণ্ডা সায়েব ডাক্তার পারলো না সারাতে আর শিবঠাকুরের কাছে হত্যে দিয়ে পড়লেই···।"

"তা বাপু—তোমার বিশ্বাস না থাকে তুমি না হয় কোরো না। আমি নিজেই এবার পুজোর সময় গাঁয়ে গিয়ে হত্যে দেবো। আমার মন বলছে এতে সারবেই সারবে···।" পোঁটলাটা বেঁধে নিয়ে অতুলকে প্রণাম করে শান্তি দাঁড়ালো। "চলি দাদা, বাড়ি ছেড়ে বেরুবার কি আর জো আছে!"

জয়া তাকে ঘোড়ার গাড়িতে তুলে দেবার জন্যে নীচে নেমে এলো। ছেলেমেয়েদের হাতে একটা করে টাকা দিলো, কয়েক হাঁড়ি মিষ্টি তুলে দিলো গাড়িতে। জয়াকে প্রণাম করে গাড়িতে ওঠার সময় শান্তি বললো, "চলি কাকিমা। আবার একদিন সময় করে আসবো। আমি ভেবেছিলুম বৌ আমাদের আরো ছোটো হবে, আরো সুন্দর হবে। কিন্তু সুন্দরে আর কাজ নেই কাকিমা। আমাদের যা ভাগ্যি, বেঁচে থাকলেই হোলো।" গাড়িতে উঠে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আবার ফিসফিস করে সে বললো, "আর দেখো কাকিমা, খোকোনকে এখন তুমিই যত্ন-টত্ন কোরো। নতুন-বউ, তার হাতে ছেড়ে দিয়ো না। এখনো তো ওর ওপর বৌয়ের মায়া পড়ে নি। তবে ক্রমশ পড়বে, তখন সব ঠিক হয়ে যাবে।"

জয়া উপরে উঠে এলো। অতুলের হাবা ছেলে জেগে উঠে কাঁদছে। তার কশ বেয়ে অজস্র লালা ঝরে মাথার বালিশটা প্রায় ভিজে গিয়েছে। জয়া কোলে তুলে নিতেই চুপ করলো।

"বৌকে দুপুরে ঘুমুতে দিয়েছিলে তো?" অতুল প্রশ্ন করলো।

"হ্যাঁরে, এখনো সে ঘুমুচ্ছে।"

"কাকিমা, এবারে তাকে জাগিয়ে দাও। বেশি বিকেল পর্যন্ত ঘুমুলে আবার মাথা ধরবে।· আচ্ছা আমি-ই যাচ্ছি। —শান্তিটা কি রকম যেন বদলে গিয়েছে, না? কি রকম যেন বোকা হয়ে গিয়েছে!" দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে-যেতে আবার সে বললো, "গরম জামাগুলো আবার পাঠাতে হবে। তোমাকে টাকা দিয়ে দেবো, তুমিই পাঠিয়ে দিয়ো কাকিমা। ওর বরটা একটা অমানুষ, এমন নির্লজ্জভাবে সব চেয়ে পাঠায়!"

সন্ধে হয়ে আসছে। এখুনি সব নিমন্ত্রিতেরা আসতে সুরু করবে। অনেক কাজ। তবু জয়া অতুলের হাবা ছেলেকে কোলে নিয়ে খানিক চুপ করে বসে রইলো।

তার নতুন মা এসেছে। জয়ার চোখ অকারণেই ছলছল করে উঠলো। নিবোধ শিশু কিছু বুঝলো না! অবুঝ চোখে শুধু ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো।

সাপ

চলন্ত জাহাজের পাটাতনের মতো থরথর করে কেঁপে ভরতের আবার জ্বর এলো। তার সরু দীর্ঘ দেহে এ-বছরে বারবার জ্বরের ভূত নেমেছে। কোনো রকমে ধানবোনার পালা সে যে শেষ করতে পেরেছে, এটাই তার পরম সৌভাগ্য। পরিমিত বৃষ্টির জন্য মাঠে যেন সোনা ফলেছে; গত তিন বছরের অজন্মার পর এসেছে এই আশ্চর্য ঐশ্বর্য। মাঝেমাঝে তার পাণ্ডুর ক্লান্ত দেহ নিয়ে সে ক্ষেতের পাশে দাঁড়াতো: ফালি-ফালি জমিতে জ্বলন্ত সবুজ যৌবন, বাতাসে সতেজ চারাগুলো দুলে ওঠে, শাদা বকের ঝাঁক ডুব দেয় নীল নির্জন আকাশে আর সমস্ত মাঠ যেন ফিসফিস করে কথা কয়। সন্ধেয় সবজের সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে আর ঝকঝকে স্বচ্ছ-নীল আকাশের দিকে চেয়ে সমস্তটা বিশ্বাস করতে ভরতের সাহস হোতো না। গ্রামের প্রাচীন আর প্রৌঢ়রা একবাক্যে বলাবলি করে লক্ষ্মীর এ-রকম অজস্র দান তাদের জীবনে বড়-একটা চোখে পড়েনি।

মাঝে দিন দশেক বেশ ভালোই ছিলো ভরত। কাস্তে হাতে হলদে মাঠে যাবার স্বপ্নও দেখেছিলো। কিন্তু আবার হু-হু করে কেঁপে আজ সকালে ম্যালেরিয়া জ্বর ফিরে এলো।

"বাস্‌না, এই বাস্‌না…" পুরনো তক্তায় ছেঁড়া কাঁথা সর্বাঙ্গে মুড়ি দিয়ে কাঁপতে-কাঁপতে ভাঙা গলায় সে ডাকলো।

বাসনা রান্নাঘর পরিষ্কার করছিলো। ডাক শুনে সোজা হয়ে দাঁড়ালো: সর্বাঙ্গে উদ্ধত বিদ্যুৎ, চিকচিকে চোখ। যেন ফণা তুলে স্থির হয়ে দাঁড়ালো একটি সাপ।

কোমরে আঁচল গুঁজতে-গুঁজতে বাসনা উত্তর দিলো, "যাই।"

ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়ালো, একটা অসহায় ক্লান্তির ছায়ায় সর্বাঙ্গ তার ছেয়ে গেলো! জ্বর? আবার জ্বর? ভরতের কপালে হাত দিয়ে সে অনুভব করলো উত্তাপ, আরো একটা মোটা কাঁথা দিলো তার গায়ে বিছিয়ে, তারপর তক্তার এক পাশে পড়লো বসে।

এখন ফসল কাটার সময়। উষার আগেই, অন্ধকার থাকতে-থাকতে দলেদলে স্ত্রী-পুরুষ মাঠে যেতে আরম্ভ করেছে। ঠিক ছিলো আগামী কাল থেকে ভরতও যাবে। সমস্ত বছরের দারিদ্র্য তারা মাঠের দিকে মুখ ঘুরিয়ে সহ্য করেছে। সোনা ফলেছে এবার: উজ্জ্বল সোনার মতো ক্ষেতগুলি যেন সূর্য থেকে আগুন শুষে নিয়েছে। সেদিকে চেয়ে তারা স্বপ্ন দেখেছে অনাগত স্বচ্ছল দিনের।

জ্বরের ঘোরেই ভরত বললো, "রত্নাকে ডেকে দেতো রে। সে তো আজ ভিন্-গাঁয়ে যাবে, ছোঁড়াটাকে ডেকে আনুক।"

ছোঁড়া, অর্থাৎ ভরতের দূর সম্পর্কের ভাই মাণিক। তিনকুলে কেউ নেই, ভরতের কাছে মানুষ। হাবাতে লক্ষীছাড়া ছেলেটা। গ্রামের বখাটেদের দলে মিশে গাঁজা-ভাঙ্-মদ কোনো নেশাই বাকি রাখে নি। শাসন মানে না। ভরত অনেক বুঝিয়েছিলো, শেষে বাড়ি থেকে বিদেয় করে দিয়েছে। সে-ও আর আসে নি: পাশের গ্রামে থাকে, কোন এক চাষার ক্ষেতে কিছুদিন ধরে রোজ-খাটছে।

গত কয়েক দিন ধরে ভরত তার কথাই ভাবছিলো। অসুরের মতো শক্তি ছেলেটার। প্রতি বছর একাই ফসল কাটার ভার নিতো। কিছু-দিন আগে একটা ভাসা-ভাসা খবরে ভরত উৎসাহিত হয়েছে: মাণিকের নাকি কাজটা গেছে। খবরটা সত্যি হলে ঐ রতনকে দিয়ে কয়েক বোতল তাড়ির লোভ দেখালে ফসল কাটার জন্যে চিন্তিত হবার কারণ নেই। মাণিককে হবেই আসতে। নেশা না করলে এক দিনও তার চলে না।

মেয়েটি উঠে দাঁড়ালো। বুঝি মুহূর্তের জন্যে অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণতায় চকচিক করে উঠলো তার চোখ, সাপের চোখের মতো। তারপর সে রান্নাঘরের ছোটো জানালাটার পাশে এসে দাঁড়ালো। ডালটা ধরে গেছে, বাতাসে পোড়া গন্ধ। কিন্তু সে-দিকে তার খেয়াল নেই। ছোটো জানালাটা দিয়ে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়: নিটোল ক্ষেতগুলি ফসলের ভারে অলস, চাষীরা সপরিবারে ভিড় করেছে, কাস্তে হাতে পুরুষরা ডুব দিচ্ছে ফসলের হলুদ সমুদ্রে, মেয়েরা গোছা-গোছা কাটা ফসল আঁঠি বেঁধে রাখছে। বাসনা দেখতে লাগলো: ওই আম-কাঁঠালের বাগান পেরিয়ে, ওই তালপুকুরকে বাঁয়ে রেখে এগিয়ে গেলেই মাণিকের গ্রাম!

সেই সন্ধেয় রতন খবর আনলো: কাজটা যাওয়ায় ক'দিন ভারি কষ্টে পড়েছে মাণিক। পথে ঘাটে মোট বয়, লোকের বাড়ি কাঠ চেলা করে দেয়, তবু তার অর্দ্ধেক খাবারের জোগাড়ও হয় না। ভরতের আহ্বান সে সানন্দে গ্রহণ করেছে। চোখ নাচিয়ে হেসে রতন বললো, "বিশেষ করে যখন রসদের কথাটা শুনলো।"

চাদরের তলা থেকে সন্তর্পণে দুটো বোতল বের করে ভরতের চৌকীর তলায় রেখে দিতে-দিতে সে বললো, "হতভাগাটা দুদিন নেশা করতে না পেয়ে পাগল হয়ে উঠেছে। এ দু-বোতলের জন্যে সে বোধ হয় মরে যেতেও রাজি!"

সারা রাত বাসনার ঘুম আসে নি। প্রথম দিকে জ্বরের ঘোরে ভরত গোঁ-গোঁ করেছিলো। বোধ হয় জ্বরটা খুব বেড়েছিলো। তারপর সে চুপ করলেও বাসনা ঘুমুতে পারে নি। শুধু জানালার ভিতর দিয়ে

আকাশের তারা গুণেছে : মন্থর নিঃসঙ্গ রাত। এই দীর্ঘ রাত কাটানোর পক্ষে আকাশের সমস্ত তারাও যেন যথেষ্ট নয়।

আজকাল শিশির পড়ার সময়। অঘ্রাণ শেষ হোলো, পোষ এলো বলে। দীর্ঘ ঠাণ্ডা রাত।

শেষে এক সময় রাত ফিকে হোলো। বিছানা ছেড়ে বাসনা উঠলো। তার ঋজু শিথিল দেহ সংহত হয়ে উঠেছে। ভোরের হাওয়ায় শরীরটা সিরসিরিয়ে ওঠে। —আজ তার অনেক কাজ। ভরত অঘোরে ঘুমুচ্ছে আলগোছে কপালে হাত রেখে বাসনা দেখলো জ্বর বোধ হয় নেই।

রান্নাঘর থেকে স্ত্রী-পুরুষের কোলাহল এখন থেকেই শোনা যায়, তারা চলেছে ফসল কাটতে। কাজের ফাঁকে-ফাঁকে বাসনা জানালাটার ভিতর দিয়ে দেখতে লাগলো : ওই আম-কাঁঠালের বাগান পেরিয়ে, তালপুকুরকে বাঁয়ে রেখে সোজা গেলেই······।

লালচে রোদ ক্রমশ গাঢ় হোলো। শিশির শুকিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ দরজার শিকল ঝনঝন করে উঠলো। এর জন্যেই এতোক্ষণ বাসনা অপেক্ষা করছিলো। তবু ভীষণ চমকে উঠলো, বুকের মধ্যেটা সিরসির করে উঠলো। তারপর নিজের মনেই উঠলো হেসে।

দরজা খুলে মাণিককে দেখে সে আবার চমকে উঠলো। হতভাগাটার একি চেহারা হয়েছে! ধানকাটা ক্ষেতের মতো মুখময় খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। রোদে পুড়ে সমস্ত দেহ ঝামার মতো। জামার অবস্থা তার চেয়েও খারাপ। এক দিকের হাতা নেই, অন্যটা অসমান ভাবে কনুই পর্যন্ত ছেঁড়া, বোতামের অভাবে সমস্ত বুক হাঁ করে আছে। শুকনো ধূলোকাদায় কাপড়টার এক অদ্ভুত রঙ। কিন্তু এ-সব দিকে মাণিকের খেয়াল নেই। গুনগুন করে গাইছিলো :

চইলা গ্যালো ভিন্ গাঁয়ে সে
সোনার বরণ মেয়ে······

বাসনাকে চমকে উঠতে দেখে কৌতুক বোধ করে হেসে মাণিক বললো, "কি গো বৌ-ঠান! ভূত দেখলে নাকি?"

সে-কথার উত্তর না দিয়ে নিজেকে কোনো রকমে গুছিয়ে বাসনা শুধু বললো, "এসো।"

রান্নাঘরের দাওয়ায় একটা বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে মাণিক গুনগুন করতে লাগলো। ঘরের ভিতর থেকে আড়চোখে বাসনা দেখলো: কী দীর্ঘ দেহ, পুরুষ বটে!

তার প্রিয় কাস্তেটা পাশে নামিয়ে মাণিক হাঁকলো, "শুনচো বৌ-ঠান! জলটল কিছু আছে?"

তার খাবারের আয়োজনই বাসনা করছিলো। এক বাটি গুড়-মুড়ি এনে দিলো, ঝকঝকে মাজা পেতলের ঘটিতে আনলো জল, তারপর বসলো দরজায় ঠেস দিয়ে।

গান বন্ধ করে অদ্ভুত আগ্রহে মাণিক খেতে লাগলো। না-জানি কতদিন এই প্রকাণ্ড রুক্ষ চেহারার লোকটা তৃপ্তি করে খায়নি! বাসনা আরো মুড়ি এনে দিলো। তার চোখের কোন ভিজে এসেছে। মাণিকের কিন্তু অন্য দিকে লক্ষ্য দেবার সময় নেই। একবার শুধু মুখ তুলে জিগগেস করলো, "দাদা কোথায়?"

"তার তো জ্বর হয়েছে।"

"ও।" ঢক-ঢক করে ঘটিটা খালি করে মাণিক আবার জল চাইলো।

বাসনা জল দিলো, তামাকও সেজে দিলো। তারপর আবার গিয়ে বসলো দরজায় ঠেস দিয়ে।

এক চোখ বুজে তামাক টানতে-টানতে মাণিক বললো, "ওই দুটো ক্ষেত তো?—সাঁঝের আগেই হয়ে যাবেখন।"

"আজকেই হয়ে যাবে?"

"দুটো ক্ষেত আবার ক'দিন লাগবে বৌ-ঠান?" তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললো মাণিক, তারপর আরো গোটা কয়েক প্রচণ্ড টান দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। "চলি বৌ-ঠান। দুপুরে খাবারটা পৌঁছে দিয়ো।" তার প্রিয় কাস্তেটা হাতে নিয়ে প্রকাণ্ড লোকটা বেরিয়ে গেলো গুনগুন্ করতে-করতে :

চইলা গ্যালো ভিন্-গাঁয়ে সে
সোনার বরণ মেয়ে……

রান্নাঘরের ছোটো জানালাটা দিয়ে বাসনা দেখতে লাগলো : মলিন দেহ, শুকনো চুল, অপরিষ্কার কাপড়। আর তার মনে হোলো যেন অনেক দিন পরে অনেক দূরের পাহাড় আজ কাছে সরে এসেছে!

আরো খানিক পরে ভরতের ঘুম ভাঙলো। মাণিক ইতিমধ্যে মাঠে চলে গেছে শুনে বেজায় খুসি। বাসনাকে চুপিচুপি বললো, "দেখিস, এক সঙ্গে দুটো বোতল দিস নে যেন। দুপুরে একটা দিবি আর বলবি ধান কাটা হলে আর একটা পাবে।" একটু থেমে আর একটু সদয় হতে চেষ্টা করে ভরত বললো, "তবে হ্যাঁ, তামাকটা সবই দিস। মাঝে-মাঝে না টানলে কাজ করতে পারবে কেন?"

দুপুরের খাবার নিয়ে বাসনাকেই যেতে হোলো। বোতলটা নিয়ে যাবার ইচ্ছে ছিলো না। কিন্তু খেঁকি কুকুরের মতো ভরত ধমকে উঠতে একটা গোলমালের ভয়ে আঁচলের নীচে বোতলটা লুকিয়ে নিলো।

সূর্য মাঝ-আকাশে যেন আটকে গেছে। ঘাসে শিশিরের বাষ্পও আর নেই। চাষীরা কাস্তে গুটিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে, গামছা ঘুরিয়ে কেউ-কেউ ঠাণ্ডা হচ্ছে। মধ্যাহ্ন ভোজন অনেকে সেখানেই সেরে নিচ্ছে, কেউ-কেউ বা বাড়ি যাচ্ছে। আলের উপর দিয়ে মেয়েটি সাপের মতো এগিয়ে চললো : শীতের রোদে পাকা ফসলের আর শুকনো ঘাসের গন্ধ।

আরো গোটা দুই ক্ষেতের পর ভরতের জমি। ছেলেটা গেলো কোথায়?

কিন্তু পরের মুহূর্তে বাসনা বিস্ময়ে যেন পাথর হয়ে গেলো। প্রায় মাটির সঙ্গে মিশে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় মাণিক কাস্তে চালিয়ে চলেছে। ঝুপ-ঝুপ করে এলিয়ে পড়ছে ধানের শীষ। লোকটা ক্ষেপে গেলো নাকি ? কোনো দিকে তার খেয়াল নেই ! তার তামাটে দীর্ঘ দেহ ঘামে আর রোদে পাথরের মতো চিকচিক করছে।

বাবলা গাছটার ঝিরঝিরে ছায়ায় এসে বাসনা ডাকলো, "ঠাকুরপো, অ ঠাকুরপো।" প্রথমে সে শুনতে পায়নি। খানিক পরে যেন তার চমক ভাঙলো। চাইলো সে বাসনার দিকে। সোজা হয়ে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে অদ্ভুত খুসি তাকে আচ্ছন্ন করলো।

বাসনাও ঝলমল করে হেসে বললো, "এসো।"

কোমরে আঁট-করে-বাঁধা গামছাটা খুলতে-খুলতে মাণিক এসে দাঁড়ালো : সর্বাঙ্গে খড়ের কুচি, দরদর করে ঘাম ঝরে পড়ছে।

"এ কী চেহারা করেছো ?"

"কেন, বেশ তো ?" তখনো সে হাঁপাচ্ছে। কাস্তেটা মাটিতে ফেলতে গিয়ে একটা কথা মনে পড়ায় বাসনাকে বললো, "একটা মজা দেখবে বৌ-ঠান ?" তারপর অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই বাসনার নগ্ন হাতের উপর কাস্তেটা চেপে ধরলো।

"উঃ", প্রায় ছিটকে সরে গিয়ে বাসনা বললো, "যেন আগুন থেকে বার করেছো !"

শিশুর মতো হো-হো করে হাসতে-হাসতে মাণিক বললো, "হ্যাঁ বৌ-ঠান, এর মধ্যে আগুন আছে।"

"নাও, ঠাণ্ডা হয়ে খেতে বোস।" সরে এসে বললো বাসনা, "বাড়ি থেকে গিয়ে কি শরীরই করেছো !"

"কেন ?" গামছা ঘোরাতে-ঘোরাতে সে উত্তর দিলো, "এখনো সাতটা বাঘে খেতে পারবে না, জানো বৌ-ঠান !"

ঘটিটা এগিয়ে দিলো বাসনা, "হাত মুখ ধুয়ে চাট্টিখানি খেয়ে নাও। চান তো আর হোলো না।"

হাত-মুখ ধুয়ে মাণিক গো-গ্রাসে খেতে লাগলো। সূর্য মাঝ-আকাশ থেকে হেলেছে, বাবলা গাছের ছায়া ঝিরঝির করছে।

আধ-খাওয়া করে থালাটা সরিয়ে মাণিক বললো, "নাঃ, আর খাবো না। তা হলে খাটতে পারবো না। কিন্তু আদত জিনিস কৈ বৌ-ঠান?"

"জিনিস আবার কি?" বাসনার স্বর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে।

"কী আবার! রত্না যে বললে—সেজন্যেই তো এলুম।"

বাসনার স্বর আরো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো, "ও-সব হবে-টবে না ঠাকুরপো। সে···"

"হবে না মানে?" রীতিমতো ক্ষেপে উঠলো মাণিক, "শালা আমায় ঠকিয়ে এনেছে! দেখি তারই একদিন কি······," বলতে-বলতে মাণিক দাঁড়িয়ে উঠলো, "এক্ষুনি ব্যাটার মুণ্ডুটা ছিঁড়ে আনছি।"

একটু ভয় পেয়েই বোধ হয় বাসনা বোতলটাকে নিঃশব্দে বার করে দিলো। আর এক নিমেষেই একেবারে জল হয়ে গেলো মাণিক। এক মুখ হেসে বললো, "এ-রকম ঠাট্টা করতে হয় নাকি বৌ-ঠান! দাও-দাও, মাটিতে রেখো না।" বোতলটা এক রকম সে ছিনিয়ে নিলো। একটু সরে বসে বোতলটার গায়ে সস্নেহে হাত বোলাতে-বোলাতে বললো, "কতদিন খাইনি!" তারপর দাঁত দিয়ে ছিপি খুলে এক নিশ্বেসে ঢক-ঢক করে সমস্তটা নিঃশেষ করে বাঁ হাতের উল্টো পিঠে মুখ মুছে বললো, "কৈ আর একটা? হুঁ-হুঁ বাবা, দু-বোতলের কড়ারে এসেছি।"

"কাজ শেষ হলে পাবে।" বাসনার স্বর উঠলো কেঁপে।

"বেশ-বেশ, সেই ভালো," খুসি মনে ওঠবার উপক্রম করলো মাণিক।

বিদ্যুতের মতো ক্ষিপ্রতায় মাণিকের পাশে এসে বসলো বাসনা। তার একটা হাত চেপে চাপা তীব্র গলায় বললো, "বোস।"

আড় চোখে চেয়ে সামান্য হেসে মাণিক বললো, "এখনো আমাকে মনে আছে বৌ-ঠান?" তারপর আর কোনো কথা বললো না। বোধ হয় নেশার ঝোঁকেই চুপ-চাপ বসে রইলো। শুকনো ঘাসে বাবলার ছায়া: সামনে জ্বলন্ত সোনার ক্ষেত, মাঝে-মাঝে চাষীদের কাঁপা চীৎকার। এদিকে লোক নেই। মেয়েটি ক্রমশ মাণিকের গা ঘেঁসে বসলো, দু-চোখ তার সূর্যের মতো জ্বলছে, আঁচল পড়েছে খসে, তার নিটোল দেহ উত্তেজনায় থরথর করছে: যেন জ্বলন্ত চোখ নিয়ে ক্ষুধিত একটি সাপ হিসহিস করছে, ক্ষুধিত উলঙ্গ একটি সাপ।

মাণিক তার দিকে চেয়ে চমকে উঠলো তারপর কাস্তেটা তুলে নিয়ে বললো, "বাড়ি যাও বৌ-ঠান। এখনো অনেক কাজ বাকী। সন্ধেবেলায় এসো।" আবার গুনগুন করতে-করতে সে ক্ষেতে নামলো।

বাবলা গাছে ঘুঘু ডাকছে, পাকা ফসলের গন্ধে দুপুরের বাতাস ভারি, সূর্য আরো একটু পশ্চিমে হেলেছে।

সূর্যাস্তের পর বাসনা ভালো করে সাজলো। গা ধুলো, পরলো ডুরে একটি শাড়ি, তেল দিয়ে বাঁধলো মাথার চুল তারপর খাবার আর বোতলটা নিয়ে ক্ষেতে এলো।

চাষীরা ফিরে চলেছে। আকাশের রঙ অদ্ভুত টলটলে নীল। মেয়েটি আবার যখন বাবলা গাছের তলায় এসে দাঁড়ালো তখন বেশ অন্ধকার। চারদিকে শূন্য মাঠ, মাণিকের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। কাস্তেটা নিয়ে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

অপরূপ প্রতীক্ষায় বাসনার সর্বাঙ্গ কাঁপছে। পৃথিবী ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে, এবারে শিশির পড়বে।

আরো খানিক পরে মাণিক সোজা হয়ে দাঁড়ালো আর বাবলা গাছের তলায় বাসনাকে দেখে প্রায় ছুটতে ছুটতেই এলো।

"এসেছো ?"

"এসেছি তো ?" বাসনা হাসলো।

ময়লা গামছা দিয়ে মুখ মুছতে-মুছতে মাণিক বললো, "ওই দেখো, সব ধান কাটা হয়ে গেছে। দাও আমার বোতলটা। আমাকে এখুনি দশ কোশ দূরে যেতে হবে।"

খাবারের পুঁটলি আর বোতলটা বার করে দিয়ে বাসনা বাবলা গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো। বললো, "এখুনি দশ কোশ দূরে যেতে হবে ?"

"হ্যাঁ বৌ-ঠান," বোতলটা খুলতে-খুলতে উত্তর দিলো মাণিক, "নতুন একটা চট-কল খুলছে, অনেক কুলি নেবে। হাঁটতে হবে সারা রাত।"

বোতলটা খালি করলো মাণিক, বাঁ হাতের উলটো পিঠ দিয়ে মুছে নিলো মুখ। তারপর কোমরে গামছা জড়িয়ে ছেঁড়া জামাটা কাঁধে ফেলে বাসনার চোখে চোখ রেখে বললো, "চলি বৌ-ঠান।"

আশ্চর্য লোকটা। বিশ্রাম যেন তার কুষ্ঠিতে লেখেনি। আঁকাবাঁকা আলের উপর দিয়ে নিজের খেয়ালে সে গুনগুন করতে-করতে চলে গেলো :

চইলা গ্যালো ভিন-গাঁয়ে সে···

মেয়েটি দাঁড়িয়ে রইলো। সাপের মতো তার দু-চোখ জ্বলজ্বল করছে।

পৃথিবীতে আবার শিশির পড়ার সময় এলো।

গলি

কোনো রকমে থাকবার আস্তানা পাওয়া গেছে: গলির এই ছোট্ট ঘর। বিমলের আশ্চর্য সৌভাগ্য, সন্দেহ নেই। মাসে পঁয়ত্রিশ টাকা যার আয় কী করে সে সম্পূর্ণ পৃথক একটি ঘর নিজের জন্যে পেতে পারে? অবশ্য একে ঘর বলা কঠিন: এই গলির নিশ্বেস-বন্ধকরা ঘুপসি আবেষ্টনীকে। মনে হয় স্যাঁৎসেঁতে কোনো গুহা; একটা চাপা ভারি দুর্গন্ধ চারিদিকে। হাওয়া কখনো আসে: নিতান্ত নির্জিব, ক্ষীণ, ঝিরঝিরে। কিন্তু মাসিক বেতন যদি পঁয়ত্রিশ টাকা হতে পারে, এই আধ-অন্ধকার চতুর্দিক ঘেরা জায়গাটিকেও স্বচ্ছন্দে ঘর বলা যায় বৈকি!

বিমলের পঁয়ত্রিশ টাকার জীবন। বাহুল্য নেই, বিলাস নেই। পঁয়ত্রিশ টাকার কাঁচি চালিয়ে জীবনকে সে ছোটো আর আঁটসাঁট করে ফেলেছে। তবু মাসের পয়লা তারিখে সে যে নির্বিঘ্নে কিছু টাকা পায়, সে একলা যে থাকতে পায় গোটা একটি ঘরে, এটাই তার সৌভাগ্য। এ-ঘরে আলো নেই, বাতাস নেই, বৈচিত্র্য নেই, সৌন্দর্য নেই—তবু একটা স্বাধীনতা আছে। একলা একটি ঘরে থাকবার সূক্ষ্ম বিলাসও মনে-মনে সে অনুভব করে।

গলির অনেক ভিতরে এক পুরোনো বাড়ির একতালায় এই ভাঙা ছোটো ঘর। সরীসৃপের কঙ্কালের মতো এই সরু সংকীর্ণ গলি অনেক এঁকেবেঁকে ক্লান্ত করুণ ভঙ্গীতে কোনো রকমে দুটি রাজপথকে ছুঁয়ে পড়ে রয়েছে: পিচ-বাঁধানো, আলোয় উজ্জ্বল, চওড়া বড় পথ। বাইরের পথে

কত পরিবর্তন হোলো কিন্তু এ-গলির কোনো পরিবর্তন নেই। পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগেকার সেই পুরোনো গ্যাসের আলো, একটা কাঁচ বছর পাঁচেক ধরে ফাটা।

প্রতি বর্ষায় ময়লা জল দাঁড়ায়। ছপছপ শব্দ করে লোকে আনাগোনা করে।

উপরে চাইলে আকাশের সংকীর্ণ একটি রেখা চোখে পড়ে, ধারালো আর তীব্র আর উজ্জ্বল। অন্ধকার গলির লোকেরা উপরে চায় না, অত আলো আর উজ্জ্বলতাকে তারা ভয় পায়। পুরোনো পৃথিবীর উপর মুখ গুঁজে এই গলি আর তার লোকেরা পড়ে থাকে।

এখানকার বাড়িগুলিও নতুন নয়। কবে তৈরি হয়েছিলো বলা কঠিন। বাঁকাচোরা হাড়বারকরা শ্যাওলাধরা সব বাড়ি। প্রায়ই নানা বাড়ি থেকে চীৎকার গালাগালি শোনা যায়, সন্ধ্যায় গানও হয় অবিনাশবাবুর বাড়ি থেকে। তাঁর মেয়ে বহুদিন থেকে পনেরোয় আটকে গেছে। কিছুতেই পাত্র জুটছে না। অবিনাশবাবু এবার সংগীতের শরণাপন্ন হয়েছেন। মেয়েটি প্রত্যহ গলা সাধে।

এখানে যারা থাকে তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকের অবস্থাই বিমলের চেয়ে খারাপ। সে একলা। এটা কম সৌভাগ্য নয়। তার মাসিক পঁয়ত্রিশ টাকা শুধু তার নিজেরই। তা ছাড়া চমৎকার একটা সম্ভাবনা আছে। সেটা পঞ্চান্নর। অর্থাৎ, তাদের আপিসের অনুকূলবাবু এ-মাসের শেষেই পেনসেন নেবেন। তাঁর মাসিক পঞ্চান্নর আসনে বিমল বসতে পারে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সুনজরে সে আছে। তা ছাড়া নামের পিছনের এম-এ ডিগ্রিটাও এতোদিনে বোধ হয় কাজে আসবে। যারা পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চান্নর আসন দখল করে আছে তারা কেউ এম-এ নয়। অনেকেই এ-কারণে মনে-মনে অসন্তুষ্ট। মুখে বলে, "বেশ আছেন মশাই!"

মন্দ কী? বিমলও মনে-মনে ভাবে। সত্যিই সে বেশ আছে।

তার মাইনের টাকা থেকে ঘর ভাড়া দিতে হয় পাঁচটাকা। মাইনের সাতভাগের একভাগ। মনে-মনে হিসেব করে বিমল হাসে। এ-বিষয়ে আপিসের বড়সায়েবের সঙ্গে তার আশ্চর্য মিল। তিনি মাইনে পান একুশ-শ', বাড়িভাড়া দেন তিন-শ' করে। অর্থাৎ মাইনের একের-সাত ভাগ।

বহুবার এই গলি সম্বন্ধে নানা গুজব শোনা গেছে। ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট নাকি শিগগীরই এখান দিয়ে একটা রাস্তা ফোটাবে: এই রুগ্ন গলির চিহ্ন আর থাকবে না, এই বিকলাঙ্গ পঙ্গু বাড়িগুলি ধূলিসাৎ হবে। গলির বাসিন্দারা চড়া দামে তাদের বাড়িগুলো বিক্রী করার স্বপ্ন দেখে। আশ্চর্যের বিষয় বিমলও মনে-মনে আশ্বস্ত হয়: কেন হয় জানে না। এ-গলি অদৃশ্য হলে আবার পাঁচ টাকা ভাড়ায় গোটা একটি ঘর কোথায় সে পাবে জানা নেই। কিন্তু পৃথিবীতে যে এই পচা স্যাঁৎসেঁতে গলি আর থাকবে না, সে-কথা ভাবতেই নিজেকে তার হালকা লাগে। এই গলি একটি অদৃশ্য অজগরের মতো তাকে যেন পিষছে। লুপ্ত হোক, অদৃশ্য হোক এই গলি। যে ফালি-আকাশ ধারালো তরোয়ালের মতো এর উপরে রয়েছে, যেখানে আশ্চর্য আলো আর অপরূপ তীক্ষ্ণতা, সে-আকাশের ছায়ায় যেন ছেয়ে যায় এখানকার পৃথিবী—বিমলের অস্পষ্ট বোবা প্রার্থনাকে হয়তো লিখলে এই দাঁড়াবে। কিন্তু সে সম্ভাবনা কবে যে সফল হবে কেউ জানে না।

এই রুগ্ন গলি যেন শাপগ্রস্ত সরীসৃপ। হাজার বছর ধরে যেন তার রুগ্ন বিকলাঙ্গ দেহ নিয়ে এখানে পড়ে আছে, পড়ে থাকবে। কবে যে আসবে তার মুক্তির দিন কেউ জানে না, বিমলও না।

ইকমিক কুকারের বাটিগুলো ধোবার আর সময় নেই। আপিসের সময়

হয়ে গেছে। ময়লা লুঙ্গিটা বদলে ফরসা ধুতি-পাঞ্জাবী পরে এখুনি তাকে রওনা হতে হবে। এই ব্যস্ততাটুকু তার ভালোই লাগে। নিজেকে সক্রিয় করে তবু মনে হয় বেঁচে আছে।

চুল আঁচড়াতে-আঁচড়াতে এখানকার লোকেদের কাটাকাটা কথা সে শুনতে পায়। স্বর শুনেই প্রত্যেককে চিনতে পারে।

দুটো বাড়ি পরেই মিত্তিরদের বাড়ি। সবে সেখানে দোতলা উঠেছে। এ-নিয়ে মিত্তিরমশাই-এর যুবতী স্ত্রীর বেশ একটু অহঙ্কার। সামনের একতলা বাড়ির বৌকে দোতলার জানালা থেকে সে বলছে, "কী দিদি রান্নার পাট চুকলো?"

"কৈ ভাই! এই সবে ওঁর জন্যে ভাতেভাত নামালুম। যে তাড়াহুড়ো! উনুনতাতে আর পারিনে।" একতলা বাড়ির বৌটি নেহাৎ ভালো মানুষ। খুব বেশিদিন বিয়ে হয়নি। নতুন সংসারকে কিছুতেই নিজের আয়ত্বে আনতে পারছে না।

মিত্তিরগিন্নী খোঁটা দেবার লোভ সামলাতে পারলো না। "তুমি অবাক করলে দিদি। এতোক্ষণে শুধু ভাতেভাত! আমার তো কোন সকালে রাঁধাবাড়া হয়ে গেছে। এখন একটু হাওয়া খাচ্ছি। যাই বল ভাই, দোতলায় থাকার আরাম আছে! কী সুখে যে তোমরা একতলায় থাকো বুঝতে পারিনে! নীচে নামলে আমি তো আধসেদ্ধ হয়ে যাই।"

বিমল ময়লা ভিজে গামছায় চিরুণীটা পরিষ্কার করতে লাগলো। এখন ঠিক সাড়ে ন'টা। বাস ধরতে মিনিট সাতেক। তারপর ডালহাউসি স্কোয়ার পনের মিনিট। তা হলেও কয়েক মিনিট হাতে থাকে। আজ ছ'বছর ধরে এই হিসেবের ভুল হয়নি। কোনো দিন সে লেট হয়নি আপিসে।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হতে ব্যস্তভাবেই বিমল বললো, "কে?

ভেতরে এসো।" টিনের বাক্সটার উপর গামছাটা ছুঁড়ে ফেলে বিমল ক্ষিপ্রহাতে বাসের টিকিট, মনিব্যাগ, রুমাল, ইত্যাদি খুচরো জিনিসগুলো পকেটে রাখতে লাগলো।

ঘরে এলো কুচকুচে কালো চেহারার বেঁটে একটি লোক। বসন্তের দাগে ক্ষতবিক্ষত মুখ। ঘাড় কামানো, মাথায় টেরি। কলপ উঠে যাওয়ায় সাদা আর বাদামী চুল দেখা যাচ্ছে। খালি গা। গলায় মালার মতো জড়ানো মোটা ময়লা পৈতে। সামনের কয়েকটা দাঁত নেই। কাপড়টা দু-ভাঁজ করে লুঙ্গির মতো পরা।

"ফণিদা যে! খবর কি?" ব্যাস্তভাবে বললো বিমল। সে জানে এই লোকটির সময় সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান নেই। একবার একটু আলগা ভাব দেখিয়ে কথা বলতে আরম্ভ করলে লেট হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

"এর মধ্যে, আপিস চলেছিস?"

"এর মধ্যে আর কৈ ফণিদা? সাড়ে ন'টা তো বেজে গেছে! হঠাৎ কী মনে করে?"

"না, এমন কিছু জরুরি কাজ নয়। সেই টাকাটা নিতে এসেছি।"

নিতান্ত সহজ সুরে "ও" বলে বিমল টিনের বাক্স থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বার করে দিলো।

নোটটা ডানদিকের ট্যাঁকে গুঁজে বাঁদিকের ট্যাঁক থেকে বিড়ি বার করে ফণী প্রশ্ন করলো, "বিঁড়ি খাবি?" তার যাবতীয় জিনিস ট্যাঁকেই থাকে।

"দাও একটা।"

বিড়ি ধরিয়ে তালাটা তুলে নিয়ে বিমল বাইরে এসে দাঁড়ালো। ফণীকে কিছু বলতে হোলো না। পিছন-পিছন সে-ও এলো বাইরে।

তালা বন্ধ করে বিমল টেনে দেখলো ঠিক আছে কিনা।

"চল, বাসে তুলে দিয়ে আসি।"

"চল।"

যেতে-যেতে যেন নিজের মনেই ফণী কথা বলে চললো। সব কথা মন দিয়ে শোনবার প্রয়োজন নেই। মোড়ের দোকানে পান কিনলো বিমল। এক খিলি ফণীকে দিলো। পানের বোঁটা থেকে জিভ দিয়ে অনেকটা চূণ চেটে নিয়ে ফণী হঠাৎ বললো, "জানিস, ডানলপে একটা চাকরি পেয়েছি। ষ্টার্টিং পঞ্চাশ, ফিউচার আছে।"

খবর শুনে বিমলের মুখের ভাব বিশেষ বদলালো না। ইতিপূর্বে ফণী বহুবার চাকরি পেয়েছে, কিন্তু নিজের দোষেই সেগুলো গেছে। বাস্তবিক, লোকটার গুণ আছে অনেক, কলকারখানার ব্যাপার, বিশেষ করে মোটর ইঞ্জিনিয়ারিং, সে খুব ভালো জানে। কিন্তু স্বভাবদোষে কোথাও টিকে থাকতে পারেনি। সাজ্যাতিক নেশা করে লোকটা। এমন নেশা নেই যা করেনি। নেহাৎ অসুরের মতো স্বাস্থ্য বলে এখনো টিকে আছে।

বিমলকে নিরুত্তর দেখে সে বললো, "কি রে! কথা বলছিস না যে? মাইরি," খুব অন্তরঙ্গ হতে চেষ্টা করে ফণী বললো, "দেখে নিস, এবারে মন দিয়ে কাজ করবো। ও-মাসেই বাড়ি ভাড়া করবো।" একটা চোখের ইসারা করে ফণী বললো, "ওনাকে নিয়ে আলাদা না থাকলে আর পোষাচ্ছে না ভাই!"

সত্যি, লোকটা অন্তরঙ্গ হতে চেষ্টা করলে বিমলের ইচ্ছে করে তার বাকী কটা দাঁত উড়িয়ে দিতে! সমস্ত ভিতরটা যেন ঘিনঘিন করে। কোনো কথা না বলে বিমল ট্রামরাস্তার দিকে চললো। অনাহুত ফণীও চললো সঙ্গে।

"অন্য বাড়িতে উঠে গেলে খুব কিছু কেলেঙ্কারি হবে?"

বিমলের ইচ্ছে হোলো বলে "কেলেঙ্কারির কিছু কি বাকী আছে?" কিন্তু ফণীর সঙ্গে সে-আলোচনায় একবার যোগ দিলে সময়মতো আপিস পৌঁছনো অসম্ভব। তাই বললো, "আপিস থেকে ফিরে সে-সব কথা হবে ফণীদা। বাস এলো, চলি।"

একটা চলন্ত বাসে কোনা রকমে সে উঠলো। ভীষণ ভিড়। প্রায় ঝুলতে-ঝুলতে যেতে হবে।

যেতে-যেতে কত রাজ্যের এলোমেলো কথা মনে হয়: সে, আপিস, ফণী, ছুটি, অনুকুলবাবু, মিনতি, গলি, পঞ্চান্ন——মাসে পঞ্চান্ন টাকা। অনেক কথা। তবে ফণীর কথাই আজ বারবার মনে হতে লাগলো। ——গতকাল সন্ধেয় আপিস থেকে ফিরে বিছানায় সে নির্জিব হয়ে পড়েছিলো এমন সময় দরজার শেকলটা ঝনঝন করে উঠলো। তার দেহের সমস্ত গ্রন্থী শিথিল। ঠিক আলস্য নয়, অবসাদ আর ক্লান্তি। সমস্ত দিন আপিসের আবহাওয়ায় জীর্ণ হয়ে সে যেন ছিবড়ে হয়ে গিয়েছিলো। একটা বিড়ি ধরাবার মতো শারীরিক পরিশ্রম করতেও তার ইচ্ছে হচ্ছিলো না। খুব অস্পষ্টভাবে ভাবছিলো কবে এই বিষাক্ত রুগ্ন সরীসৃপের মতো গলি বাঁকানো আকাশের আশ্চর্য তীক্ষ্নতায় ছিন্ন হয়ে মুক্তি পাবে। এমন সময় দরজার শেকল ঝনঝন করে উঠলো আর তার উত্তরের অপেক্ষা না রেখে অস্পষ্ট অন্ধকারে ঘরে এলো যেন একটি ছায়ামূর্তি।

"কে ?"

"আ-মি-ফ-ণী।"

আর বলতে হোলো না। বিমল বুঝলো ইতিমধ্যেই কোন সুযোগে ফণী নেশা করে এসেছে। রাগে সর্বাঙ্গ যেন জ্বালা করে উঠলো। বললো, "তুমি ফণী তা বুঝলুম। কিন্তু এ-অবস্থায় এখানে কেন ? বলেছি না, নেশা করে আমার ঘরে এসোনা ?"

ফণী বোধহয় সামান্য লজ্জিত হোলো। "হেঁ-হেঁ, সে-কথা মনে আছে রে। কিন্তু একটা দরকারে··· "

তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠে বসে বিমল বাধা দিলো, "তোমার দরকার তোমার থাক। আমি এক পয়সাও দিতে পারবো না। কিচ্ছু নেই। এখন এসো।"

ফণী হাৎড়ে-হাৎড়ে ট্যাঁক থেকে একটা নোট বার করে জড়ানো স্বরেই বললো, ''না-না, দিতে বলছি না। এইটে রাখ দিকি তোর কাছে। কত টাকার দেখে নে! সঙ্গে টাকা থাকলে তো সব শালা বোতলের পেছনেই খরচা হবে। কাল নিয়ে যাবো।”

ছায়ামূর্তির মতো ফণী টলতে-টলতে বেরিয়ে গেলো। নোটটা নিয়ে সামান্য লজ্জিত হয়ে বসে রইলো বিমল। আর সেই মুহূর্তে অভিশপ্ত গলির বিষাক্ত বাতাস যেন তার নিশ্বেস বন্ধ করে দিলো।

এই ফণী লোকটার কেলেঙ্কারির কথা গলির বাসীন্দাদের কাছে এখন পুরোনো হয়ে গেছে। লোকটা বিপত্নীক। থাকে তার ভাই-এর বাড়িতে। এই গলির মধ্যেই সে-বাড়ি। ভাই-এর সঙ্গে ফণীর ভালো বনে না। প্রায়ই তাদের চীৎকার গালাগালি শোনা যায়। এখানকার আবহাওয়ার সঙ্গে অবশ্যই তা খাপছাড়া নয়। উভয় পক্ষই গলা সপ্তমে তুলে চীৎকার করে। মনে হয় বুঝি খুন-টুন কিছু একটা হোলো। কিন্তু পরের দিন যথা নিয়মে ফণীকে দেখা যায় সুস্থ শরীরে গলির মোড়ে ট্যাঁক থেকে বিড়ি বার করে টানছে। দুর্গা-প্রতিমার অসুরের মতো তার চেহারা। তবে আরও অনেক বুড়ো: সামনের দাঁত নেই,মাথার কলপ খাপছাড়াভাবে উঠে গেছে, কাঁচাপাকা বাদামী চুল। চোখ দুটো ঘোলাটে। পরিচিত লোক দেখলে বিনা দ্বিধায় হেসে চলেছে। কাউকে বা ধরে গল্প জুড়ে দিয়েছে।

এ-ভাবে সময় মন্দ কাটছিলো না। সবাই অভ্যস্ত ছিলো। আশ্চর্য তাড়াতাড়ি গলির লোকেরা সবকিছুতে অভ্যস্ত হয়ে যেতে পারে।

কিন্তু মাস তিনেক আগে নতুন একটি ঘটনার সূত্রপাত হোলো। একদিন মাঝরাতে হঠাৎ শোনা গেলো মত্ত ফণীর চীৎকার, তার ভাই-এর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর আর একটি মেয়ের আর্তনাদ: “ও বাবা রে! মেরে ফেললে গো।”

গলির অনেক লোকই সে-রাত্রে তাদের বাড়ির সামনে জড় হয়েছিলো। এখানকার বৈচিত্র্যহীন জীবনে একটি ভয়ার্ত নারীকান্না তবু খানিকটা নতুনত্বের স্বাদ এনেছিলো।

"কী হোলো মশাই? কী হোলো?" গলির লোকের চীৎকার।

"থাম মাগী, নইলে খুন করবো।" ফণীর হুঙ্কার।

"খুন করবো তোদের দুজনকে।" ফণীর ভাই-এর আস্ফালন।

"হোলো কী?"

হঠাৎ দোতালার জানালাটা শব্দ করে খুলে ফণীর ভাই শরীরের আধখানা বার করে বললো, "হবে আবার কী? মশাইরা সব বাড়ি যান।" আর তারপরেই অকস্মাৎ যেন যাদুমন্ত্রে সমস্ত গোলমাল স্তব্ধ হয়ে গেলো। কৌতূহলী জনতা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে-করতে আরো খানিক অপেক্ষা করলো। কেউ-কেউ বিড়ি ধরালো। কিন্তু সেই লোভনীয় গোলমাল আর শোনা গেলো না। বিমল তার পাঁচটাকার ঘরে ফিরে এলো। একে-একে সবাই গবেষণা করতে-করতে বাড়ি ফিরলো। পাড়া আবার শান্ত হোলো। কিন্তু বিমলের অনেকক্ষণ ঘুম আসেনি। অস্পষ্টভাবে যেন তার মনে হতে লাগলো এই গলির শাপগ্রস্ত আত্মা যেন একটি নির্যাতীত ভীত মেয়ের গলায় অন্ধকারে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

কানাঘুষোয় ক্রমশ যা প্রকাশ পেলো তা এই: ফণীদের দূর সম্পর্কের এক বিধবা আত্মীয়া কিছুদিন হোলো এখানে এসেছে। ফণীকে নাকি সে-রাত্রে মেয়েটির ঘরে দেখতে পাওয়া গিয়েছিলো।

উক্ত ঘটনার পুনরাবৃত্তি প্রায়ই হতে লাগলো। গলির লোকেরা কয়েকদিন ভিড় করে বাড়ির সামনে হাজির হোতো। ক্রমশ এ-ব্যাপারেও সবাই অভ্যস্ত হয়ে এলো। এখন আর কেউ যায় না। শুধু মাঝে-মাঝে মাঝ-রাত্রে ক্লান্ত কোলাহল শোনা যায়, একটি নিরুপায় নারীর অস্পষ্ট কান্না অনেকক্ষণ থামে না।

ফণীকে একদিন বিমল বলেছিলো, "ওকে নিয়ে আর কোথাও উঠে যাও না! কেন আর কেলেঙ্কারি বাড়াও?"

"তাইতো ভাবছি," উৎসাহিত হয়ে ফণী উত্তর দিয়েছিলো, "এবারে একটা চাকরি পেলেই—ব্যাস। কোন শালাকে আর কেয়ার করি।"

সেই ফণী আজ চাকরি পেয়েছে। (অবশ্য এ-চাকরি তার কতদিন থাকবে কেউ জানে না। সে ঠিক করেছে অন্য কোথাও উঠে যাবে। কিন্তু এই চরম মুহূর্তে একটু দ্বিধা এসেছে তার মনে: কেলেঙ্কারি! আশ্চর্য, ফণীর মধ্যে যে এ-ধরণের দুর্বলতা ছিলো বিমল সে-কথা কল্পনাও করতে পারেনি।

আপিসের সামনে বাস এসে দাঁড়ালো। সে নামলো। বেজায় ভিড়। বাইরের বড় ঘড়িতে দশটা বাজতে মাত্র দু-মিনিট দেরি। আশ্চর্য। নিশ্চয়ই তার টাইমপিসটা আবার স্লো হতে আরম্ভ করেছে। " দু-হাতে ভিড় ঠেলে চারতলার উপরে আপিসঘরে হাঁপাতে-হাঁপাতে এসে খাতাটা টেনে নিলো। তারপর ক্রমশ হিসেবের অঙ্কের ভিতর মন থেকে তার মিলিয়ে গেলো ফণী আর তার চাকরি, সেই গলি আর তার শ্বাসরুদ্ধ-করা পাঁচটাকার ঘর। আপিসে এলে সে যেন আর মানুষ থাকে না। একটা বিরাট চাকায় সে যেন আটকে যায়। সময় ঘোরে। চাকা ঘোরে। বিমল যেন যন্ত্র হয়ে যায়।

কথাটা কানে এলো টিফিনের সময়। ছোটো আর মর্মান্তিক খবর। বড় সায়েব, যিনি মাসে তিন-শ' টাকা বাড়ি ভাড়া দেন, অনুকুলবাবুর জায়গায় অন্য লোক নির্বাচন করেছেন। ইতিমধ্যেই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ভাগ্নের মধ্যস্থতায় খবরটা আপিসময় ছড়িয়ে পড়েছে। অনেকেই মনে-মনে

খুসি হয়েছে। যাক, য়ুনিভার্সিটির ডিগ্রির জোরেও প্রতিযোগিতায় বিমল পারলো না!

আপিসের মধ্যেই একটি ছোটো চা'য়ের দোকান। কেরাণীরা বাইরে দাঁড়িয়ে ভাঙা পেয়ালায় চা খায়। বসার ব্যবস্থা নেই। সময়টুকু ভালোই কাটে। অনেকেই শুধু গরম চা-তেই সন্তুষ্ট, কেউ-কেউ পুরো এক পেয়ালা চা খাবার মতো বিলাসিতাকে প্রশ্রয় দিতে পারে না। কিন্তু বিমলের ক্ষিদে এখনো প্রচুর। চা-য়ের সঙ্গে অন্তত দুটো টোষ্টের বদ-অভ্যেসটুকু এখনো ছাড়তে পারেনি।

টিফিনের সময় আজ সে খেতে ভুলে গেলো। বারন্দার রেলিঙের পাশে দাঁড়িয়ে অন্যমনস্কভাবে সে শুধু একটা বিড়ি ধরালো। —এ তো সে জানতোই! অকস্মাৎ পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চান্নয় কখনই যেতে পারবে না! বাইরের জ্বলন্ত আকাশ ধারালো আর তীব্র। শুধু দক্ষিণ দিকের অদ্ভুত কালো ঘন মেঘ ক্রমশ যেন ফেঁপে উঠছে।···অদ্ভুত, অদ্ভুত তোমার ক্ষমতা, মেঘ! ···সেদিকে চেয়ে অন্যমনস্কভাবে বিমল আবার ভাবলো : এ তো সে জানতোই। তবু যে কেন গলার ভিতরটা শুকনো আর আঠা-আঠা হয়ে আসছে সে বুঝতে পারলো না। অন্যমনস্কভাবে সে বিড়িতে টান দিয়ে চললো। শেষ হোলো টিফিনের অবকাশটুকু। ঘাড় নীচু করে বিমল আহত জন্তুর মতো আবার চেয়ারে এসে বসলো।···সে তো জানতোই সৌভাগ্যের শক্ত লাঠি মুঠোর মধ্যে না থাকলে এই উঁচু ধাপগুলো পেরিয়ে আসা সম্ভব নয়, এই পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চান্নয়।···আবার চাকা ঘুরলো। বিরাট চাকায় সে যেন আটকে গেছে ছোট্ট স্ক্রুর মতো।···ক্রমাগত সে ঘুরতে থাকবে। দাঁত পড়বে, চুল শাদা হবে, কিন্তু তখনো এই নির্মম পঁয়ত্রিশ টাকার গণ্ডী পেরিয়ে সে বেরিয়ে আসতে পারেনি। সমস্ত দেহ কেটে-কেটে ততদিনে এই পঁয়ত্রিশ টাকার বর্ম কঠিন হয়ে বসেছে।··· তখন সে কি তার পাকা চুলে কলপ ব্যবহার করবে ফণীর মতো, আর

কলপ ফিকে হয়ে এলে দেখা যাবে কি তার একমাথা কালো আর বাদামী আর শাদা চুল ?...চাকা ঘুরতে লাগলো। তার আর পৃথক সত্তা নেই। সে বিমল নয়, সে কেউ নয়, মাত্র পঁয়ত্রিশ টাকায় কেনা ছোট্ট একটা স্ক্রু।

আলো কখন কমে এসেছে। দক্ষিণ আকাশের মেঘ সমস্ত আকাশকে অনেকক্ষণ গ্রাস করেছে। আকাশ নিংড়ে ঔজ্জ্বল্যটুকুকে নিয়েছে শুষে। খানিক আগে চাপরাশি বিদ্যুতের বাতি-গুলো জ্বালিয়ে দিয়েছে। জানালাগুলো বন্ধ। উপরে পাখা ঘুরছে। একটা ভ্যাপসা গরম। ইস্পাতের ব্লেডগুলো এই জমাট চাপা গরমকে যেন বারবার কাটবার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। কাজের ফাঁকে বিমল একবার শুধু কলম নামিয়ে ঘাড় তুলে দেখেছিলো। অন্য কেরাণীরা চেয়ারের পিঠে কোট বা চাদর রেখে ঘাড় গুঁজে কাজ করছে। কতকগুলো ফাইল বগলে নিয়ে সুপারিনটেণ্ডেণ্ট বড় সায়েবের ঘরে গেলো। কাঁচের জানালায় বর্ষাফলার মতো ধারালো বৃষ্টি এখন আর নেই, ক্লান্ত করুণ অস্বস্তিকর বৃষ্টির জল শুধু গড়িয়ে-গড়িয়ে পড়ছে। এই ভ্যাপসা আবেষ্টনী যেন চাপা আর্তনাদ করছে। বিমল আবার মাথা নীচু করলো আর সেই বিকলাঙ্গ রুগ্ন গলির কথা তার মনে এলো। সেখানে নিশ্চয়ই আজ ময়লা জল জমেছে, রাস্তার আবর্জনা ভাসছে তার উপর, ছপ-ছপ করে বাড়ি ফিরতে হবে। গলির উপরকার বাঁকানো আকাশটুকুর উজ্জ্বলতা আজ মুছে গেছে। তার পাঁচটাকার ঘরে নিশ্চয় এখন থেকেই অন্ধকার বাসা বাঁধতে সুরু করেছে।

প্রায় সোয়া সাতটার সময় আপিস থেকে বিমল বাইরে এলো। বর্ষার উত্তেজনা এখন আর নেই। নবযৌবনের পেশীর মতো কঠিন কালো মেঘ এখন শিথিল আর ঘোলাটে হয়ে এসেছে। টিপিটিপি বৃষ্টি পড়ছে। পথে বিদ্যুতের আলো জ্বলে উঠলো। কেরাণীর দল হাঁটুর উপর কাপড় তুলে ভিজতে-ভিজতে চলেছে। একটি দিন শেষ হোলো, দুঃস্বপ্নের মতো তাদের

জীবনের একটি দিন। এ-রকম আরো কত দিন তাদের জন্যে ওৎ পেতে বসে আছে, আরো কত দুঃস্বপ্ন, কে জানে !

ফিরতি বাসেও ভীষণ ভিড়। আজকে কি যেন একটা দারুন খেলা ছিলো। ঝুলতে-ঝুলতে সে চললো। বাঁ দিকের জামা বৃষ্টিতে ভিজছে। এখন কোথায় সে যাবে? নিজের অপরিচ্ছন্ন ঘরের কথা মনে হোলো: বিছানায় ছাড়া ময়লা লুঙ্গি, 'এক কোনে ইকমিককুকারের বাটিগুলো, ভাত আর ডাল এতোক্ষণে শুকিয়ে নিশ্চয়ই কড়কড়ে হয়ে গেছে, বাক্সর উপর ছেঁড়া গামছা। ভ্যাপসা দুর্গন্ধময় অন্ধকার। অবিনাশবাবুর মেয়ে নিশ্চয়ই গলা সাধছে। পাশের বাড়ির উনুনের ধোঁয়া তার ঘর থেকে এখনো বোধ হয় মিলিয়ে যায়নি।

গলিতে সে আর এলো না। এলো মিনতিদের বাড়ি: দোতলা, অন্ধকার, অপরিচ্ছন্ন বাড়ি। অন্তত আজকের দিনে এখানে আসবার তার এতোটুকু ইচ্ছে ছিলো না। তবু কেন যে এলো নিজেই জানেনা! কেন এলো সে?

ছোকরা চাকরটা বাইরের সিঁড়িতে বসে বিড়ি টানছিলো। বিমলকে দেখে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় বিড়ির লালচে মুখটা মাটিতে রগড়ে নিভিয়ে উঠে দাঁড়ালো, তারপর একমুখ হেসে বললো, "আসুন দাদাবাবু।"

একটা অকারণ রাগে বিমলের সমস্ত শরীর কয়েক মুহূর্তের জন্যে যেন জ্বালা করে উঠলো। ছোকরার হাসিতে-উজ্জ্বল মুখটা বিড়ির মতো মাটিতে রগড়ে নিভিয়ে দিতে ইচ্ছে হোলো বিমলের!

খামোকা একটা অনাবশ্যক প্রশ্ন করলো বিমল। "কাকাবাবু কোথায় রে?" তারপর এই অসংলগ্ন প্রশ্নের জন্যে মনে-মনে রীতিমতো লজ্জিত হয়েই অন্য কোনো কথা না বলে ভিতরে ঢুকলো।

দোতলার উত্তরের ঘরে আজ আট বছর বিপিনবাবু পঙ্গু হয়ে পড়ে আছেন এবং এই আট বছর ধরেই বিমল এ-বাড়িতে ক্রমাগত আসছে।

অতএব আজ সন্ধেয় বিপিনবাবু কোথায় আছেন এ-প্রশ্ন করবার কোনো মানে হয় না।

আট বছর আগে কোন বিশেষ একটি ব্যাঙ্ক ফেল হবার আঘাত বিপিনবাবু সহ্য করতে পারেননি। তাঁর সমস্ত সঞ্চিত অর্থের শোকে শরীর আর মন একদিনেই বিকল হয়ে গিয়েছিলো। পক্ষাঘাতে তাঁর শরীরের নীচের ভাগ পঙ্গু হয়ে গেছে। মাথারও ঠিক নেই। এখনো এলোমেলো কথা বলেন, কিছুই গুছিয়ে ভাবতে পারেন না, কথায়-কথায় খিটখিট করেন, রেগে ওঠেন। যে আপিসে কাজ করতেন ইনভ্যালিড পেনসন হিসেবে সেখান থেকে মাসেমাসে কিছু আসে। থাকবার মধ্যে আছে এই অর্দ্ধসমাপ্ত বাড়ি। নিজের সুদিনে এই বাড়ির ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিলো আধখানা উঠেই আজ পর্যন্ত থেমে রয়েছে, বোধ হয় চিরকালের জন্যেই।

অত্যন্ত টানাটানির সংসার। একটি পঙ্গুলোকের পেনসেনের টাকার উপর নির্ভর করে কোনো রকমে টিমটিম করে সংসার চলে। বিপিনবাবুর স্ত্রী আর মেয়ে ছাড়া সংসারে আর কেউ নেই। নিজেরাই তার রান্নাবান্না ও সংসারের টুকিটাকি সমস্ত কাজ করে। তা ছাড়া আছে একটি আধপাগলা বদমেজাজী পঙ্গু লোকের পরিচর্যা। বাচ্ছা চাকরটা বাজার করে দেয়, আর বাড়ির বাইরের কাজগুলো করে।

মিনতি বিপিনবাবুর মেয়ে। আটবছর আগে বিমল তাকে প্রথম যখন দেখেছিলো তখন তাদের দুজনেরই নতুন যৌবন। এই আট বছর পরে কত পরিবর্তনই না হয়েছে! বোধ হয় নিজেদের যৌবনের কথাই তারা ভুলে গেছে।

বিপিনবাবু জানেন, তাঁর স্ত্রী জানেন, ছোকরা চাকরটাও জানে যে একদিন মিনতিকে বিমল বিয়ে করবে। কয়েক দিন ধরে বিমল অপেক্ষা করে আছে চাকরির উন্নতির জন্যে। পঞ্চান্নয় উঠতে পারলেই সে বিয়ে করবে। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আজ অনেকদিন পরে একটা উত্তেজনায়

য়ে বিমলের বুকটা ধ্বকধ্বক করে উঠলো। তার ভিতরটা যেন শুকিয়ে গলো। এই অর্দ্ধসমাপ্ত জীর্ণ বাড়ির মতোই তাদের বিয়ে কি থেমে থাকবে নির্দিষ্ট কাল কিংবা চিরকালের জন্মে ?

বিপিনবাবুর ঘরের বাইরে এসে বিমল দাঁড়ালো। বাইরের আকাশে এখনো সামান্য আলো আছে। ঘরের মধ্যেটা অন্ধকার। বিপিনবাবু নজের মনেই কথা বলে যাচ্ছেন। ঘরে কেউ না থাকলে নিজের মনেই লপড়া দেয়ালের সঙ্গে তিনি কথা বলে চলেন। ভিতরে এলো বমল। জানালার পাশে ইজিচেয়ারে বিপিনবাবুর প্রসারিত শীর্ণ দেহটা মাকাশের ঝাপসা আলোয় অস্পষ্টভাবে বোঝা যায়। পুরোনো কম্বলে কামর পর্যন্ত ঢাকা। কি শীত কি গ্রীষ্ম, আজ আট বছর বিপিনবাবু ই ভাবে আছেন। ভাবতেই অস্বস্তি লাগে।

বিমলকে ঢুকতে দেখে দেয়ালের সঙ্গে কথা থামিয়ে তিনি খনখনে বিরক্তিপূর্ণ গলায় জিগগেস করলেন, "কে হে, বিমল নাকি ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।" বিমল তাঁর কাছে জানালার পাশে এসে দাঁড়ালো। ইরের আকাশ থেকে এইবার সমস্ত আলো নিভে এসেছে। বিমলের খে বাইরের অন্ধকার-আকাশের ছায়া এসে নামলো।

ব্যাস, ওই পর্যন্তই হোলো তাদের কথাবার্তা। বিপিনবাবুর কি যেন খয়াল হোলো। চোখ বুজে চুপচাপ পড়ে রইলেন ঘুমের ভান করে। বিমলের কাছে এ-ঘটনাও নতুন নয়। সে জানে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেই আবার তিনি দেয়ালের সঙ্গে বাক্যালাপ সুরু করবেন।

দু-পক্ষই নিরুত্তর হয়ে বসে রইলো। এ আজ নতুন নয়। উভয়-ক্ষই থেমে গেছে। বহুদিন ধরেই উভয়পক্ষ স্তব্ধ।

ঘোলাটে কালো মেঘ চুঁইয়ে টিপিটিপি বৃষ্টি পড়তে লাগলো। রুগ্ন মানুষ, সন্ধেটাও যেন রুগ্ন। জানালায় হেলান দিয়ে বিমল বহুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। কারুর প্রত্যাশায় তার শরীর-মন একবারও কাঁপলো না।

শুধু বহুক্ষণ উপোষের জন্যে কোথায় যেন একটা অস্বস্তি। ঠিক কোথা জানে না।

আরো খানিক পরে লণ্ঠন নিয়ে বিপিনবাবুর স্ত্রী সে-ঘরে এলেন বিদ্যুতের আলো এখানে আজ পর্যন্ত প্রবেশ করেনি, সম্ভবত কোনোদি করবে না।

বিমলকে দেখে স্বাভাবিক স্বরেই প্রশ্ন করলেন, "কতক্ষণ এলে?"

"এই খানিকক্ষণ হোলো।"

"চা খবে?" কেরোসিন কাঠের ব্র্যাকেটের উপর হ্যারিকেনটা রাখলেন

"চা?" ফাঁকা গলায় কথাটার একবার প্রতিধ্বনি করে বিম বললো, "হ্যাঁ, খাবো।"

"দাঁড়িয়ে কেন? চেয়ারটায় বোস না!" বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন

"বসছি।" বললো বিমল, কিন্তু কার জন্যে বললো জানে না জানালার পাশে যেমন দাঁড়িয়েছিলো তেমনই রইলো।

বোধ হয় মিনিট পনেরো পরে মিনতি চা নিয়ে এলো। আবছা আলো তার মুখচোখ স্পষ্ট বোঝা যায়না। হ্যারিকেনের আলো তার শাড়ি একপাশে সামান্য উজ্জ্বল হয়ে পড়েছে। কয়লার আর হলুদের দা সেখানে। এখনো গা-ধোবার সময় পায়নি। ভালো করে তা বোঝা যায় না, কারণ আলোটা তার পিঠের দিকে। শুধু দীর্ঘ আর শী তার দেহের রেখাটিকে বোঝা যায়।

চা'য়ের পেয়ালাটা বিমলের হাতে দিয়ে সে খানিক খাটের কোনে ঠে দিয়ে দাঁড়ালো। বিপিনবাবুর দিকে আড় চোখে চেয়ে বললো, "কো খবর পেলে নাকি?

"কাজটার কথা জিগগেস করছো," পেয়ালায় চুমুক না দিয়েই মনে মনে অত্যন্ত নিষ্ঠুর হতে চেষ্টা করে সে বললো, "হ্যাঁ খবর পেয়েছি। আমা হোলো না, অন্য একজন পেয়েছে।"

কথাগুলো শুনে মিনতির মুখের ভাব কতটা বদলালো বোঝা গেলো না। কারন তার মুখের উপর আলো পড়েনি। শুধু বিপিনবাবু কোটরগত চোখদুটো খুলে দেয়ালের দিকে চেয়ে বললেন, "ও, তুমি পাওনি? অন্য আর একজন পেলো?" কেউ তার কথার উত্তর দিলো না। তাঁর আট বছরের পুরোনো ইজিচেয়ারে আবার চোখ বুজে পড়ে রইলেন।

বিমল মুখ নীচু করে চা'য়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে লাগলো।

খালি পেয়ালাটা নিয়ে মিনতি খানিক পরে বেরিয়ে গেলো। অল্প পরেই ফিরলো। বললো, "তুমি যেয়ো না, মা এখানে খেয়ে যেতে বলছে।"

এতোক্ষণে বিমলের যেন ভালো করে হুঁস হোলো। বললো, "না-না, আজ একটু কাজ আছে। এখন চলি।"

বিমল ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

"দাঁড়াও, আলোটা নিয়ে যাচ্ছি।"

"না-না, আলোর দরকার নেই," বলে অন্ধকার পেরিয়ে সদর দরজায় এসে দাঁড়ালো বিমল। বাচ্চা চাকরটা কোথায় আড্ডা দিতে পালিয়েছে।

দরজাটা খুলে বিমল খানিক থামলো। সে জানে মিনতি আসবেই। প্রত্যহই তাকে দরজার কাছ পর্যন্ত এগিয়ে দিতে আসে।

"কাল এসো," অন্ধকারে বোধ হয় মিনতির স্বর সামান্য কেঁপে উঠলো।

আর সেই অন্ধকারে তারা মুখোমুখি দাঁড়ালো। কী হোলো বিমলের কে জানে। হঠাৎ বিদ্যুতের মতো ক্ষিপ্রতায় মিনতিকে কাছে টেনে নিলো। তার দ্রুত তীব্র নিশ্বেসে ঝলমল করে উঠলো মিনতির শুকনো রুক্ষ চুল। আর সমস্ত দিনের মধ্যে মাত্র সেই মুহূর্তে তার মনে হোলো: এই গলি নিশ্চয়ই একদিন চূর্ণ হবে, একদিন সে উঠবে পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চান্নয়—— একদিন তারা পরস্পর পরস্পরকে পাবে!

মাটি

ইতিমধ্যেই এদিকে বেশ কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। আকাশ সদয় হয়েছে। আর ভয় নেই। এ-বছরে ভালো চাষ হবে, মহামারির আশঙ্কাও কম। তবু, এখনো সব ভয় কাটেনি। আরো কিছুদিন না গেলে কিছুই সঠিক করে বলা যায় না।

ইতিমধ্যেই লোহার ধারালো মুখ পৃথিবীকে বিঁধেছে। অনেকের জমিতেই লাঙল দেয়া হয়ে গেছে। আর দু-এক দিনের মধ্যেই ধান-বোনা সুরু হবে।

ইতিমধ্যেই চাষীরা স্বচ্ছল দিনের স্বপ্ন বুনছে: আগুনের শিখার মতো তীব্র ফসলের শিষ। মাটিতে আবার হয়তো ফসলের সবুজ আকাশ নেমে আসবে। এই সব স্বপ্ন।

এরা এতো গরীব, অথচ এতো সরল। আকাশের একটুখানি ইঙ্গিতেই এদের দৈন্যের মেঘ মন থেকে মিলিয়ে যায়। এরা ফসল নিয়ে বেঁচে থাকে না, মাটি নিয়ে না, বেঁচে থাকে নিজেদের মন নিয়ে।

এই সমস্ত কাটা-কাটা কথা ভাবতে-ভাবতে ডিসপেনসারি বন্ধ করবো ভাবছিলুম। গ্রামের মধ্যে এইটাই একমাত্র ডিসপেনসারি। সবাইকেই আসতে হয়। সবাইকেই চিনি।

রাত্রি বেড়ে উঠলো। গ্রামে তাড়াতাড়ি রাত ঘন হয়। ন'টা বাজতেই চারদিক নিঃঝুম। সিগারেটটা শেষ করে দরজা বন্ধ করবো ঠিক করেছি। এমন সময় অন্ধকারে কার পায়ের শব্দ পাওয়া গেলো। লণ্ঠনের

খানিকটা স্পন্দিত লালচে আলো, ছায়ামূর্তি, চঞ্চল ছায়া। থামলো। আমার দরজার কাছেই থামলো।

"কে হে ?"

"আজ্ঞে আমি নন্দ।"

"ও, তাই বল। আমি বলি কে না কে! তা এতো রাত্তিরে যে ? কী মনে করে ?"

এতোক্ষণে বাইরের ছায়ামূর্তি আমার ঘরের উজ্জ্বল আলোয় কঠিন ও বাস্তব হয়ে উঠেছে। একটু ঝুঁকেপড়া, শীর্ণ গ্রাম্য চাষা। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল। প্রৌঢ়। বয়েসের লাঙল তার কপালের উপর গভীর চিহ্ন এঁকেছে। অনেক অভাব আর দারিদ্র্য আর আশাভঙ্গের ইতিহাস সেখানে খোদাই করা। একটি জীবনের সম্পূর্ণ ইতিহাস। তার মুখের দিকে চেয়ে অনেক কথা ভাবা যায়: অনেক অজন্মা আর অনাবৃষ্টি, অনেক ঝড় আর বন্যা, অনেক দুর্ভিক্ষ আর মহামারী।

নন্দকে আমি খুব ভালো করে চিনি। এতো সহজ সে! আমার কাছে প্রায়ই আসে। কাগজের খবর শোনে, ছেলের গল্প বলে—অনেক খুঁটিনাটি প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় কথা। কোনো লাভ নেই। কিন্তু চমৎকার সময় কাটে। ভালো লাগে।

নন্দ'র ছেলের সঙ্গে আমার পরিচয় কলকাতায়। সেখানে আমার ডিসপেনসারির ঠিক পাশের মেসে সে থাকতো। আমার কাছে প্রায়ই আসতো: একটি গ্রাম্য ছেলে, চাষার ছেলে। কলকাতার কলেজে সে বিজ্ঞান পড়ে। একটু অদ্ভুত বৈকি। আর এতো তার উৎসাহ! তার চঞ্চল কালো চোখ আকাশের মতো। এতো গম্ভীর আর গভীর। অথচ চঞ্চল ও সক্রিয়। দীপ্ত আর উজ্জ্বল। ধারালো। বুদ্ধির ধারে তীক্ষ্ণ।

অদ্ভুত ছেলে। কৈশোর তাকে ছেড়ে গিয়েছে। সেখানে উদ্দাম যৌবন। একটি কালো গ্রাম্য ছেলে, যৌবনে-উদ্দীপ্ত। চোখে জয়ের আলো।

আমার সঙ্গে প্রায়ই তার অনেক আলোচনা হোতো। কথা বলার সময় নিজেকে সে হারিয়ে ফেলতো। সে বলতো সমুদ্র পেরিয়ে যাবে। সমুদ্রপারের দেশ থেকে বিজ্ঞানের অনেক নতুন জ্ঞান সে নিয়ে আসবে। মানুষের বদলে বিজ্ঞানকে সে কাজে লাগাবে, ভারতবর্ষের মাটিতে সোনা ফলাবে। বিজ্ঞান দিয়ে আমাদের দুর্ভাগ্যকে সে জয় করবে। বেশ মনে পড়ে আমার ডিসপেনসারির অন্ধকার কোণে বসে, সায়াহ্নের পাণ্ডুর আলোয় একটি গ্রাম্য ছেলে কতদিন নিজের ভবিষ্যতের কথা বলতে-বলতে যেন জ্বলে উঠেছে। কল্পনা তার সমস্ত দেহে-মনে আশার আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। তার নির্বাক চোখ কতদিন স্তব্ধ আর গভীর হয়ে গিয়েছে।

এই নন্দ'র ছেলে। আমাদের গ্রামের ছেলে।

আমাকে সে বলতো, "সুধীরদা, আপনার আর টাকার দরকার কী? আমাদের গ্রামে ডিসপেনসারিটা উঠিয়ে নিয়ে যান না! গ্রামের লোকদের ওষুধ আর ডাক্তারি সম্বন্ধে কুসংস্কার ভাঙুন। এ-কাজ আপনি ছাড়া আর কে করবে?"

আমিও মাঝে-মাঝে সে-কথা ভাবতুম। একদিন সত্যি-সত্যিই চলে এলুম। সেই থেকে এখানেই আছি।

নন্দ প্রায়ই আসে। ঐ ছেলে ছাড়া কেউই তার নেই। আমার কাছে অতি সঙ্কোচে ছেলের গল্প আরম্ভ করে। তারপর নিজেকে হারিয়ে ফেলে। তার কথার খেই হারিয়ে যায়। সে নিজেই আশ্চর্য হয়। কে জানতো তার ছেলে মোটা-মোটা বই পড়ে জলপানি পাবে! সমস্তই অবাস্তব বলে মনে হয় তার।

সমস্ত বছর ধরে সে অপেক্ষা করে থাকে কবে তার ছেলে দেশে আসবে। প্রত্যহ সে ঘর গুছিয়ে রাখে। আমার কাছে গল্প করে। আমার মুখ দিয়ে সে তার ছেলের প্রশংসা শুনতে চায়। তাকে আমি নিরাশ করি না। বলি, "তোমার ছেলে সাধারণ নয়। হীরের টুকরো ছেলে। হাজারে

একটাও বেরোয় কিনা সন্দেহ। আমি বাড়িয়ে বলছি না। দেখো, একদিন আমার কথা সত্যি হবে।”

নন্দ বুঝি মাঝে-মাঝে ভয় পায়। সে বুঝতে পারে না। নিজেকে সে বুঝতে পারে না। নিজের ছেলের সঙ্গে তার যেন ব্যবধান বেড়ে ওঠে। সে যেন ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। মনে-মনে হয়তো সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। হয়তো ভাবে তার ছেলে সাধারণ হলেই ভালো হোতো, সহজ হলেই ভালো ছিলো। অন্তত তার সবটা নন্দ তা হলে বুঝতে পারতো। নিজের ছেলের সবটা সে বুঝতে পারে না। ভালো লাগায় আর ভয়ে মাঝে-মাঝে নন্দ যেন কি রকম হয়ে যায়! খেই হারিয়ে ফেলে। সময়ের লাঙলে বন্ধুর কপাল তার আরো কুঁকড়ে ওঠে। তার ঝুঁকে-পড়া শীর্ণ দেহ মাটির দিকে আরো নেমে আসে। কাঁচাপাকা চুল হাওয়ায় ওড়ে। ক্রমশ সে যেন ছায়ামূর্তি হয়ে যায়, অবাস্তব হয়ে পড়ে। যেন কেমন হয়ে যায়।

তবু নন্দ তার ছেলেকে ভালোবাসে, ভয় করে, শ্রদ্ধা করে পূজো করে। তবু তার ছেলের গল্প শুনতে তার যেন নেশা ধরে যায়, তার অচেনা ছেলের। তবু প্রত্যহ সে অপেক্ষা করে ভাবে : একটা দিন শেষ হোলো, একটা দিনের ব্যবধান কমলো।

প্রতি ছুটিতেই নন্দ’র ছেলে গ্রামে আসে। একটি সহজ, সরল, গ্রাম্য ছেলে। নন্দ তাকে দেখে সুস্থ হয়। কৈ, সে তো কৈ বদলায়নি! কিন্তু দূরে চলে গেলেই নন্দ খেই হারিয়ে ফেলে। সে ভয় পায়!

এবারের গ্রীষ্মের বন্ধে তার ছেলে গ্রামে আসেনি। এইবার তার শেষ পরীক্ষা। কলকাতায় না থাকলে পড়ার সুবিধে হবে না।

“তাকে একটিবার আসতে লেখো না দাদাবাবু!” মাঝে-মাঝে, যখন ডিসপেনসারিতে কেউ থাকে না, নন্দ চাপা ফিসফিসে গলায় আমাকে অনুরোধ করে।

হেসে বলি, “অত ব্যস্ত হচ্ছ কেনো, পরীক্ষা তো শেষ হয়ে এলো বলে।

তারপর তোমার ছেলে অনেকদিন এখানে থাকবে। তাছাড়া এটা শেষ পরীক্ষা। এটা ভালো হওয়া চাই তো! এখানে এলে পড়াশুনোর অসুবিধে হবে। সব তো বোঝ!……”

নন্দও একটু দুর্বল হাসে।

বলে, “কাজ নেই আসতে লিখে।”

কিন্তু তবুও মাঝেমাঝে, ডিসপেনসারি যখন খালি হয়ে যায়, এই প্রৌঢ় ঝুঁকেপড়া শীর্ণ মানুষটি চুপিচুপি যেন কী কথা বলবার জন্যে উসখুস করে! লক্ষ্য করি অতিকষ্টে সে তার দুর্বলতাকে জয় করার চেষ্টা করছে।

কাঠের বেঞ্চিটা দেখিয়ে আবার বললুম, “বোস। এতো 'রাত্তিরে' যে? কী মনে করে?”

“আজ্ঞে দাদাবাবু, একটা তার এসেছে।”

“তার? কোথা থেকে? কৈ দাও, দেখি।”

এই গ্রাম্য লোকেদের কাছে বৈদ্যুতিক-বার্তা কখনো সুখবর বয়ে আনে না।

নন্দ তার উড়ুনির কোণে-বাঁধা ভাঁজকরা টেলিগ্রামটা আমার হাতে দিলো। আঙুলগুলো তার কাঁপছে। হাতের লাঠিটা শক্ত করে ধরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে। —নন্দ'র ছেলে কলকাতার পথে বাস চাপা পড়ে আজ মারা গেছে।

“কী খবর দাদাবাবু?”

খবর? কী করে বলি?

নন্দ'র কাছে এগিয়ে গেলুম। বললুম, “বোস নন্দ। তোমার ছেলে মানে ……”

কী করে বলি? নিজেরি গলা ধরে এলো।

এই শীর্ণ লোকটির চোখ এই রাত্রে অদ্ভুত হয়ে উঠেছে। সেখানে যেন অনেক কথার ভিড়! সেখানে যেন বিরাট শূন্যতা! ঠিক যে কী বোঝা গেলো না। যেন সত্যি নয়। নন্দ যেন মিলিয়ে যাচ্ছে, যেন ছায়ামূর্তি হয়ে যাচ্ছে।

"সে নেই। আমি জানতুম সে থাকবে না।" নন্দ আর কোনো কথা বললো না। তাকে বসালুম। সে আপত্তি করলো না। টেলিগ্রামের কাগজটা মন্থন করতে-করতে সে যেন ক্রমশ দূরে সরে যেতে লাগলো।

আশ্চর্য হলুম। যেন ঠিক হচ্ছে না। তার একমাত্র ছেলের মৃত্যু এতোটা নিঃশব্দে কী করে শেষ হতে পারে? সেই কালো গ্রাম্য ছেলের যৌবনে-উদ্দীপ্ত দেহ এতো সহজে শেষ হয়ে গেলো! ফুরিয়ে গেলো! তার চোখে জয়ের আলো জ্বলেছিলো। সে বলেছিলো বিজ্ঞান দিয়ে আমাদের দুর্ভাগ্যকে জয় করবে। সায়াহ্নের পাণ্ডুর আলোয় একটি গ্রাম্য ছেলের চোখ ভবিষ্যতের নেশায় জ্বলে উঠেছিলো। আজ সে ফুরিয়ে গেলো।

আধঘণ্টা চুপচাপ। অনেকগুলো সিগারেট পুড়লো। ভেবে দেখলুম আজ রাত্রে তার আমার কাছে থাকাই ভালো। একা ফিরে গিয়ে সে কী করবে?

তাকে সে-কথা বললুম। কোনো উত্তর নেই। একবার শুধু আমার দিকে চাইলো আর কোনো কথা না বলে আবার মাথা নীচু করলো।

তার থাকার ব্যবস্থা করতে ভিতরে গেলুম। আমরা ডাক্তার। মৃত্যুর সঙ্গে আমাদের অসংখ্যবার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছে। আমরা চট করে সামলে উঠতে পারি।

মিনিট পনেরোর বেশি ভিতরে ছিলুম না। ফিরে দেখি নন্দ চলে গেছে। টেলিগ্রামটা মেঝেয় পড়ে। মনে-মনে, সত্যি কথা বলতে কি,

বেশ খানিকটা আশ্বস্ত হলুম। ভালোই হয়েছে এক রকম। এখানে তাকে রেখেই বা কী করতুম ?

ঘণ্টা খানেকের মধ্যে বিছানায় আশ্রয় নিলুম। কিন্তু ঘুম এলো না। উঠে পড়লুম।

না, দেখে আসি নন্দ কী করছে।

যে-সব রাতে ঘুম আসে না এই গ্রামের মাঠে ঘুরে বেড়াতে ভালো লাগে। বেরিয়ে পড়লুম।

দু-তিন দিন আগে পূর্ণিমা শেষ হয়েছে। আজকের কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ খানিকটা ক্ষয়ে-যাওয়া। তবুও প্রচুর আলো। পথ দেখতে অসুবিধে হয় না।

রাত্রির সঙ্গে দিনের গ্রামের অদ্ভূত তফাৎ। কেউ নেই। ফাঁকা। এতো অদ্ভুত ফাঁকা! কুঁড়ে ঘরে যেন কেউ থাকে না, তারা যেন মানুষের তৈরি নয়, লাঙল-চষা ক্ষেতগুলিতে কোনোদিন যেন কোনো মানুষের স্পর্শ পড়েনি!

প্রায় আধমাইল হাঁটতে হোলো। ছোটো একটা বাঁশের পোল পেরুতে হয়। কাদা আর জল চকচক করছে। সেখানে গুঁড়িয়ে গেছে চাঁদ। এর পর কয়েকটা বাঁশঝাড়। সমস্ত জায়গাটা সিরসির করে উঠলো। ও কিছু নয় বাতাস। বাঁশঝাড়ের হালকা পাতায় বাতাস রোমাঞ্চ জাগিয়েছে। এগিয়ে চললুম। কিছু দূরে নন্দ'র কুঁড়ে। চাঁদের আলো যেন কুয়াশা বিছিয়েছে। দূরে কোথায় একটা ক্লান্ত কুকুরের ডাক। আবার স্তব্ধতা। ঘুমের ঘোরে কাদের বাড়িতে ছোটো ছেলে কেঁদে উঠলো। রাত্রির স্তব্ধ হ্রদে মাঝেমাঝে এই ধরণের শব্দের পাথর পড়ছে। স্তব্ধতা আরো ঘন হয়ে ওঠে।

নন্দর কুঁড়ে ঘরটা এখান থেকে একরকম বোঝা যায়। তার ছেলে

আসবে বলে কিছুদিন আগে নতুন খড় দিয়ে চাল ছেয়েছিলো। ঝকঝকে নতুন খড়। সে তখন আসেনি। আর আসবে না।

এতদূর এসে মনে হোলো কী করবো আমি গিয়ে ? থাক। একলাই এখন ভালো। ও কাঁদুক। কান্নায় ভেঙে পড়ুক। কান্নাই এখন ওর একমাত্র সান্ত্বনা। ও কাঁদুক।

কিন্তু বাড়ি ফিরেই বা করবো কী ? একটা গাছের মরা-গুঁড়ির উপর বসে পড়লুম। ভাবছি আর একটা সিগারেট ধরাবো কিনা। মাথার উপর দিয়ে কয়েকটা বাদুড় রাত্রির আকাশে ডুব দিলো। তারা দূরে চলে গেলো। ক্ষয়ে-যাওয়া চাঁদ কয়েক মুহূর্তের জন্যে যেন গেলো নিভে। পাশের বাঁশঝাড়ে অস্পষ্ট সিরসির।

এমন সময়, না আমার চোখের ভুল হয়নি, দেখলুম নন্দ'র কুঁড়ে থেকে কে ধীরেধীরে বাইরে বেরিয়ে এলো। সামনে অনেকটা ঝুঁকে পড়েছে। পরনে শাদা থান, গায়ে শাদা চাদর। এই অস্পষ্ট আলোয় আরো সাদা বলে মনে হোলো। কোনো দিকে না চেয়ে সোজা সে মাঠের দিকে এগিয়ে চললো।

চমকে উঠলুম। দাঁড়ালুম। ওর চলার ভঙ্গী পরিচিত। না, ভুল আমার হয়নি। ও নন্দ। কিন্তু এতো রাত্রে কোথায় চললো ? নিঃশব্দে আমিও চললুম। কিন্তু আমার অত সাবধান হবার কোনো প্রয়োজন ছিলো না। কোনো দিকে সে চাইছে না। আল দিয়ে কয়েকটা জমি পেরিয়ে সে নিজের ক্ষেতে এসে দাঁড়ালো। কিছুদূরে আমিও দাঁড়ালুম। আলের পাশেপাশে ছোটো ঘাসে মেঠো-মাকড়সা রূপোর জাল বুনেছে ! শিশিরের দানা তাতে মুক্তার মতো টলটল করছে, আর আলোর রসে তারা উঠছে ভরে। মেঠো ইঁদুর ইতিমধ্যেই আলের পাশেপাশে মাটি কুরে সুড়ঙ্গ তৈরি করেছে। সোনার ফসল এই পথে তারা নিয়ে যাবে।

রাত্রির পাখী মাথার উপর দিয়ে পাখার ঝপঝপ শব্দ করে মিলিয়ে গেলো। কোথায় তারা ছিলো, কোথায় গেলো, কেউ জানে না। জানবে না।

দূরের ছায়ামূর্তি মাথা তুলে তাদের একবার দেখলো তারপর মাটির দিকে ঝুঁকে পড়ে অল্প-অল্প হাত নাড়াতে-নাড়াতে ক্ষেতময় ঘুরে বেড়াতে লাগলো। প্রথমে বুঝতে পারিনি। কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বুঝলুম। এই ভঙ্গী আমার বিশেষ পরিচিত। নন্দ এই ভাবে প্রতি বছর জমিতে ধান বোনে। আজ রাতে সে ধান বুনছে।

আলোর নিবিড় অরণ্যে আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই। গ্রাম্যচাষার শ্বেত মূর্তি এখন স্বপ্নের মতো অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আমি দেখতে লাগলুম।

চারদিকে অস্পষ্ট কুয়াশার মতো আলোর জাল। আমি আটকা পড়ে গেছি। সামনে শ্বেত ছায়ামূর্তি। পৃথিবী থেকে সে যেন স্বপ্নে চলে যাচ্ছে। মিলিয়ে যাচ্ছে। আবছা হয়ে যাচ্ছে।

নির্জন আলোর অরণ্যে, ক্ষেতের আলে দাঁড়িয়ে আমি দেখতে লাগলুম।

আর আমার কাছে সমস্তই পরিষ্কার হয়ে গেলো!

একটি গ্রাম্য চাষা আজ রাত্রে মৃত্যুকে জয় করেছে। মাটিতে মৃত্যু ছড়িয়ে হাজার-হাজার নতুন জীবনকে আহ্বান করছে। যারা আজ মাটিতে পড়লো তারাই একদিন আবার মাঠময় সবুজ আগুন জ্বালিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠবে। এই মরা মাঠে জীবন স্পন্দিত হবে। সমস্ত মাঠময় তারা সবুজ, উদ্ধত, উদ্দাম। ও আজ মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে, মৃত্যুকে মাটিতে ছড়িয়ে, মৃত্যুকে জয় করলো।

নিষ্কম্প আলোর অরণ্যে দাঁড়িয়ে আমি দেখতে লাগলুম।

ওর মুখের কোনো রেখা আমার চোখে পড়ছে না। শুধু শ্বেত একটি ছায়ামূর্তি মাটির দিকে ঝুঁকে পড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বীজ ছড়াচ্ছে, জীবনের বীজ।

আমি দেখতে লাগলুম।

সমস্ত কঠিনতাকে পেরিয়ে ও ক্রমশ স্বপ্নের মতো দূরে চলে যাচ্ছে আমি শুধু দেখতে লাগলুম।

নেশা

সুধাংশুর সঙ্গে আবার যে কখনো দেখা হতে পারে এ-সম্ভাবনা কখনই মনে আসেনি। জীবনে কত লোকের সঙ্গেই তো আলাপ হয় যাদের সঙ্গে আর কখনো দেখা হয় না। তাই রেঙ্গুনে সুধাংশুর সঙ্গে অকস্মাৎ দেখা হয়ে যাওয়ায় মনে-মনে রীতিমতো চমকে উঠলুম। আমার মনে সে বেঁচে ছিলো না, মৃত লোকের মতো এতোদিন সে হারিয়ে গিয়েছিলো।

প্রথমে সুধাংশুকে চিনতেই পারিনি: পরনে ময়লা হলদে লুঙ্গি, গায়ে ছেঁড়া স্লিপিং কোট, মাথায় রুমাল বাঁধা, পায়ে ছেঁড়া চটি। তার সর্বাঙ্গে দারিদ্র্যের কালো ছায়া নেমেছে।

হোটেলের ছোকরা চাকরের সঙ্গে যে আমার ঘরে এলো সে-ই সুধাংশু। আমি ইংরেজিতে কথা বলতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু হেসে লোকটা বললো, 'আমাকে চিনতে পারছো অনিল? আমি সুধাংশু!"

সত্যি কথা বলতে কি প্রথমে তাকে চিনতে পারিনি।

"সুধাংশু? কোন সুধাংশু বল তো?"

সে বললো, "মনে থাকার তো কথা নয়। স্কটিশে তোমার সঙ্গে ইণ্টারমিডিয়েট পড়তুম। একই হোস্টেলে থাকতুম। তারপর..." লোকটা হাসতে-হাসতে থেমে গেলো।

তখনো সুধাংশুকে চিনতে পারেনি। তাই তাকে বসতে বলে জিগগেস করলুম, "চা খাবে না কফি?...কলেজের কথা বলছো? সে তো প্রায় বত্রিশ বছর আগেকার কথা! এক যুগ হতে চললো।"

চেয়ারে বসে সুধাংশু বললো, "হ্যাঁ, এক যুগ হতে চললো বৈকি।"

দরজার কাছে হোটেলের ছোকরা চাকর তখনো দাঁড়িয়ে ছিলো। তাকে দু-জনের মতো কফি দিয়ে যেতে বললুম।

"খবরের কাগজে দেখলুম এখানকার প্রবাসী বাঙালীদের সাহিত্যসভার সভাপতি হবার জন্যে তুমি আসছো," সুধাংশু বললো। "আজকাল খুব লিখছো, না? তুমিই যে আবার লিখিয়ে হবে সত্যি এ-ধারণা আমার ছিলো না।এককালে তো সায়েন্স পড়তে! ভেবেছিলুম সায়েন্টিস্ট হবে। কিন্তু যা ভাবা যায় তাই কি আর হওয়া যায় নাকি?" লোকটা হ্যাঃ-হ্যাঃ করে হাসতে লাগলো। "আমিও তো সিনেমায় নেমেছিলুম, থিয়েটারও করেছি। কিন্তু তাই বলে এ্যাকটার হতে পারলুম কৈ?"

"এখানে কী করছো? কতদিন ধরে আছো?"

"কিছুই করছি না। কতদিন আছি?" ভুরু কুঁচকে হিসেব করতে-করতে সে বললো, "কতদিন আছি কখনো হিসেব করে দেখিনি।...... দাঁড়াও, বলছি। কুড়ি, না, না, আরো বেশি দিন হোলো। পঁচিশ থেকে আঠাশ বছরের মধ্যে। ঠিক বলতে পারছি না।—আমার কথা যাক, তুমি আর কতদিন থাকবে?"

"পরশুর স্টিমার ধরবো।"

"পরশু? এতো তাড়াতাড়ি? থেকে যাও না আরো কিছুদিন।"

"না ভাই," হেসে বললুম। "এবারে আর হোলো না। কলকাতায় কতকগুলো আর্জেন্ট কাজ আছে।"

"তাও তো বটে," সুধাংশুও হেসে বললো, "তুমি তো আর এখন সাধারণ লোক নও! বিখ্যাত সাহিত্যিক!" শেষের দিকে তার কথায় যেন ব্যাঙ্গের কাঁটা বেঁধানো ছিলো। সুধাংশুকে আগে না চিনলে হয়তো ভুলই বুঝতুম, কারণ কারণে-অকারণে খোঁচা দিয়ে কথা বলাই তার অভ্যেস।

কিন্তু জানো, বিখ্যাত হওয়ার অনেক অসুবিধে আছে? বিখ্যাত হলে ানুষের নিজের বলতে কিছু থাকে না!"

সুধাংশুকে এতোক্ষণে আরো স্পষ্ট মনে পড়লো। চিরকালই এইভাবে থা বলে। মনে-মনে একটা চাপা অস্বস্তি অনুভব করলুম। সুধাংশু ালো করেই জানে নানা কথার মধ্যে আসল কথা উত্থাপন করতে: টাকার থা। কলেজ থেকেই সবাইকার কাছে সে ধার করার অভ্যেস করেছিলো, হপাঠীথেকে আরম্ভ করে হোস্টেল ও কলেজের দরোয়ানদের কাছে পর্যন্ত। ামার কাছেও নানা সময়ে টাকা ধার করেছিলো, বরাবরই বলতো শাধ দেবে। কিন্তু তাকে টাকা দিয়ে যে ফিরে পাওয়া যাবে এ-রকম াবার মতো মূর্খ কেউ তখন ছিলো না। মনে-মনে ভাবতে লাগলুম াজ কত টাকা সে চাইবে: দশ, কুড়ি না পঞ্চাশ? হয়তো পঞ্চাশই বে, আমাকে সে বিখ্যাত লোক বলে জানে!

ছোকরা চাকর আমাদের জন্যে কফি নিয়ে এলো। কফি দেখে সুধাংশু সাহিত হয়ে বসলো। মাথার রুমালটা খুলে ছুঁড়ে দিলো পাশের চেয়ারে। ার সমস্ত মাথা জুড়ে বিরাট অপরিষ্কার টাক, সামনে চুল নেই, পাশে ও ড়ে এখনো কিছু চুল রয়েছে। অধিকাংশই পেকে গেছে, যেগুলি খনো পাকেনি তাদেরও রঙ বাদামী হয়ে এসেছে।

"এ কী?" আন্তরিক বিস্ময় চাপতে পারলুম না।

চেয়ারে পিঠ ঠেকিয়ে সুধাংশু হ্যাঃ-হ্যাঃ করে হাসতে লাগলো। ইবার লক্ষ্য করলুম তার অনেকগুলো দাঁতও নেই! "কী আবার! চমকে ঠলে কেনো? আমার টাক দেখে, না পাকাচুল দেখে? আরে ভাই, ামরা কি আর আজকের লোক? পঞ্চাশ তো পেরুতে চললো। এখনো তামার তো একটাও দাঁত পড়েনি, চুল কিছু পেকেছে, কিন্তু পঞ্চাশ বছরে তটা পাকা দরকার তার পক্ষে কিছুই না।—তবে তোমার কোনো াবনা নেই, মানে দুর্ভাবনা নেই। টাকার জন্যে কিছু করতে হয় না,

আপনিই আসে।. তোমার মতো ভাগ্যবান কটা লোক পৃথিবীতে আছে তাই তুমি পঞ্চাশ বছরের নিয়মের মধ্যে পড়োনি। আমার কথা ছে দাও, পঁচিশ থেকে আঠাশ বছর ধরে বর্মা মুল্লুকে পড়ে থাকা সোজা ক নয়, তার ওপর যে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে হয়েছে! মাথায় চুল নে দেখে তুমি আশ্চর্য হচ্ছ, আমি মাঝে-মাঝে আশ্চর্য হই ঘাড়ের ওপর এখন মাথাটা কী করে রয়েছে ভেবে!"

আমার হাত থেকে প্রায় ফুটন্ত কফির পেয়ালাটা নিয়ে ঢক-ঢক ক এক নিশ্বেসে শেষ করে সুধাংশু বললো, "আরো এক পেয়ালা ভরে দাও।

"এত গরম খাও কী করে?" বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলুম।

"গরমই তো ভালো। তবু কয়েক মিনিটের জন্যে গরম হওয়া যায়।- আরে, এখন তো আমরা ঠাণ্ডার দিকে চলেছি। তাই যত পারি গর জিনিস শুষে নিই।"

"কবে কলকাতায় গিয়েছিলে?"

"প্রায় বছর পনেরো আগে।"

"পনেরো বছর? বল কি? পনেরো বছরের মধ্যে তুমি আর কলকাতা যাওনি?

"না," নিতান্ত ঠাণ্ডা স্বরে সে উত্তর দিলো। "আর কখনো যাবোও না বেশ আছি এখানে। জানো, বিয়ে করছি? বার্মিজ। মেয়ে আ একটা।" একটু থেমে হঠাৎ বললো, "আজ সন্ধেয় আমার ওখা এসো না!"

"কাল হতে পারে," অন্য উপায় না দেখে বলতেই হোলো।

"বেশ, কাল এসো কিন্তু। তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো।" বলতে বলতে সুধাংশু দাঁড়িয়ে উঠলো, রুমালটা আবার মাথায় বাঁধলো, তারপ তার ঠিকানা জানিয়ে বিদায় নিলো।

ত্রিশ-বত্রিশ বছর ধরে মনের মধ্যে বিস্মৃতির যে পাহাড় দৃঢ় আর বিরা

চয়ে দাঁড়িয়েছিলো তা যেন ক্রমশ সরে যেতে লাগলো। ক্রমাগত ভীড় করে আসতে লাগলো সেই সমস্ত বিগত দিনের কথা। অতীত কখনো মরে না, মানুষের মন মরে যায়। জীবন্ত মনের ছোঁয়া পেলে অতীত আবার বেঁচে ওঠে

সুধাংশুকে লক্ষ্য করেনি এমন কেউ কলেজে ছিলো না। তার প্রধান দ্রষ্টব্য ছিলো দেহ। গ্রাম থেকে সবে কলকাতায় এসেছে। তার দেহে এতোটুকু জড়তা বা ক্লান্তির ছায়া কখনো নামেনি।

কিন্তু প্রথম কয়েক মাসের মধ্যেই একটা অতি দ্রুত পরিবর্তন সবাই লক্ষ্য করলুম: কলকাতার চালচলন সে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে ফেলেছে—চোখে রিমলেস চশমা, পরণে জরিপাড় ধুতি, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী আর জরিপাড় চাদর, পায়ে চকচকে দামী পাম্পশু। চুল তার বরাবরই সুন্দর। সেই চুল অনেক বড় করে রেখে ব্যাক-ব্রাশ করেছে। কলেজে মাঝে-মাঝে আসতো, কিন্তু কোনো পড়া শুনছে বলে কখনো মনে হয়নি। বড় জোর দিনে একটা ক্লাস করতো, বাকী সময় কলেজ ষ্ট্রিটের এক চায়ের দোকানে অনেক বন্ধু-বান্ধব নিয়ে চা গিলতো, চুরুট টানতো (তাকে কখনো সিগারেট খেতে দেখিনি) আর আড্ডা দিতো। সবচেয়ে অবাক লাগতো ভেবে এতো প্রচুর টাকা পায় সে কোথা থেকে? কলেজে পড়ার সময় আমরা যে হাতখরচ পেতুম কখনো তা দশ টাকার উপরে উঠেছে বলে মনে পড়ে না। কিন্তু সুধাংশু মাসে কম করে শ-খানেক ওড়াতো।

কিছুদিনের মধ্যেই শুনলুম সুধাংশুদের আর্থিক অবস্থার কথা। তাদের জমিদারির আয় নাকি বছরে কুড়ি হাজার আর সুধাংশুই তার বাবার অবর্তমানে একমাত্র উত্তরাধিকারী।

সবসময়েই সুধাংশুর চারদিকে দেখতুম এক দল ছেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে ছাত্র মহলে যে এতো মোসাহেব-ছাত্র আছে তা জানতুম না !

অল্পদিনের মধ্যেই শুনলুম সুধাংশু মদ ধরেছে। প্রথমটায় অত্যা বিচলিত হয়েছিলুম। আমাদের বয়েস তখন ষোল-সতেরোর বেশি নয়। আর সেই বয়েসে হঠাৎ মদ কথাটা উচ্চারণ করতেই কেমন যে ভয় হত। ওই দুটি অক্ষরের মধ্যে যেন জীবনের চরম সর্বনাশে স্বাক্ষর স্পষ্ট দেখতে পেতুম।

আগে সুধাংশু প্রত্যহ অন্তত একবার কলেজে আসতো। পে তাও না, সপ্তাহে বড় জোর একদিন। বাকী সময়টা হোস্টেলে নিজের ঘ পড়েপড়ে ঘুমুতো। রাত্রে বেরুতো। দরোয়ানকে টাকাকড়ি দিয়ে হা করেছিলো। তাই হোস্টেলে থেকেও তার নৈশ-জীবনের কোনে অসুবিধে হয়নি।

পুজোর ছুটির আগের দিন তাকে হঠাৎ একদিন দেখে চমকে উঠলুম একি ভূত দেখছি ? কোথায় তার সেই সজীবতা, সেই নবযৌবনের স্বাস্থ্য কোনো কারণে তাকে খুব অসুস্থ দেখাচ্ছিলো, তার দীর্ঘ দেহ সামান্য কুঁজে হয়ে গিয়েছে, চোখ দুটো লাল আর তলায় গভীর কালো দাগ : দিন রাত্রির উচ্ছৃঙ্খলতার কালি।

আমাকে দেখে সে বললো, "অনিল, পূজোর সময় আমরা থিয়েটা করছি। তোমাকে চাঁদা দিতে হবে।"

"দেশে যাবে না ?" বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলুম।

সুধাংশু বিনা কারণে উত্তেজিত হয়ে বললো, "দেশে যাবো কেনো কলকাতার পূজোর ফুর্তি ফেলে আমি দেশে যাবো ? বাবা এসেছিে আমাকে নিতে। তাকে জবাব দিয়ে দিয়েছি। থিয়েটার ফেলে কোথা যাবো না। তোমাকে চাঁদা দিতে হবে পাঁচ টাকা।"

আর কথা না বলে পাঁচটা টাকা তার হাতে দিয়ে ছাড়া পেয়ে বাঁচলুম

সে মাসে বই কিনতে না পেরে খুব যে কষ্ট হয়েছিলো এখনো সে-কথা মনে পড়ে।

তার কিছুদিন বাদে ক্রিসমসের পরেই একটা ব্যাপারে কিছুদিন খুব হৈ-চৈ হোলো। হোস্টেলে অত্যধিক মদ খেয়ে মাৎলামো করার জন্যে সুধাংশুকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিলো, হোস্টেল থেকেও, কলেজ থেকেও। তার দুঃসাহসে সত্যিই তখন মনে-মনে চমকে উঠেছিলুম। সুধাংশু চলে যাবার পর তার খাটের তলায় নাকি অসংখ্য মদের বোতল পাওয়া গিয়েছিলো।

এর পর থেকে মাঝেমাঝে সুধাংশুর দেখা পেতুম কলেজ স্ট্রিটের পাড়াতেই। শুনতুম তার বাবা তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছিলেন, কিন্তু সে যায়নি। ফলে তিনি সুধাংশুকে টাকা দেওয়া একেবারে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। নানা দামী জিনিসপত্র বিক্রি করে, বাঁধা দিয়ে কিছুদিন সে চালিয়েছিলো। তারপর ধার করতে আরম্ভ করলো। তাতেই কিছুদিন চললো। শেষে ধার পাওয়া বন্ধ হলে প্রায় ভিক্ষে করার মতো অবস্থা হোলো তার। তারপরের স্তর আরো খারাপ। একদিন শোনা গেলো সুধাংশু নানা বন্ধুর কাছে কিছুকিছু পড়ার বই ধার করতে আরম্ভ করেছে, সে নাকি আবার মন দিয়ে পড়াশুনা আরম্ভ করবে, পরীক্ষা দেবে। আরো কিছুদিন পরে শুনলুম সমস্তই বাজে কথা। বইগুলো বিক্রি করে কিছুদিন সে এন্তার মদ গিলেছে।

এরপর আরো কিছুদিন গেলো। সুধাংশুর কথা কিছুদিন মনে ছিলো না। একদিন কলেজ থেকে বাড়ি ফিরে দেখি আমাদের বৈঠকখানায় সুধাংশু বসে। দেখে অত্যন্ত অস্বস্তি পেয়েছিলুম।

আমার দিকে চেয়ে সে হাসলো। অত্যন্ত করুণ লাগলো তার হাসি। জুতো-জোড়া ছেঁড়া, ধূলোয় ভর্তি। পাঞ্জাবিটা তেলে আর ঘামে ময়লা আর দুর্গন্ধময়। গাল ভেঙে গেছে। চোখের তলা বসে কালি পড়েছে। এক

মাথা কোঁকড়া কালো চুল, যাত্রাদলের লোকের মতো বড়-বড়। এ-রকম অবস্থায় মানুষ কী করে হাসতে পারে বুঝতে পারলুম না।

"কী খবর?" অন্য কোনো কথা না পেয়ে প্রশ্ন করলুম।

"খবর ভালো।—ভীষণ খিদে পেয়েছে, কিছু খাওয়াতে পারো অনিল?"

"নিশ্চয়ই," আমাকে বলতেই হোলো। সেই সঙ্গে, সত্যি বলতে কি, দুঃখিতও হলুম: বেচারি কোথাও খাবার জোগাড় করতে না পেরে আমার কাছে এসেছে!

খাবার দেখে সুধাংশুর চোখমুখ উজ্জ্বল আর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো। কোনো কথা না বলে চক্ষের নিমেষে প্লেটটা শেষ করলো। আমি আবার খাবার আনালুম। সেগুলোও শেষ হোলো। তারপর বললো, "চা-চুরুট আনাও এবার।"

বললুম, "প্রথমটা আসছে। কিন্তু দ্বিতীয়টার তো এখানে সুবিধে হবে না। বাবা পাশের ঘরেই বসেন। বরঞ্চ চা খেয়ে বাইরে গিয়ে চুরুট টেনো। কিনে দোবো।"

"বাবা বাবা!" প্রায় রেগেই বললো সুধাংশু। "বাবাগুলো কেনো বেঁচে থাকে বলতে পারো?"

কথা ঘোরাবার জন্যেই প্রশ্ন করলুম, "আছো কোথায়?"

"মণিকার ওখানে,"

"মণিকা কে? কোথায় থাকে?"

"তুমি আস্ত একটা গর্দভ। মণিকাকে চেনো না? গ্র্যাণ্ড থিয়েটারে প্লে করে?"

একটা ঢোক গিলে শুধু বললুম, "ও!"

"ওয়াণ্ডারফুল দেখতে মণিকাকে। দেখোনি? আজই দেখে এসো রাত্রে। দেখবে, মাথা ঘুরবে! সে যখন হাসবে, কিংবা কথা কইবে,

কিংবা চলবে—তখন অনিল, সিমপ্লি মরে যেতে ইচ্ছে করবে! কী করে সে হাঁটতে শিখলো ও-রকম ভঙ্গীতে, আমার কাছে সেটা তো একটা রহস্যের মতো।"

"সেখানে গেলে কী করে?"

"সে অনেক কথা! আর একদিন বলবো। ঠিক আছে পরের বইতে মণিকা আর আমি একসঙ্গে নামবো। একদিন যাবে অনিল মণিকার ওখানে? চল না, দেখে আসবে! তাকে দেখলেই মনে হবে বেঁচে থেকে লাভ আছে!"

"থামো," তাকে ধমক দিয়ে বললুম। "এমনিতেই জীবন আমার কাছে যথেষ্ট সুন্দর। তার জন্যে মণিকার দরকার নেই।"

হ্যাঃ-হ্যাঃ করে সুধাংশু এক চোখ বুজে হাসতে লাগলো।

বললুম,' "এ-রকম কোরো না সুধাংশু, বরঞ্চ দেশে ফিরে যাও। নইলে তুমি কি বুঝতে পারছো না কোথায় নেমে চলেছ?"

উঠে দাঁড়িয়ে সুধাংশু বললো, "রাখো তোমার গীতার উপদেশ। ঢের শুনেছি। ওসব ভালো লাগেনা। আশ্চর্য এই কলকাতা। এতো মজা কোথায়, এতো ফুর্তি কোথায়? গলা পর্যন্ত মদ গিলে মরতে হয়তো এই কলকাতাতেই মরবো। অন্য কেথাও নয়।"

"আমাকে চার আনা দাও দিকিনি," যাবার আগে সুধাংশু বললো। মানিব্যাগ খুলে দেখলুম একটা পাঁচ টাকার নোট ছাড়া আর কিছু নেই। একটু দাঁড়াতে বলে ভিতর থেকে পয়সা আনতে গেলুম। মিনিট দশেকও দেরি হয়নি। ফিরে দেখি সুধাংশু চলে গেছে, আর তার সঙ্গেই অদৃশ্য হয়েছে আমার পাঞ্জাবীর সোনার বোতাম আর নোটশুদ্ধ মানিব্যাগটা!

সুধাংশুর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছিলো শিয়ালদা ইষ্টিশানের কাছে, আরো মাস ছয়েক পরে। তখন সন্ধে হয়ে গিয়েছিলো। হঠাৎ কে

আমার পিঠে হাত দিয়ে দাঁড়ালো। চমকে ফিরে দেখলুম সুধাংশু। তার মাথার চুলগুলো এলোমেলো, জামাকাপড় ধোপ-ভাঙা।

"কী খবর অনিল?" একটু জড়িয়ে-জড়িয়ে সুধাংশু প্রশ্ন করলো, আর বিশ্রী দুর্গন্ধে ভরে গেলো সেখানকার হাওয়া।

কাঁধ থেকে তার হাতটা নামিয়ে বললুম, "কোথা থেকে আসছো?"

জড়িয়ে-জড়িয়ে হেসে সুধাংশু বললো, "খুব বেশি খাইনি, মাইরি খাইনি। দু'পেগ হুইস্কি আর···।"

আমার বাস এসে গিয়েছিলো। বললুম, "আসি। আবার পরে দেখা হবে।"

জামাটা চেপে ধরে সে বললো, "যেয়ো না অনিল। এখনো বেশি রাত হয়নি, আমার সঙ্গে একটু হাঁটবে চল। অনেক দরকারী কথা আছে।"

আমি দু-বার তার হাতের মুঠো খুলে জামাটা ছাড়াবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু পারলুম না। বাসটা চলে গেলো।

বললুম, "তোমার দরকারী কথাগুলো চটপট বল, আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে তো?"

"সে অনেক কথা অনিল", সুধাংশু হঠাৎ থেমে আবার আরম্ভ করলো, "আমার নিজের কথা, ভীষণ দুঃখের কথা অনিল," বলতে-বলতে বোধ হয় নেশার ঝোঁকেই কেঁদে ফেললো। "জানো, মণিকা আমাকে ঠকায়! গ্র্যাণ্ডের ম্যানেজারকে সে আসলে ভালোবাসে। আমাকে সে থাকতে দেয় সত্যি, কিন্তু তার আসল ভালোবাসা সেই কালো মোষটার ওপর।—আমার যে কী ভীষণ দুঃখ অনিল, যদি তুমি জানতে···"বলতে-বলতে সুধাংশু ফুটপথের উপর উবু হয়ে বসে ওয়াক-ওয়াক করে বমি করতে লাগলো। সেই মুহূর্তের সুযোগে আমি চট করে একটা চলন্ত ট্যাক্সি থামিয়ে উঠে পড়লুম।

তার দু-দিন পরে সকালেই খবরের কাগজের পাতা ওল্টাবার সময় ছোট্ট একটি খবরের দিকে চেয়ে আমি স্তব্ধ হয়ে গেলুম। খবর বেরিয়েছিলো মণিকা নামে এক অভিনেত্রীর মোট তিন হাজার টাকা দামের সমস্ত গয়না চুরি গেছে। অভিনেত্রীর বাড়িতে সুধাংশু নামে একটি লোক থাকতো। সে ফেরার হয়েছে। তাকে খুঁজে বার করার জন্যে পুলিশ জোর তদন্ত করছে।

এরপর সুধাংশুর আর কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

তারপর এই রেঙ্গুনে!

পরের দিন অনেক খুঁজে সুধাংশুর বাড়িতে যখন পৌছলুম তখন অনেক রাত হয়ে গেছে। পাড়াটা নিস্তব্ধ আর ভদ্রলোকেরা এখানে যে থাকে না দেখলেই সে-কথা বোঝা যায়। এখানকার অধিবাসীরা অধিকাংশই বার্মিজ: কেউ বা মিলে কাজ করে, কেউ বা ডকে। বাঙালী কেউ এদিকে থাকে বলে মনে হয় না। সুধাংশু বোধ হয় বাঙালীদের এড়িয়ে থাকতে চায়।

সুধাংশুর ফ্ল্যাটের নম্বর মিলিয়ে কালো রঙ-চটা দরজায় জোরে-জোরে টোকা দিলুম। দরজা খুলে গেলো, দেখলুম একটি বার্মিজ মেয়ে হাতে লণ্ঠন নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার জামা-কাপড় দেখে অত্যন্ত গরীব বলে মনে হোলো। আমাকে দেখে মেয়েটি বার্মিজ ভাষায় কী যেন বললো, তারপরেই সুধাংশুর গলা শুনলুম, "ভেতরে এসো অনিল। আমি ভাবছিলুম বুঝি আর এলেই না।"

ঘরটা বেশ বড়। এক পাশে নীচু একটা তক্তা। তার উপর ময়লা খবরের কাগজ বিছানো। সুধাংশু সেখানে শুয়েছিলো। আমাকে দেখে

উঠে বসলো। ঘরের অন্য কোণে চ্যাটাই পাতা, তার উপর নোংরা কাপড়ের ছোটো একটা পুঁটুলি। সুধাংশু তার পাশের জায়গাটা দেখিয়ে বললো, "পা তুলে এখানেই বোসো। চেয়ার-টেয়ার-নেই।" তারপর বার্মিজ মেয়েটির দিকে আঙুল তুলে বললো, "এই আমার স্ত্রী," আর কাপড়ের পুঁটলির দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললো, "ওই আমার মেয়ে।" বার্মিজ মেয়েটির মুখের কোনো ভাবপরিবর্তন হোলো না। হাতে লণ্ঠন নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। সুধাংশু বার্মিজ ভাষায় তাকে কী বললো। মেয়েটি কোনো উত্তর না দিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলো আর এক মিনিটের মধ্যেই বেতের ট্রেতে করে দু-পেয়ালা কফি আমাদের জন্যে নিয়ে এলো। পেয়ালাগুলো আশ্চর্যের বিষয় ঝকঝকে নতুন।

"একটু কফি খাও অনিল। আমার ঘরে পেয়ালা-টেয়ালা বড় একটা নেই। কিনলেই ভাঙে, ভীষণ খরচ। আমরা তাই কাঁসার বাটিতেই চা-কফি খাই। তোমার জন্যে আজ এগুলো কেনা হয়েছে।"

"কেনো মিছিমিছি আমার জন্যে আবার খরচ করতে গেলে", একটু লজ্জিত হয়ে বললুম।

"কতদিন কোনো বন্ধুর জন্যে কিছু খরচ করিনি", সুধাংশু বললো, "তাই তোমার জন্যে আজ কিছু খরচ করতে ভালো লাগলো।—আমাকে তো কিছুই করতে হয় না, সমস্তই আমার স্ত্রী করে: বাজার করা থেকে ঘর-সংসার দেখা পর্যন্ত। ভারি ভালো মেয়ে। কিন্তু বছর দুই আগে হঠাৎ আমাকে ছেড়ে অন্য এক বার্মিজকে বিয়ে করবে ঠিক করেছিলো। আমি তখনই নিজের বোকামি বুঝতে পারি, আর পরের বছরেই ওই বাচ্ছা জন্মায়। কয়েক মাস পরে আরো একটা বাচ্ছা হবে।" সুধাংশু হি-হি করে বিশ্রী হাসতে লাগলো।

মেয়েটি আমাদের দিকে খানিক্ষণ চেয়ে রইলো, তার মুখচোখ মড়ার মতো ফ্যাকাসে। এতোক্ষণে ভালো করে দেখলুম: মাথার

অনেক জায়গার চুল উঠে গেছে, হাত-পা সরু-সরু, সরু লম্বা গলা, শুধু কোমর আর পেটটা অস্বাভাবিক মোটা। তাকে দেখলে মনে হয় জীবনে কোনো দিন হাসেনি, কিংবা তার জীবনে হাসবার মতো কখনো কিছু ঘটেনি।

"কৈ, কফি খাচ্ছো না?" সুধাংশু বললো, "ওর জন্যে একটুও অস্বস্তি পাবার দরকার নেই। বাংলা ও জানে না।"

মেয়েটিকে সুধাংশু কী যেন বললো। তার কথা শুনে নিঃশব্দে ঘরের কোণে তার মেয়ের পাশে চ্যাটাইয়ের উপর গিয়ে বসলো। কথার ফাঁকে-ফাঁকে আড়চোখে চারদিকে চাইবার কৌতূহল সামলাতে পারলুম না। দেখলুম বসে-বসে মেয়েটি ঢুলছে। তার মাথাটা বারবার বুকের উপর ঝুঁকে পড়ছে।

"তোমার কী খবর বল," বিনা প্রয়োজনে, নিতান্ত কথা বলার জন্যেই আমি বললুম।

"খবর? কী খবর জানতে চাও?"

"কলকাতা থেকে কি তুমি সোজা এখানে চলে এসেছিলে?"

কী খানিক ভেবে সুধাংশু আবার হি-হি করে হাসতে লাগলো। বললো, "না, সোজা এখানে নয়। কিছুদিন ওয়ালটেয়ারে গা ঢাকা দিয়ে ছিলুম। তারপর ভাইজাগ থেকে জাহাজে চেপে এখানে চলে এলুম। জাহাজে চড়ার আগে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলুম খুব বড়লোক না হলে কখনো কলকাতায় ফিরবো না। জানো অনিল আমি আমার প্রতিজ্ঞা পালন করেছি।"

"ইতিমধ্যে কখনো কলকাতায় যাওনি?" বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলুম।

"যাবো না কেন? গিয়েছিলুম, আর রীতিমতো বড়লোক হয়েই গিয়েছিলুম।"

"তবে..." কথাটা শেষ না করে আমি একবার চারদিকে চাইলুম।

"তবে এখানে আছি কেন? —এমনি। ভালো জায়গায় থাকতে আমার ভীষণ অস্বস্তি হয়। জানো আমার প্রায় লাখ খানেক টাকা নানা কারবারে খাটছে? শিগগীরই দু-লাখ জমবে। বছরে আমার নেট ইনকাম বাইশ হাজার।"

আমি সুধাংশুর দিকে চাইলুম। দেখলুম একটা অদ্ভুত উত্তেজনায় তার চোখের তারা যেন কাঁপছে!

"কিন্তু ব্যবসা সুরু করলে কী করে?" আমি প্রশ্ন করলুম, "সেই তিন হাজার টাকার গয়না দিয়ে?"

সুধাংশু একটুও লজ্জিত না হয়ে হাসতে-হাসতে বললো, "তিন হাজার টাকা না হাতি! পুলিশকে সে বাজে কথা বলেছিলো। সেগুলো বিক্রী করে ন'শো টাকার এক পয়সাও বেশি পাইনি। তার ওপর এখানে আসার আর গা ঢাকা দিয়ে থাকার খরচও তো আছে! সেই টাকার সবটাই কিছুদিনের মধ্যে খরচ হয়ে গেলো।" একটু থেমে হঠাৎ সে প্রশ্ন করলো, "তোমরা খুব shocked হয়েছিলে, না?"

"হ্যাঁ, খানিকটা যে হয়েছিলুম তাতে কোনো সন্দেহ নেই।"

"কিন্তু আমার মনে কখনো একটুও দুঃখু হয়নি। আমাকে মিথ্যে অজুহাতে সন্ধের দিকে সে বার করে দিতো, যেতে না চাইলে মদ খাবার টাকা দিতো আর আমি বেরিয়ে গেলে গ্র্যাণ্ডের সেই মোটা ম্যানেজার আসতো আর তারা দুজনে হাওয়া খেতে বেরুতো। সে-রাতে বাড়ি ফিরে দেখি তারা হাওয়া খেতে বেরিয়েছে। রাগে আমার আপাদমস্তক জ্বলতে লাগলো। আমিও আর সময় নষ্ট না করে তালা ভেঙে তার যত গয়না পেলুম রুমালে বেঁধে একেবারে হাওয়া..."

রাত বেড়ে উঠতে লাগলো। হঠাৎ সুধাংশু বললো, "একটু এ দেশি তামাক টানবে নাকি?"

"বর্মা সিগার ?"

"না হে, যাকে চণ্ডু বলে।"

"চণ্ডু ?" আমি একটু চমকে উঠেই জিগগেস করলুম, "কেন, তুমি ধরেছো নাকি ?"

"না ; আমি কোথায় ধরলুম, ওই আমাকে ধরেছে !" তারপর একটু থেমে আবার বললো, "তুমি বরঞ্চ সিগারেট ধরাও। কিন্তু আমি কয়েক পাইপ চণ্ডু টেনে তোমার সঙ্গে গল্প করলে কি আপত্তি করবে ?"

"না-না, আপত্তির কী আছে ?"

বার্মিজ ভাষায় কী বলতেই সুধাংশুর স্ত্রী চ্যাটাই থেকে উঠলো, তারপর কোনো কথা না বলে পাশের ঘর থেকে ছোটো পিতলের ট্রে-র উপর স্পিরিট ল্যাম্প, লম্বা ছুঁচ, একটা পাইপ আর আফিংএর ছোটো একটি কৌটো সাজিয়ে নিয়ে এলো। সুধাংশু খাটের তলা থেকে দুটো ইঁট তুলে একটা খবরের কাগজ চাপা দিলো, তারপর আমার দিকে চেয়ে হেসে বললো, "টানবার পর একটা শক্ত কিছুতে মাথা না রাখলে ভালো লাগে না।" তার স্ত্রী কৌটো থেকে আফিঙের ছোটো একটি গোলা ছুঁচে বিঁধিয়ে স্পিরিট ল্যাম্পের উপর ধরালো। সেটা যখন শব্দ করে পুড়তে লাগলো তখন পাইপে ভরে সুধাংশুর হাতে দিলো তুলে। সুধাংশু এক বুঁক ধোঁয়া টেনে নিলো, খানিকক্ষণ বুকের মধ্যে আটকে রাখলো, তারপর ধীরে-ধীরে ছেড়ে দিলো ! এমনি করে পাঁচবার পাইপ খেয়ে ইঁটে মাথা দিয়ে শুলো। বললো, "চমৎকার সাজতে পারে আমার স্ত্রী। তোমাদের সব ভুল ধারণা, চণ্ডু নাকি খারাপ। আরে অত্যধিক হলে সবকিছুই খারাপ।—আর একবার কফি খাবে নাকি ?"

"না ভাই, রাত অনেক হোলো। আজ বরঞ্চ যাই।"

"না না, তাইকি আর হয় !" কিছুতেই যেতে দিলো না, অনর্গল কথা বলতে লাগলো। কিন্তু এখন তার কথার গতি কমে এসেছে। তার

স্ত্রী ট্রে-টা ভিতরের ঘরে রেখে এলো তারপর চ্যাটাই-এ মেয়ের পাশে প্রায় গোল হয়ে হাঁটু পাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

"—এখানে এসে কয়েক মাস সেই পাঁচশো টাকা দিয়ে খুব ফুর্তি করলুম," সুধাংশু তার গল্প আরম্ভ করলো, "কিন্তু পাঁচশো টাকায় কতদিনই বা ফুর্তি করা যায়? দেখতে-দেখতে ফুরিয়ে গেলো। টাকা ফুরুলো কিন্তু আতঙ্ক শেষ হল না। দিনের বেলায় বড় একটা বেরুতুম না, পুলিশ দেখলে ভয় হত। কেবলি মনে হত এই ঝুঝি ধরা পড়লুম। শেষে একদিন রাতে রেঙ্গুন ছেড়ে পালালুম। কিছুদিন ম্যাণ্ডালে, কিছুদিন মেমিও ঘুরলুম। কোথাও বিশেষ সুবিধে হোলো না। কিন্তু টাকা আমাকে রোজগার করতেই হবে, যেমন করেই হোক অনেক-অনেক টাকা। টাকার আশায় আমি পাগলের মতো নানা জায়গায় ঘুরতে লাগলুম। শেষে একদিন এক কাঠের কারবারে ঢুকলুম। মাইনে খুব বেশি নয়, মাসে এক শো টাকা। নিজের সমস্ত খরচ একেবারে কমিয়ে ফেললুম, না ভালো জামাকাপড়, না ভালো খাওয়াপরা। জানো, মাসে মাত্র দশ টাকা নিজের জন্যে খরচ করতুম বাকী টাকা ব্যাঙ্কে রাখতুম! আমার মাথায় তখন টাকার কথাই কেবল ঘুরে বেড়াচ্ছে। শুধু টাকা। টাকার অভাবে কলকাতায় আমাকে ভীষণ অসুবিধে ভোগ করতে হয়েছিলো। ঠিক করেছিলুম এবারে এতো টাকা রোজগার করবো যে কলকাতায় ফিরে বাকী জীবন যেন টাকার জন্যে না ভাবতে হয়।...... যাই বল অনিল, কলকাতার মতো জায়গা হয় না। এখনো মাঝেমাঝে কলকাতার স্বপ্ন দেখি, সেই চায়ের দোকানে সেই সিনেমা-থিয়েটার; সেই রেস্তরাঁগুলো, এমন কি সেই মণিকাকেও, অদ্ভুত ভঙ্গিতে যে হাঁটতে পারতো।—সত্যি এতো মেয়ে দেখলুম, কিন্তু তার পাশে দাঁড়াতে পারে এমন একটিকেও দেখলুম না। অদ্ভুত মেয়ে মণিকা, বিশ্বাস কর অনিল, সে অদ্ভুত মেয়ে ছিলো! তার

কাছে থাকলে মনে হোতো না কোনোদিন আমার চুল পাকবে, দাঁত পড়বে, কোনোদিন বুড়ো হব, কোনোদিন মরে যাবো। —আজ হয়তো মণিকা আর বেঁচে নেই, আর বেঁচে থাকলেও হয়তো বুড়ি হয়ে গেছে, মোটা হয়েছে, চুল পেকেছে। সবি বুঝতে পারি। কিন্তু মণিকার কথা কখনো ভুলতে পারি না।—এখানে দিনের পর দিন গুনেছি, একটি একটি করে টাকা জমিয়েছি, নিজেকে সব দিক দিয়ে উপোষ করে রেখেছি—না মদ, না মেয়েমানুষ। কেন জানো? শুধু মণিকার জন্যে। ভেবেছিলুম অনেক টাকা জমিয়ে কলকাতায় ফিরবো, তারপর সেই ব্যাটা গ্র্যাণ্ডের ম্যানেজারের চোখের সামনে মণিকাকে নিয়ে খুব বড় আর খুব ভালো বাড়িতে থাকবো।" বলতে-বলতে রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে উঠলো সুধাংশু। আমি আড়চোখে একবার ঘড়ির দিকে দেখলুম। প্রায় তখন রাত্রি একটা।

বললুম, "তারপর?"

"হ্যাঁ কি বলছিলুম?—কিন্তু আমি যত চাইছিলুম তত কি আর কাঠের কারবারে পাওয়া যায়? আমি কাজ ছেড়ে দিলুম"। তারপর এক চোখ বুজে সামান্য হেসে সে শুধু বললো, "শুধু ছাড়লুম না, হাজার দশেক টাকা বাগিয়ে ছাড়লুম। কী করে অত টাকা বাগালুম সে অন্য একটা গল্প। তার সবটা কেউই জানে না। তোমাকেও বলবো না। তবে খুব শক্ত হয়নি আমার পক্ষে। কাঠবিক্রীর চার্জে থাকতুম। আর সব বারেই কাঠ বিক্রি করে ঠিকমতো হিসেব দেখাতুম বলে তুমি মনে করো? সুধাংশু অতটা কাঁচা ছেলে নয়।"

"তারপর কী করলে?"

"তারপর?—কতকগুলো বার্মিজ আর চীনে লোকের সঙ্গে আফিং আর কোকেনের ব্যবসা ধরলুম। আমার এই সমস্ত সম্পত্তি সেই ব্যবসা থেকে। সে সময়টা খুব থ্রিলের মধ্যে কেটেছে। দলের অনেকে ধরা

পড়লো। সে লোকগুলো যাকে বলে উজবুক। কারুর ঘটে এতোটুকু বুদ্ধি নেই। একটা না একটা ভুল তারা করবেই। কিন্তু আমার একটা চুল কেউ ছুঁতে পারেনি।”

আমি মনেমনে, সত্যি বলতে কি, শিউরে উঠলুম।

সুধাংশু বলে চললো, “এমনি করে বছরের পর বছর কাটলো। আমি যে ব্যবসা ধরেছিলুম তার জন্যে পরিশ্রম খুব কম করতে হোতো না। ভূতের মতো খাটতে হোতো, দিন নেই, রাত নেই, সব সময়ে। তা ছাড়া একটা দুর্ভাবনা তো সব সময়েই রয়েছে: যদি ধরা পড়ি? যদি দলের লোক শত্রুতা করে? প্রতি পা ফেলতে হোতো হিসেব করে। বেকায়দায় পা পড়েছে কি মরেছো। ঐ ব্যবসায় হয় টাকা নয় ছুরি, বুঝছো অনিল— মাঝামাঝি কিছু নেই। এক দলের সঙ্গে আমি কখনো কাজ করিনি। এক এক দলে বড় জোর মাস দুই কাটতো। তারপর আবার নতুন দল, নতুন মানুষ।

“ভাবো অনিল, পনেরো বছর আমি এখানে একলা কাটিয়েছি, পনেরো বছর। একদিনো মদ খাইনি, ভালো খাইনি, কোনো মেয়েমানুষকে ছুঁইনি, ভালো জামাকাপড় পরিনি, শুধু ভূতের মতো খেটেছি, আর যখনই টাকা হাতে এসেছে তখুনি ব্যাঙ্কে জমা দিয়েছি। পনেরো বছর, অনিল, সোজা নয়: পনেরো বছর! পনেরো বছর আমি কাউকে বিশ্বাস করিনি, সব সময়ে ভয়ে থাকতুম: এই বুঝি কোনো ছুরি এসে বুকে বিঁধলো, এই বুঝি পুলিসে হাতকড়া পরালো। তবু একদিনো ছুটি নিইনি।—কোথায় যাবো ছুটি নিয়ে? আমার যাবার জায়গা, একমাত্র যাবার জায়গা কলকাতা···সেই ঝলমলে সুন্দর কলকাতা, ফুরফুরে হাওয়ায় হালকা সন্ধে, সেই মণিকা, রেস্তরাঁ, বার, সিনেমা, থিয়েটার, ট্যাক্সিতে ঘোরা, হালকা ফুর্তিতে নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়া। এক এক রাত্রে সত্যি অনিল আমার কান্না পেতো। ভাবতুম কলকাতায় ফিরে

মণিকাকে নিয়ে একদিন এতো মদ খাবো, পৃথিবীতে কেউ যা কোনোদিন খায়নি। আমার সমস্ত আনন্দ, সমস্ত বিশ্রাম আমি তুলে রেখেছিলুম কলকাতায় ফেরার জন্যে। একদিনো আমি আরাম করে থাকিনি অনিল, একদিনের জন্যেও নয়।"

এতোটা বলে সুধাংশু বিছানায় আবার উঠে বসলো। চোখগুলো তার জ্বলে উঠলো সাপের মতো। আমাকে বললো, "আরো কয়েক ছিলিম টেনেনি।"

তার স্ত্রী পাঁচবার পাইপ সেজে দিলো, সুধাংশু খুব তৃপ্তি করে টানলো। মেয়েটি ট্রে নিয়ে ফিরে গেলে সুধাংশু বললো, "এইজন্যেই তো ওকে এতো ভালোবাসি। অনেক জায়গাতেই চণ্ডু খেয়েছি, কিন্তু এ-রকম সুন্দর হাত কোথাও দেখিনি। তুমি খেলে না অনিল, একটা ওয়াণ্ডারফুল জিনিস মিস্ করলে।"

আমি তার কথার উত্তর না দিয়ে বললুম, "কিন্তু তারপর কী হোলো বল।"এতোক্ষণে বুঝতে পারলুম তার গল্পের শেষটা না শুনে যাওয়া সম্ভব নয়।

"তারপর?" ইঁটে মাথা দিয়ে শুয়ে সুধাংশু বললো, "তারপর পনেরো বছর পরে একদিন কলকাতার জাহাজে উঠে বসলুম।" অনেকগুলো পাইপ টেনে মেজাজ তার দরাজ হয়ে উঠেছিলো, তাই এইবার সম্ভবত সত্যি কথা বললো, "আসলে এক লাখ জমাতে পারিনি অনিল, মিথ্যে বলবো কেন, তবে হাজার কয়েক টাকা জমিয়েছিলুম। আর হাজার কয়েক টাকাটাই কি কম হোলো? —তোমরা তো সব ভালো ছেলে, বিখ্যাত লোক, তোমরা কখনো পাঁচ-সাত হাজার টাকা জমাতে পারবে বলে মনে কর?" আমার দিকে চেয়ে সুধাংশু হ্যাঃ-হ্যাঃ করে খানিক হাসলো।

"কক্ষনো নয়," প্রবল ভাবে মাথা নেড়ে একমত হলুম।

খুসি হয়ে সুধাংশু এবার বেপরোয়া চালে বলতে লাগলো, "কলকাতায়

একেবারে বিলিতি হোটেলে উঠলুম। সেই দিনই সাহেব-দরজির দোকানে অনেকগুলো স্যুটের অর্ডার দিলুম, অনেকগুলো সিল্কের পাঞ্জাবী আর জরিপাড় ধুতি কিনলুম, মণিকার জন্যে দেড় হাজার দিয়ে কিনে আনলুম হীরের একটা নেকলেস, আর সন্ধেয় ট্যাক্সি হাঁকিয়ে সোজা চীৎপুরে এলুম মণিকার বাড়িতে। যদি জানতে অনিল সেদিন কী রকম বুক কাঁপছিলো! মণিকার গয়না নেবার সময় আমার একটুও বুক কাঁপেনি। কিন্তু মণিকার জন্যে গয়না কিনে দেখা করতে যাবার সময় বুক আমার কাঁপতে লাগলো আর ভালো লাগলো!—কিন্তু কোথায় মণিকা?" বলতে-বলতে যন্ত্রের মানুষের মতো সুধাংশু বিছানায় আবার উঠে বসলো, তার ঠোঁটগুলো ঝুলে পড়েছে, চোখগুলো ছোটো হয়ে এসেছে, সমস্ত মুখ ভয়ানক ফ্যাকাশে। দেখলে রীতিমতো ভয় হয়। "কোথায় মণিকা? মণিকার বাড়িতে অন্য মেয়েরা রয়েছে। আমাকে তারা ডাকলো, কিন্তু মণিকার খবর দিতে পারলো না। কে মণিকা—মণিকা বলে সেখানে নাকি কেউ ছিলো না কখনো।—চীৎপুর থেকে গ্র্যাণ্ড থিয়েটারে এলুম। নতুন ম্যানেজার দেখা করলো। তার কাছে শুনলুম সেই পুরোনো মোটা ম্যানেজার বছর দশেক আগে মারা গেছে। আর মণিকা? অনেক ভেবে তারা বললো, হ্যাঁ, এক সময় মণিকা নামে একটি মেয়ে সেখানে নাকি প্লে করতো, কিন্তু সে আজ অনেক বছর আগেকার কথা। এখন তার খবর কেউ জানে না। শুধু পুরোনো দরোয়ান খবর দিতে পারলো, সে মণিকাকে চিনতো, বললো মাঝে একবার তার স্খল-পক্ক হয়, কিন্তু তার পরের খবর জানে না, বললো, 'ক্যা জানি বাবু, কাঁহি মর গিয়া হোগা'।

"কলকাতার নানা পথে ট্যাক্সি নিয়ে বহুক্ষণ ঘুরলুম। কিন্তু কোথায় সেই আমাদের পুরোনো কলকাতা? কোথায় সেই ফুর্তি, কোথায় সেই হাসি-গান-গল্প, কোথায় সেই সব মেয়েরা? মনে হোলো যেন শ্মশানের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি। হোটেলে ফিরে এলুম, বয়'কে দিয়ে অনেক বোতল

মদ আনালুম, নানা ধরণের মদ। তারপর পনেরো বছর পরে কলকাতায় ফিরে আবার মাতাল হলুম। আগে মদ খেলে কী ভীষণ ফুর্তি লাগতো। সেদিন কিন্তু মদ খেয়ে কেবলি কান্না পেতে লাগলো। মনে হোলো ভীষণ আমি ঠকেছি! কিসের জন্যে নিজেকে সব দিক দিয়ে বঞ্চিত করেছি? কিসের জন্যে পনেরো বছর ভালো খাইনি, ভালো পরিনি, সব সময় আতঙ্কে আর ভয়ে কাটিয়েছি? কিসের জন্যে টাকা রোজগার করেছি? কী হবে অত টাকায়?

"পরের দিন সকালে ভীষণ শরীর খারাপ হোলো। মাথা যেন ছিঁড়ে যেতে লাগলো। বিছানায় পড়ে রইলুম। বিকেলে আবার ট্যাক্সি নিয়ে বেরুলুম। আবার খোঁজাখুঁজি করলুম। রাত্রে আবার মাতাল হলুম। পরের দিন আবার শরীর খারাপ হোলো। দিন চারেক এমনি করে কাটলো, —কী সুখে লোকে এখন কলকাতায় থাকে বলতে পারো? কিসের ফুর্তিতে? —আমি কী দেখলুম জানো অনিল? যে কলকাতার জন্যে আমি লেখাপড়া ছাড়লুম, বাপ-মাকে ছাড়লুম, জমিদারি ছাড়লুম, সেই কলকাতাই আমাকে বেমালুম ভুলে গেছে! আমার ভীষণ রাগ হোলো, ভীষণ কান্না পেলো। ঠিক করলুম আর না। যেখানে এতোদিন কাটিয়েছি সেই বর্মা মুল্লুকেই ফিরে যাবো। সেখানেই থাকবো। কলকাতায় আর নয়।

"পরের বোটেই রেঙ্গুনে ফিরে এলুম। পড়ে রইলো তোমাদের কলকাতা। রেঙ্গুনে একটা মেয়ে কুলির পিঠে জিনিস চাপিয়ে সোজা এই-খানে উঠলুম। সেই মেয়ে কুলিটাকে আর যেতে দিইনি, তাকেই বিয়ে করেছি। চমৎকার মেয়ে অনিল, মণিকার চেয়ে অনেক ভালো।"

আমি সুধাংশুর চোখের দিকে চাইলুম। কী ভেবে সে চোখ ফিরিয়ে নিলো, তারপর বার্মিজ ভাষায় স্ত্রীকে ডেকে চণ্ডু নিয়ে আসতে বললো।

"তারপর থেকেই এখানে আছি। চিরকাল থাকবো। কলকাতায় আর নয়।"

তারপর হিহি করে তার অবশিষ্ট দাঁতগুলো বার করে সে অনেকক্ষণ হাসলো। তার স্ত্রী চণ্ডুর পাইপটা তৈরি করে অপেক্ষা করতে লাগলো।

"কিন্তু তুমি কি সুখী হয়েছো?"

"আমি সুখী অনিল। এমন স্ত্রীকে নিয়ে সুখী হব না, যে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ভালো চণ্ডু তৈরি করতে পারে? জীবনে এর চেয়ে সুখী কখনো হইনি, কখনো হব না। অভিযোগ করার কিছুই নেই: চমৎকার বাড়ি, আমার স্ত্রী, আমার মেয়ে—আর কী চাই?"

সুধাংশু চোখ বুজে পরের পর দশটা পাইপ শেষ করলো। এগারোর পাইপটা সেজে তার স্ত্রী সুধাংশুকে কি যেন জিগগেস করলো। সুধাংশু কোনো উত্তর দিলো না, চোখ চাইলো না, ইঁটে মাথা দিয়ে পাশ ফিরে শুলো, আর মূহূর্তের মধ্যেই তার নাক ডাকতে লাগলো। এতোক্ষণে মেয়েটি আমার দিকে চাইলো, তারপর তার ফ্যাকাশে ভাবলেশহীন মুখে এই প্রথম সামান্য হাসি উঠলো ফুটে।

কী ভেবে আমিও একটু হাসলুম, তারপর উঠে দাঁড়ালুম। মেয়েটি লণ্ঠন নিয়ে আমার সঙ্গে দরজা পর্যন্ত এলো। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আমি কি মনে করে একটা হাত কপালে ঠেকিয়ে তাকে অভিবাদন করলুম। মেয়েটি আবার একটু হাসলো, তারপর দরজা বন্ধ করে দিলো।

রাত তখন তিনটে।

মৃতদেহ

মৃত্যুকে ভয় করে না সন্ধ্যা, এমন কি ভূতকেও নয়, কিন্তু মৃতদেহকে তার ভয়। মৃতদেহের কথা ভাবলেই সমস্ত শরীর সিরসির করে। পায়ের আঙুলের ডগা থেকে ভয়ের সাপ সিরসির করে দেহ বেয়ে ওঠে, মুখ খড়ি হয়ে যায়, হাত-পা হিম হয়ে আসে। যেন হঠাৎ জ্বর হয়। সে-জ্বর তাকে টেনে আনে আতঙ্কের হিমশীতল গুহায়, যেখানে না-আলো না-অন্ধকার। সূর্য যেখানে পৌঁছয় না। ভয়ের অশরীরী ছায়ারা ঘুরে বেড়ায়: না-মৃত্যু না-জীবন সেখানে। কেন তার মৃতদেহকে এত ভয়?—বিকেলের পড়ন্ত রোদে খোলা জানালার সামনে প্রসাধনের সময় অনেকবার সহজ হয়ে ভাবতে চেষ্টা করেছে, কিংবা অনুরূপের পাশে শুয়ে রাত্রির পুঞ্জিত অন্ধকারে মনে করেছে। আর যতবারই মনে করেছে ততবারই সেই ভয়! ভয়ে সমস্ত পৃথিবীর রঙ বদলে গেছে, আতঙ্কে গলা শুকিয়ে এসেছে। কাঠ হয়ে সে যায়। তার সমস্ত শরীর থেকে কে যেন রক্ত শুষে নেয়: হাত নাড়াতে পারে না, ঘাড় ফেরাতে পারে না, পাশ ফিরতে পারে না। মনে হয় পিছনে যেন একটি মৃতদেহ দাঁড়িয়ে আছে, পাশে যেন শুয়ে একটি মৃতদেহ: চোখ আধবোজা আধখোলা, মুখ ফ্যাকাশে শাদা, ঠোঁট ঈষৎ ফাঁক, তুষারশীতল দেহ। সেই তুষার যেন খড়্গের মতো, স্পর্শ করলেই সন্ধ্যা দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাবে। সে-ও একটি মৃতদেহে পরিণত হবে: চোখ আধবোজা আধখোলা, মুখ ফ্যাকাশে শাদা।

সন্ধ্যা অনুভব করেছে সেই মৃত চোখের স্থির দৃষ্টি শুধু যেন তার

উপরেই। সে-দৃষ্টি থেকে উদ্ধার নেই এ-ঘর থেকে ও-ঘরে পালিয়ে, এ পৃথিবী থেকে অন্য পৃথিবীতে চলে গিয়ে। সেই স্থির মৃত দৃষ্টি তার বুকের ভিতর প্রবেশ করে, হৃৎপিণ্ডকে মুঠো করে ধরে।···সমস্ত গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, অজস্র সাপের আলিঙ্গন তার সর্বাঙ্গে। কথা কইতে পারে না, চুল-বাঁধা বন্ধ হয়ে যায়। কতবার ভেবেছে যদি চেঁচিয়ে উঠতে পারতো, যদি পারতো একটু নড়তে তা হলে এই মৃতদেহের সম্মোহন থেকে বুঝি বা মুক্ত হোতো। কিন্তু সে-শক্তি তার কোথায়, হে ঈশ্বর, সে-শক্তি কোথায়? আমাকে শক্তি দাও, আমাকে মুক্তি দাও—কতবার প্রার্থনা করেছে। আর যতবারই মনেমনে এই অনুচ্চারিত প্রার্থনা বেজে উঠেছে ততবারই মনে হয়েছে একটি অদৃশ্য মৃতদেহ তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে। প্রার্থনা করতে তার ভয় হয়। তার আর ঈশ্বরের মাঝে একটি মৃতদেহের ব্যবধান।

"ওগো শুনছো," মাঝে-মাঝে তন্দ্রাচ্ছন্ন অনুরূপকে আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে সে বলে, "আমার ভয় করছে।"

প্রথম-প্রথম অনুরূপ তাকে আদর করতো, চুলের ভিতর হাত বুলিয়ে বলতো, "ছিঃ, ভয় কিসের?" কিন্তু আজকাল আর এই স্ত্রী-সুলভ ন্যাকামি (কারণ অনুরূপ তাই মনে করে) ভালো লাগে না। সমস্ত দিনের খাটুনির পর সে ঘুমুতে চায়। তাই এক রকম ধমক দিয়ে বলে, "পাগলামো কোরো না, ঘুমোও।"

সন্ধ্যার কান্না পায়। দাঁতে দাঁত দিয়ে চুপ করে থাকে। অনুরূপ ঘুমোয়। রাত্রি গভীর হয়, পুঞ্জিত অন্ধকারে নিস্তব্ধ বাড়ি। আর এক সময় হঠাৎ মনে হয়, কী মনে হয় সন্ধ্যা স্পষ্ট জানে না, তবে স্পষ্ট অনুভব করে একটি মৃতদেহের স্থির দৃষ্টি তাকে যেন বিঁধছে। আতঙ্কের সাপ সিরসিরিয়ে তার বুকে এসে ঠেকে। সন্ধ্যা যেন পাথর হয়ে যায়। প্রাণপণে বলতে চেষ্টা করে না-না, প্রাণপণে চেষ্টা করে একটু পাশ ফিরতে, একটু আঙুল নাড়াতে, অনুরূপকে জড়িয়ে ধরতে। কিন্তু পারে না। তার চোখ

তখন আধবোজা আধখোলা, মুখ ফ্যাকাশে শাদা, নিশ্বেস পড়ছে কি পড়ছে না নিজেই বুঝতে পারে না। মনে হয় শরীরটাই বুঝি তার নয়, মনে হয় নিজের শরীরটাই একটা মৃতদেহ।

অথচ সন্ধ্যা জন্ম-ভীতু নয়। তার দেহের আর মনের স্বাস্থ্য আশ্চর্য ছিলো। সতের বছর পর্যন্ত তার দেহ কেউ স্পর্শ করেনি, মনও না। না-অসুখ, না-মানুষ, না-ভূত। তার সতেরো বছরের আশ্চর্য দেহকে প্রথম ছুঁয়েছিলো বিজন। সেই স্পর্শের বিদ্যুতে সে নতুন করে জন্ম নিলো। গাছ যেমন মাটি থেকে রস শুষে খুসিতে সিরসির করে সন্ধ্যাও সে-রকম সিরসির করে উঠেছিলো। অনুরূপকে ভালোবেসেছিলো, স্পর্শ করেছিলো তার সতেরো বছরের আবছা-রঙীন মন দিয়ে।

কী করে বিজনকে সে ভালোবেসেছিলো, কী করে তাদের প্রথম আলাপ সে-কথা না জানলেও চলে। তারা ভেবেছিলো বিয়ে তাদের হবেই। দিনের পর রাত্রি যে-রকম সহজে আসে, তাদের পরিচয় ও প্রেমের পর সেই অকুণ্ঠিত বাসর-রাত্রি যে তেমনি সহজেই আসবে এ-বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিলো না। কিন্তু তিন দিনের জ্বরে বিজন হঠাৎ মারা গেলো। কী যে তার হয়েছিলো তা নিয়ে আজও ডাক্তারমহলে মতভেদ আছে। কিন্তু একটি সতেরো বছরের মেয়ের কাছে তার কোনো মানে নেই। সে শুধু একটি চরম সত্য উপলব্ধি করলো : বিজন মৃত।

বিজনের আত্মীয়-আত্মীয়ারা তখন ভিড় করে কাঁদছে। ঘরে কে যে আসছে কেউ তার হিসেব রাখেনি। তাই সন্ধ্যা যখন দরজা ঠেলে ভিতরে এসেছিলো আর মৃত বিজনকে দেখে হঠাৎ চমকে শাদা দেয়াল ধরে চোখ বুজে খানিক দাঁড়িয়েছিলো কেউ তাকে লক্ষ্যই করেনি। যখন আবার সন্ধ্যা চাইলো তার মনে হোলো বুঝি একটা যুগ কেটে গেছে, ঝড় আর বিদ্যুৎ আর বজ্রে ভরা কালো একটা যুগ। কিন্তু আসলে এক মিনিটও দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে থাকেনি। এক মিনিটেরও কম। তার জীবনে কিন্তু

সেইটেই সবচেয়ে মারাত্মক একটি মিনিট। তার কাণে ঝিঁঝিঁ ডাকতে লাগলো, গলার কাছটা আঠার মতো শুকিয়ে এলো, হঠাৎ গা বমি-বমি করে উঠলো আর হাত-পায়ের অঙুলগুলো ঠাণ্ডা হয়ে এলো। কেনো হোলা জানে না। এমন নয় ঠিক সেই একটি মিনিটে বিজনের জন্যে তার খুব দুঃখ হয়েছিলো। আসলে সেই মুহূর্তে কিছুই ভাবেনি! ঘরে যাবার আগেই তো স্পষ্ট জানতো বিজন নেই: তার মৃতদেহটা শুধু আছে। তবু কে জানতো বিজন ও-রকম করে শুয়ে থাকবে: চোখ আধবোজা আধখোলা, ঠোঁট ঈষৎ ফাঁক, সমস্ত শরীর খড়ির মতো শাদা! এই কি সেই বিজন যে তার ঠোঁটে একদিন আগুন জ্বালিয়েছিলো, তাকে স্পর্শ করেছিলো? কী আশ্চর্য বিজন সেদিন বেঁচেছিলো, আরো কী আশ্চর্য বিজন আজ মরে গেছে! তার মুখের হাঁ যেমন আছে সেইরকম থাকবে, চোখ দুটো বুজবেও না খুলবেও না। তার খড়ির মতো চামড়ার তলা দিয়ে কোনো দিন আর রক্ত বইবে না, জীবনের তাজা উষ্ণ রক্ত!—বিজন তখন আর বিজন ছিলো না সন্ধ্যার কাছে। সে দেখলো সামনের শাদা বিছানায় একটি দীর্ঘ মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। ভাবলো একদিন সেই মৃতদেহই তাকে স্পর্শ করেছিলো, আলিঙ্গন করেছিলো, চুম্বন করেছিলো! সেই মুহূর্তে সমস্ত শরীরে একটি মৃতদেহের আলিঙ্গন সন্ধ্যা অনুভব করলো আর সেই প্রথম সমস্ত শরীর তার সিরসিরিয়ে উঠলো।

অথচ তার এই অদ্ভুত অসুখের কথা কাউকে বলতে পারলো না। তাই বিজনের মৃত্যুর এগার মাস পরে অনুরূপের সঙ্গে যখন বিয়ে হোলো মনেমনে অনুরূপকে কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে সে পারলো না। রাত্রির নিঃসঙ্গতা তাকে পাগল করে তুলেছিলো। বিয়ের পর পাশেই একটি জীবন্ত লোকের উপস্থিতি তাকে অনেকটা সাহস দিতো।

বিয়ের কয়েক মাস পরেই রেলের চাকরি নিয়ে অনুরূপকে আসতে হোলো খড়গপুরে। সন্ধ্যাও এলো। ছোটো বাংলো পেলো অনুরূপ।

সন্ধ্যার কাছে সব সময় থাকবার জন্যে একটা বুড়ি ঝি রাখলো। রেলে ঘোরার তার চাকরি: ভোরে বেরিয়ে যেতে হয়, ফিরতে প্রায়ই রাত এগারোটা-বারোটা বাজে। এক-এক দিন দূর স্টেসনের কাজ শেষ করতে না পারলে সেইখানেই থেকে যেতে হয়। যে-সব রাতে অনুরূপকে বাইরে থাকতে হয় সেই রাতগুলো সন্ধ্যার কাছে রীতিমতো বিভীষিকা। যতক্ষণ পারে বুড়ি ঝি'র সঙ্গে গল্প করে। সে ঘুমিয়ে পড়লে মৃতদেহের বিভীষিকা নিয়ে সন্ধ্যা বিছানায় পড়ে থাকে।

কতবার তার মনে হয়েছে এর চেয়ে সত্যিই কোনো ভূত তার ঘরে এলে বুঝি ভালো লাগতো! কারণ ভূতকে তার ভয় নেই, মৃত্যুকেও না। ভয় মৃতদেহকে: আধবোজা-আধখোলা চোখের স্থির দৃষ্টিকে।

নিজের নিঃসঙ্গতাকে নিয়ে সন্ধ্যা যখন প্রায় পাগল হবার উপক্রম করছে এমন সময় একদিন ভাবী শিশুর খবর পাওয়া গেলো। নিজের সৌভাগ্যকে বিশ্বাস করতেই সন্ধ্যার ভয় হোলো। বিয়ের পর অনুরূপের কাছে যে-রকম কৃতজ্ঞ হয়েছিলো নিজের অজাত-শিশুর কাছে সেই রকম কৃতজ্ঞই হোলো সন্ধ্যা। সে ভাবলো: এতোদিনে ঈশ্বর বুঝি আমার প্রার্থনা শুনতে পেয়েছেন।

খবর শুনে অনুরূপও খুব খুসি। হেসে বললো, "কেবল বল একলা লাগছে। কেমন, এবার তো আর একলা লাগবে না?"

অনুরূপের খাকি শার্ট আর শর্টস্ হাওয়ায় মেলে দিয়ে সন্ধ্যা ফিরে এলো। তখন রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা। বললো, "তাই বলে তুমি যেন দেরি করে ফিরো না।"

"আমি কি আর ইচ্ছে করে দেরি করি মণি?" অনেকদিন অনুরূপ এত মিষ্টি করে কথা বলেনি! "কী খাটুনি যে পড়েছে যদি জানতে! তা ছাড়া বাঁকুড়া থেকে ফেরার এর আগে তো কোনো গাড়ি নেই। এ-রকম দেরি হবেই।"

খেতে-খেতে অনুরূপ আরো অনেক কথা বললো। “খুব সাবধানে থাকবে। একেবারেই দৌড়-ঝাঁপ করবে না। সময়মতো খাবে, সময়মতো ঘুমোবে—বুঝেছো?”

সন্ধ্যা ঘাড় নাড়লো। একটু লজ্জাও পেলো।

“তোমার জন্যে ভালো-ভালো গল্পের বই আনিয়ে দোবো। যখন থাকবো না তখন পোড়ো। সব সময় মন ভালো রাখবে। বুঝলে?”

“বুঝেছি বুঝেছি,” হেসে ফেললো সন্ধ্যা, “একেবারে গিন্নিদের মতো কথা বলতে শিখলে কী করে?—আর একটু ভাত এনে দি?”

অনুরূপও হাসলো। সন্ধ্যার কথার উত্তর না দিয়ে বললো, “ভালো কথা। এ-সময়ে তো মেয়েরা আচার খেতে খুব ভালোবাসে। এ-পোড়া জায়গায় তো আবার আচার পাওয়া যায় না। কাল বুকিং ক্লার্ক কলকাতায় যাবে। বড়বাজার থেকে তোমার জন্যে আচার আনতে বলে দোবো। কিসের আচার ভালোবাসো বল তো? পাহাড়ী মোটা-মোটা লঙ্কার, না কাঁচা আমের, না কুলের?”

“সত্যি, ভীষণ ফাজিল হয়েছো তো?”

“বাঃ, ফাজলামির কী আছে? মাটির হাঁড়ি কি খুরির কথা তো বলছি না!”

“বাস্তবিক, তোমার মেয়ে হয়ে জন্মানো উচিত ছিলো। কিছু জানতে আর বাকী নেই!”

“জানা তো আর খুব আশ্চর্য কিছু নয়! কতবার দেখেছি আমাদের বাড়িতে নতুন ছেলেপুলে জন্মাবার আগে মেয়েরা আস্ত-আস্ত জালাই চিবিয়ে মেরে দিয়েছে!”

“সত্যি ভারি অসভ্য হয়েছো!”

অন্য অন্য দিন বিছানায় শুয়েই অনুরূপ ঘুমিয়ে পড়ে। সমস্ত দিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পর পাশ ফেরবার অবসর পায় না। পাছে বিরক্ত হয়

এই ভয়ে সন্ধ্যাও আজকাল রাত্রে তাকে কোনো কথা বলতো না। আজ কিন্তু অনুরূপ ঘুমুলো না। অনেক দিন পরে সন্ধ্যাকে অনেক আদর করলো। চোখ বুজে পড়ে রইলো সন্ধ্যা। আর মনেমনে আশ্চর্য হয়ে ভাবলো : সব পুরুষই কি একই ভাবে আদর করে ? বিজনও তো কতদিন তাকে এইভাবে আদর করেছে !

আর সেই মুহূর্তে ভয় পেলো সন্ধ্যা, সেই অদ্ভুত সিরসিরে ভয় ! বিজনকে সে ভুলতে চেষ্টা করেছে কত ভাবে। ভাববো না ভাববো না তার কথা, উচ্চারণ করবো না তার নাম, মনেমনেও না—দাঁতে দাঁত ঘসে মনেমনে সন্ধ্যা বলেছে। কিন্তু এতোদিন পারেনি, আজও পারলো না। একটি মানুষকে একেবারে ভুলে যাওয়া, নিজের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ থেকে মুছে ফেলা কি সহজ কথা ? অনুরূপের বুকের কাছে ছোট্ট হয়ে শুয়ে সন্ধ্যা ভাবলো যদি বিজন বেঁচে থাকতো আজ তা হলে তারই বুকে সে থাকতো শুয়ে আর যে-শিশু অদৃশ্য ভ্রূণে তার দেহের রক্ত শুষে পুষ্ট হচ্ছে তার পিতা তো বিজনই হোতো আজ! হে ভগবান, বিজনকে ভোলার শক্তি দাও—নিজের গায়ে নোখ বিঁধিয়ে মনে-মনে সন্ধ্যা বললো। আর সে-শক্তি যদি না দাও তা হলে অন্তত জীবন্ত বিজনকে ভাববার ক্ষমতা দাও।···কেন আমি বিজনকে ভাবতে পারি না যে বেঁচেছিলো একদিন, হেসেছিলো একদিন, ভালোবেসেছিলো একদিন ? তার কথা মনে হলেই কেন আমার শরীর হিম হয়ে আসে ! কেন তাকে দেখতে পাই . খড়ির মতো চামড়া, চোখ আধবোজা-আধখোলা, ঠোঁট দুটো ঈষৎ ফাঁক ? আমার মনে কেন সে মৃত হয়েই রইলো ?

সেই রাত্রে সন্ধ্যা একটি দুঃস্বপ্ন দেখলো : একটা মস্ত শাদা ঘরের চৌকাঠে সে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরে আর কেউ নেই। দূরে একটা খাট। প্রথমে মনে হয় না কেউ সেখানে আছে। কিন্তু পরের মুহূর্তে নিজের ভুল সন্ধ্যা বুঝতে পারলো। খাটে বিজন শুয়ে। একটা হাত ঝুলে পড়েছে,

আর একটা হাত বুকে, রক্তশূন্য মুখ, চোখ দুটো সামান্য খোলা। বিজন নড়ছে না, নিশ্বেস ফেলছে না, কথা বলছে না। সেই সামান্য খোলা চোখ দিয়ে সে যেন সন্ধ্যার দিকে চেয়ে আছে। অদ্ভুত ঠাণ্ডা সেই চাউনি সন্ধ্যাকে স্পর্শ করছে, সমস্ত দেহকে করে ফেলছে অবশ। বিজন কথা বলছে না, কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা চাউনি যেন তার বুকের মধ্যে বরফ হয়ে কথা বলছে! কী বলছে স্পষ্ট বোঝা যায় না। শুধু যেন ডাকছে, নির্মমভাবে ডাকছে। সন্ধ্যা প্রাণপণে দেয়াল আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করছে, চোখ বন্ধ করতে চাইছে, পালাতে চাইছে—কিন্তু পারছে না। মৃত বিজনের মৃত দৃষ্টি এমন জোরে তাকে টানছে! ভীষণ আতঙ্কে তার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, সর্বাঙ্গ হিম হয়ে আসছে—তবু নির্মম সেই দৃষ্টি।

এমন সময় তার ঘুম ভাঙলো। জানালা দিয়ে ভোরের পাণ্ডুর আলো অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তার পাশে অনুরূপ বসে। ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে সন্ধ্যার, একটা হাত দিয়ে প্রাণপণে চেপে রয়েছে অনুরূপের কাপড়।

সে শুনলো অনুরূপ বলছে, "ও-রকম করছো কেন? ভয় নেই, কিছু ভয় নেই। এই ছাখো আমি রয়েছি।"

আস্তে-আস্তে হাতের মুঠো খুলে সন্ধ্যা বসলো। ঢকঢক করে এক গেলাস জল খেয়ে খানিকটা সুস্থ হোলো। কী তেষ্টাই তার পেয়েছিলো! এমন দুঃস্বপ্নও মানুষে দেখে!

ভাত খেতে বসে অনুরূপ বললো, "এ-সময়ে সত্যিই তোমার একলা থাকা উচিত নয়। তেমন শ্বশুরবাড়ি যে আমার নয়, নইলে সেখানেই পাঠিয়ে দিতুম। এই সময় মেয়েরা তো বাপের বাড়িতেই থাকে। কিন্তু …যাক, কী আর করা যাবে!"

সন্ধ্যার নিজের মা নেই। সৎমার সংসারে আবর্জনার মতো এক কোণে বড় হয়েছে।

ডিউটিতে যাবার সময় অনুরূপ আবার বললো, "দেখি, দিদি যদি

এখানে কটা মাস কাটিয়ে যায়। যতদিন না দিদি আসে ততদিন বরঞ্চ ঝি-টাকেই সব সময়ে এখানে থাকতে বোলো। ছ'-টাকা মাইনে বাড়িয়ে দাও। দিনের বেলায় ওকে আর নিজের বাড়ি যেতে দিয়ো না। ছ-টাকায় রাজি না হলে আরো কিছু বাড়িয়ে দিয়ো, বুঝলে ?"

সাড়ে তিন টাকার কমে বুড়ি কিন্তু রাজি হোলো না। নিজের জন্যে খরচ করতে সন্ধ্যা লজ্জা পায় কিন্তু এই বাড়তি খরচ তাকে মেনে নিতেই হোলো। তা ছাড়া বুড়ি এদিকে লোক ভালো। মাইনে বাড়ায় এবং ভবিষ্যতে আরো কিছু পাবার আশায় সে খুব যত্ন করতে লাগলো। বাড়িতেই সে কাঁচের জারে আচার তৈরি করে রোদে দেয়, নানা আজেবাজে গল্প করে সন্ধ্যাকে ভুলিয়ে রাখে। তাই সাংসারিক নানা গোলমালে অনুরূপের দিদির আসতে দেরি হলেও সন্ধ্যার সময় মন্দ কাটছিলো না। তা ছাড়া ভুলে থাকবার মতো এক গলা কাজও সে পেয়েছে।

নানা ছিটের টুকরো অনুরূপ প্রায় প্রত্যহই নিয়ে আসে আর হেসে বলে, "তোমার ছেলের জন্যে নিয়ে এলুম গো···"

সন্ধ্যা খুসি হয়েই বাধা দেয়, "ছেলে কি একলা আমার ? তা ছাড়া পাগলের মতো এতো ছিট আনছো কেনো ? সে কি চিরকালই ছোটো থাকবে আর এই সব লাল-নীল জামা পরবে ?"

কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি জামা তৈরি করে সন্ধ্যার নিজেরি সখ মেটে না। একটা সেলাইয়ের কল থাকলে খুব সুবিধে হোতো। কিন্তু এই লড়াইয়ের বাজারে কল কেনবার কথা তো আর ভাবা যায় না। ছুঁচে সুতো পরিয়ে তাই সে যতটা পারে হাতে-হাতেই জামা সেলাই করে। বুড়ি ঝি সমস্ত দুপুর তার পাশে বসে রঙীন পাড়ের এক দিক পায়ের আঙুলে জড়িয়ে অন্য দিক হাতে টান করে ধরে সুতো তুলে গুলি পাকিয়ে রাখে। জামা তৈরির পর কাঁথা সেলাই হবে। অনেক ছেঁড়া কাপড় জমিয়েছে সন্ধ্যা কাঁথার জন্যে। স্বাভাবিক অবস্থায় যে-শাড়ি সে অনায়াসে আরো

দু-চার ধোপ চালিয়ে দিতো আজকাল সেগুলোকে ছেঁড়া কাপড়ের ঝাঁপিতে বন্ধ করে রাখে। অনুরূপকে বারবার অনুযোগ জানায়, "আজকাল তোমার এতো কম কাপড় ছেঁড়ে কেন বল তো? এ-রকম করলে খোকোন শোবে কিসে?"

অনুরূপ হেসে বলে, "ভেবো না। তোমার ছেলের জন্যে নতুন তোয়ালে কিনে দেবো।"

"ফের বলছো আমার ছেলে!" সন্ধ্যা মিথ্যে রাগ দেখাবার চেষ্টা করে হেসে ফেলে।

যত দিন যেতে লাগলো একটা নতুন স্বাদে ততই সন্ধ্যা ভরে উঠতে লাগলো! এ-রকম তো আগে কখন তার মনে হয়নি: একটি নতুন জীবনের স্বাদ! প্রেমে সে পড়েছিলো, সে ভালবেসেছিলো প্রথম যৌবনে। তখনো তার সমস্ত দেহ টলমল করে উঠেছিলো। নিজেকে নিয়ে কী যে সে করবে ভেবে পায়নি। এখনো সে টলমল করে উঠেছে। কিন্তু উচ্ছ্বাসে নয়, পরিপূর্ণতায়। সে নতুন হয়ে উঠছে প্রত্যহ। অদ্ভুত গর্বে সে যেন ফুলে-ফুলে উঠছে। প্রথম প্রেম যেন ঝড়: ছিঁড়ে ফেলবে, উড়িয়ে নিয়ে যাবে। প্রথম মাতৃত্ব যেন ঝড়ের পরের শান্ত আকাশ: মেঘে-মাজা নীল। নিজের মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্য সৃষ্টির ঘটনা ঘটছে ভাবতেই তার রোমাঞ্চ হয়। একটি নতুন জীবন তার দেহ থেকে সৃষ্টি হচ্ছে তিল তিল করে, প্রতি মুহূর্তে। সে যখন ঘুমিয়ে থাকে, যখন জেগে থাকে, যখন ভবিষ্যৎ-সন্তানের কথা ভাবে, যখন ভাবে না—সব সময়েই সেই আশ্চর্য সৃষ্টির কারুকার্য এগিয়ে চলেছে।

সন্ধ্যা আবিষ্কার করলো গাছের সঙ্গে মেয়েদের অদ্ভুত মিল আছে। যে গাছ ফল দেয় না, সে-গাছ সখের হতে পারে, কিন্তু তার দাম নেই, প্রয়োজন নেই। যে-মেয়ে মাতৃত্বের আভায় ঝলমল করে ওঠে না সে মেয়েও সখের হতে পারে কিন্তু সত্যিই তার দাম নেই, প্রয়োজন নেই,

অনর্থক। অনুরূপের পরিবর্তন দেখেই এই কথা সন্ধ্যার মনে এলো। বিয়ের পর প্রথম কয়েক মাস অনুরূপ তাকে খুব আদর-যত্ন করেছিলো, সত্যি। সে তো সব স্বামীই করে। কিন্তু তার দেহ নিয়ে অনুরূপের সখ মিটে যাবার পরেই সে সাধারণ হয়ে এলো। এতোই সাধারণ যে অনুরূপ যেন মাঝেমাঝে অবজ্ঞাই করতো। কিন্তু এই মাতৃত্বের সম্ভাবনায় অনুরূপের চোখে আবার সে নতুন হয়ে উঠেছে। আগে ডিউটি থেকে ফিরে বিছানায় শুয়েই অনুরূপ ঘুমিয়ে পড়তো। এখনো আগেকার মতোই ক্লান্ত হয়ে ফেরে, কিন্তু ঘুম তার কোথায়? কত রাত পর্যন্ত নানা আবোল-তাবোল কথা বলে সন্ধ্যাকে সে আদর করে। সন্ধ্যার জন্যে ভাবনার তার শেষ নেই। অনুরূপের আবার যেন নেশা ধরেছে: তার দু-বছরের পুরোনো বৌ-এর সঙ্গে আবার যেন নতুন করে সে প্রেমে পড়েছে।

এমনি করে মাস আষ্টেক কাটলো। হাসপাতালের এক ডাক্তারকে অনুরূপ ঠিক করেছে। মাসে বার দুই সে সন্ধ্যাকে পরীক্ষা করে যায়। প্রত্যেকবারই উদ্বিগ্ন হয়ে অনুরূপ জিগগেস করে, "কী রকম দেখলেন? কোনো কম্‌প্লিকেশন্‌স্‌ নেই তো?"

সেদিন ডাক্তার হেসে বললো, "পাগল হয়েছেন? কম্‌প্লিকেশন্‌স্‌ আবার কী? ভারি হেল্‌দি চাইল্ড হবে, মিঃ রায়। আজ তো চমৎকার হার্ট-বিটন্‌ পেলুম।"

পাশের ঘর থেকে সন্ধ্যা কথাগুলো স্পষ্টই শুনতে পেলো: তার মধ্যে একটি স্পন্দমান নতুন জীবন! এর চেয়ে আশ্চর্য ঘটনা কি পৃথিবীতে আর কখনো ঘটেছে? কার প্রতি জানে না, কিন্তু অপূর্ব এক কৃতজ্ঞতায় সমস্ত মন তার ভরে উঠলো।...আর ভয় নেই, হে ঈশ্বর, আর ভয় নেই! মৃত-দেহের আলিঙ্গন থেকে আমাকে তুমি বাঁচিয়েছো। আমার মধ্যে একটি স্পন্দমান জীবন, সাধ্য কি কোনো মৃতদেহের সম্মোহন আমাকে স্পর্শ করে!

বাইরের ঘরে তখনো ডাক্তার আর অনুরূপ গল্প করছিলো। তাদের জন্যে চা আর ডালমুট ট্রেতে সাজিয়ে নিজেই সন্ধ্যা নিয়ে এলো। এতো খুসি কখনো জীবনে সে হয়নি।

অনুরূপের চেয়ে ডাক্তার কিছু বড়। খুব ফুর্তিবাজ হাসিখুসি লোক। যে-বাড়িতে যায় সে-বাড়িতেই খানিক গল্প না করে ওঠে না।

"মিসেস রায়, আপনি আশ্চর্য! কী করে বুঝলেন চা না খেয়ে উঠবো না?"

ছোটো কেরোসিন কাঠের টেবিলে ট্রে নামিয়ে সন্ধ্যা তৃপ্তির হাসি হাসলো। এতো তৃপ্তি পৃথিবীতে যে আছে তা সে জানতো না! আজকাল তার শরীর নতুন শিশুর ভারে মন্থর। অপরূপ আলস্যে সে ভরে উঠেছে। মধুর আলস্য।

চায়ের পেয়ালা শেষ করে ডাক্তার বললো, "মিঃ রায়কে বলছিলুম ডেলিভারির সময় আপনাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার কথা। আমার মতে সেইটাই সবচেয়ে সেফ জায়গা। আপনার কোনো আপত্তি নেই তো?"

আপত্তি? কোনো কিছুতেই সন্ধ্যার আজকাল আপত্তি নেই!

সেদিন সকালে অনুরূপ ডিউটিতে বেরিয়ে যাবার পর একটা ছোটোখাটো দুর্ঘটনা ঘটলো।

বাড়ির ভিতরে মাঝারি একটি উঠোন। উঠোন পেরিয়ে খিড়কির দরজা। দরজার দু-পাশে কয়েকটা পেঁপে গাছ ও একটি মাধবীলতা। মাধবীলতার গোড়াটা বেশ মোটা, তার লতানে হাত-পাও অসংখ্য। খিড়কির দরজা ছুঁয়ে, পাঁচিল বেয়ে এদিকের ঘরগুলোর

উপরেও ছড়িয়ে পড়েছে। অজস্র ফুল তাতে—শাদার উপর লালের ছিটে দেয়া, কুঁড়িও অনেক। এই ফুল সন্ধ্যার অত্যন্ত প্রিয়। প্রত্যহ সে কুঁড়িতে-ফুলে মিশিয়ে বসবার ঘরের ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখে। সমস্ত দিন ঘরের বাতাসে একটা আনমনা ফিকে গন্ধ ভেসে থাকে। ছোটো-ছোটো জামা সেলাই করতে-করতে সমস্ত দুপুর সন্ধ্যা গুনগুন করে, মাঝেমাঝে দাঁতে সুতো কাটবার সময় আড়চোখে ফুলগুলো দেখে। কি যেন ভাবে, নিজের মনেই খুসি হয়ে ওঠে।

অনুরূপ বেরিয়ে যাবার পরেই ভিতরের দালান থেকে হাত বাড়িয়ে সন্ধ্যা একটা ফুলের ডাল টেনে আনতে গেলো। পায়ের বুড়ো আঙুল তার দেহের টাল সামলাতে পারলো না। দালান থেকে হাত দেড়েক নিচু উঠোনে সন্ধ্যা আছড়ে পড়লো।

পড়ে গিয়ে যতটা তার লাগলো তার চেয়ে ভয় পেলো সন্ধ্যা অনেকটা বেশি···একি, একি তার হোলো! বুড়ি ঝি উঠোনের এক পাশে বাসন মাজছিলো। বাসন ফেলে ভিজে অপরিস্কার হাতেই সন্ধ্যাকে সে তুললো। বললো, "ছিছি বৌমা; এখন খুব সাবধানে থাকতে হয়। দেখে চলবে, দেখে ওঠানামা করবে। এ-রকম পড়ে যাওয়া ভালো নয়! অলুক্ষণে কাণ্ড! —ওঠো, লাগেনি তো?"

অলুক্ষণে কাণ্ড? কথাগুলো তীরের মতো তার বুকে বিঁধলো। বুড়ির প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে সন্ধ্যা বললো, "অলুক্ষণে কেন পানুর মা?"

"ওমা, অলুক্ষুণে নয় আবার? পোয়াতি মানুষকে খুব সাবধানে থাকতে হয় বৌমা! কত খারাপ বাতাস আছে, কত খারাপ দিষ্টি আছে। ডাইনেরা তো পেটের ছেলে খাবার জন্যে সব সময় ঘুরঘুর করে বেড়ায়। সন্ধেবেলায় এলোচুলে যদি থেকেচো, দুপুর বেলায় ভিখিরির ডাকে একা যদি বেরিয়ে এসেচো তা হলেই সব্বোনাশ। এক নিমিষে তারা খেয়ে ফেলবে।—তোমরা মা সহরের মেয়ে, তোমরা তো আর এ-সব মানো না।

কিন্তু আমি মানুষটা বুড়ি হলুম, অনেক দেখেছি। আমার চোখের সামনে, জানো বৌমা, পটলিকে ডাইনে ধরেছিলো। ওঝা এসে অনেক ঝাড়ফুঁক করে পটলিকে বাঁচালো, কিন্তু ন-মাসের মেয়েটা বাঁচলো না।' পেট থেকে মরা মেয়ে বেরুলো।"

বুড়িকে ধরে কোনো রকমে ঘরে এলো সন্ধ্যা। নিজেকে অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করলো। বিছানায় শুয়ে বললো, "কি যেন হোলো পান্নুর মা! ফুল তুলতে গিয়ে পা দুটো টলে গেলো আর পড়ে গেলুম!"

"ও রকমই হয় বৌমা, ও রকমই হয়। আমি একটা মাদুলি দোবো, যতদিন না ছেলেপুলে হয় ততদিন পোরো।" তারপর কপালে হাত ঠেকিয়ে বললো, "কে জানে কোন দেবতা তখন গাছে ছিলো!"

বুড়ির একটা শিরাবহুল লোল হাত চেপে ধরে সন্ধ্যা বললো, "তুই যাসনি পান্নুর মা, আমার ভয় করছে।"

বুড়ি এবার সাহস দিয়ে বললো, "না বৌমা, ভয় পেয়ো না। ভয় পেলেই ওরা পেয়ে বসবে।...কিন্তু আমাকে যে বৌমা, একবার বাড়ি যেতেই হবে। মেয়েটা অনেকদিন পর শ্বশুরঘর থেকে ফিরেচে। কোথায় ভাবলুম দুদিন একটু বাড়িতে আমোদ করবে, হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে-বসে থাকবে—সেখানে তো আর বসতে পায় না, খেটে-খেটে হাড় কালি হয়ে গেলো—কিন্তু বৌমা, কপালে কি আর সুখ আছে! কথায় বলে ঢেঁকি স্বগগে গেলেও ধান ভানে। আমার মেয়েটারো হয়েচে তাই। বাড়িতে এসেই কোলের মেয়েটা জ্বরে পড়েচে। কী ভীষণ জ্বর যদি জানতে বৌমা! গায়ে হাত দেয়া যায় না। যেন পুড়ে যাচ্ছে। সমস্ত রাত মেয়ে কোলে ঠায় বসেছিলো। আজ আমি যদি মেয়েটাকে একটু না ধরি তা হলে ওর তো নাওয়া-খাওয়া হয় না। তুমি ভেবো না বৌমা, দরজা বন্ধ করে শুয়ে থাকো। কিচ্ছু ভয় নেই। আমি যাবো কি আসবো। আর আসবার সময় সেই মাদুলিটা নিয়ে আসবো।"

এই অবস্থায় ঝি-কে ধরে রাখা অত্যন্ত স্বার্থপরের মতো দেখায়। তাই তাকে যেতে দিতে হোলো। ঝি চলে গেলে বাইরের দরজা বন্ধ করে সন্ধ্যা আবার বিছানায় শুয়ে পড়লো। সমস্ত শরীরময় একটা বিশ্রী অস্বস্তি।

সন্ধ্যার মনে কোনো কুসংস্কার নেই। এই নিয়ে সে অনেকবার গর্ব করেছে। কিন্তু শরীরের সঙ্গে মনের সম্বন্ধ খুব নিকট। তার সুস্থ শরীরে যা সে উড়িয়ে দিতে পারতো অসুস্থ শরীরে আজ তা পারলো না। তা-ছাড়া ভাবী শিশুর অমঙ্গল আশঙ্কা তাকে আজ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

কড়া রোদে বাইরের পৃথিবী ভরা। সকালের পর হঠাৎ যেন এখানে দুপুর হয়। আর দুপুরগুলো কী অদ্ভুত নিস্তব্ধ, যেন খাঁ-খাঁ করে। সন্ধ্যার উঠে বসতে ইচ্ছে করলো।

বাইরে রোদ আরো কড়া হচ্ছে। বরফওলা পথ দিয়ে হেঁকে গেলো। দুপুরের ট্রেনটা কলকাতায় গেলো চলে। একটা কাক উঠোনে নেমে মোটা বিশ্রী গলায় ডাকতে লাগলো : কা-কা-কা।

আর সেই মুহূর্তে একটা আশঙ্কায় সন্ধ্যা চমকে উঠলো, আর কথাটা মনে হতেই বিদ্যুৎস্পর্শী মানুষের মতো সে সোজা হয়ে উঠে বসলো : তার ভাবী সন্তানের কিছু হয়নি তো? সে বেঁচে আছে তো?

আর সেই মুহূর্তে সেই সিরসিরে ভয়ে সন্ধ্যার দেহে কাঁটা দিয়ে উঠলো। তার ভাবী সন্তান নিশ্চয়ই বেঁচে নেই! নিজের নিশ্বেস বন্ধ করে সে শুনতে চেষ্টা করলো শিশুর স্পন্দন। "খোকোন, খোকোন," খুব ফিসফিস করে সন্ধ্যা দু-বার ডাকলো আর অবুঝের মতো আশা করলো তার সন্তান সাড়া দেবে! আর পরের মুহূর্তে সেই মৃতদেহের ভয়ে সে অসাড় হয়ে গেলো। যে মৃতদেহকে তার এতো ভয় নিজের মধ্যেই আজ সেই মৃতদেহ এসেছে!

এতো জোরে বুক ধ্বক-ধ্বক করতে লাগলো যে তার মনে হোলো এখুনি বুঝি মরে যাবে। সে উঠে দাঁড়ালো। পা কাঁপছে, তার শরীরের ভার পা দুটো তুলে ধরতে পারছে না। ঘর থেকে বেরিয়ে টলতে-টলতে উঠোনে এসে দাঁড়ালো। আঁচল খসে মাটিতে লুটুচ্ছে। কড়া রোদে উঠোনের সিমেণ্ট আগুন হয়ে রয়েছে। বাইরে বাতাস নেই! সেই ঝাঁ-ঝাঁ রোদে মাধবী ফুলের ফিকে গরম গন্ধ। পেঁপে গাছের শুকনো পাতার মধ্যে একটা গিরগিটি খড়খড় করে চলে গেলো। তার উপরের কচি পাতা দিয়ে ফিকে-সবুজ আলো বেরুচ্ছে যেন। একটা কাক এসে পাঁচিলে বসলো, মিসকালো রঙ, চোখগুলো রক্তের মতো লাল। সন্ধ্যাকে দেখে ভয় পেলো না। সেখান থেকেই কর্কশ গলায় ডাকতে লাগলো।

এই মৃতদেহকে ফেলে কোথায় সন্ধ্যা যাবে! বাড়ি ছেড়ে তার দৌড়ুতে ইচ্ছে হোলো। কিন্তু সে-শক্তি এখন নেই। দৌড়ুনো তো দূরের কথা, দরজার ছিটকি খুলতেও সে পারবে না। কোনো রকমে টলতে-টলতে সন্ধ্যা খাটে এসে শুলো। ক্রমশ আলো মিলিয়ে এলো তার চোখ থেকে। কানে ঝিঁ-ঝিঁ ডাকছে, বাইরে ঝাঁ-ঝাঁ রোদ। মাঝে-মাঝে একটা কাক মোটা ভাঙা গলায় ডাকছে।

বিছানায় শুয়ে সন্ধ্যা জন্তুর মতো হাঁপাতে লাগলো। আজ তার নিজের শরীরে মৃতদেহ, আজ তার উদ্ধার নেই। পৃথিবীর কোনোখানে এমন একটু জায়গা নেই যেখানে গেলে সে বিপদমুক্ত।

ক্রমশ সে যেন বিছানায় তলিয়ে যেতে লাগলো। চোখ খোলবার সাহস তার নেই। সে স্পষ্ট অনুভব করলো একটি মৃতদেহের মৃত দৃষ্টি তার দেহকে স্পর্শ করছে। তার দেহকে কেটে-কেটে সেই দৃষ্টি ক্রমশ যেন ভিতরে আসছে। ঠাণ্ডা হয়ে এলো বুকের ভিতরটা, একটা ঠাণ্ডা মৃত হাত যেন তার হৃৎপিণ্ডকে নিংড়ে নিচ্ছে।

সেই আধজাগা অবস্থায় সন্ধ্যা বুঝতে পারলো তার শিশু আর কেউ নয়, সে বিজন। বিজন এসেছে তার মধ্যে মৃতদেহ হয়ে। বিজন তো একদিন বলেছিলো : তোমায় কখনো ভুলবো না ; যদি কখনো আমাকে ভুলে যাও তা হলেও আমি থাকবো, আমি আসবো, তুমি যদি কোথাও সরে যাও সেখানে গিয়ে তোমাকে মনে করিয়ে দেবো !—ঠিক এই কথাগুলোই বিজন বলেছিলো কিনা সন্ধ্যার মনে নেই, তবে এই ধরনের কথাই যেন বলতো।

সেই অবস্থায় সন্ধ্যা একটি স্বপ্ন দেখলো : বিরাট এক মাঠ। সেই মাঠের মাঝখানে এক বুড়ি দারুণ রোদে বসে রয়েছে। তার চুল শনের মতো শাদা, সামনের দিকে দুটো বড়-বড় দাঁত, অন্য দাঁত নেই, সমস্ত দেহের মাংস চামড়ার মধ্যে যেন গলে গিয়ে টলটল করছে। রোদে পুড়ে মুখটা ঝামার মতো কালো, সেই কালো মুখের উপর ভোঁতা ছুরি দিয়ে কে যেন ক্ষতবিক্ষত করে সহস্র আঁচড় কেটেছে। বুড়ি উবু হয়ে বসে, শুধু কোমরে এক টুকরো গেরুয়া কাপড়। পিঠ ধনুকের মতো বাঁকা, রোদে পুড়ে লোহার মতো তেতে উঠেছে। দুটো স্তন শুকিয়ে শক্ত হয়ে গেছে। সূর্য আগুন ছড়াচ্ছে। কিন্তু তার চোখের দিকে চাইলে সূর্যকেও ঠাণ্ডা মনে হয়। বুড়ি নিজের মনে বিড়বিড় করছে, একটা কাঠি দিয়ে মাটিতে আঁচড় কাটছে, এক-এক মুঠো ধুলো তুলে বাতাসকে ছুঁড়ে মারছে আর রক্ত চোখ তুলে চাইছে। আর সে-দিকের সমস্ত কিছু পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। বুড়ি তার মাধবী গাছটার দিকে ধুলো ছুঁড়লো আর দেখতে-দেখতে গাছটার রঙ প্রথমে হলদে, পরে তামাটে, শেষে একেবারে ধুলোর মতো হোলো আর গাছটা জীবন্ত প্রাণীর মতো ছটফট করতে-করতে মরে গেলো, ধুলো হয়ে গেলো। বুড়ি আবার এক মুঠো ধুলো ছুঁড়লো মাঠের মধ্যেকার দু-শো বছরের পুরানো বটগাছের দিকে। বটগাছটাও দেখতে-দেখতে

শুকিয়ে গিয়ে কঙ্কালের মতো রিক্ত হ'য়ে দাঁড়ালো, তারপর মড়মড় করে ভেঙে পড়লো। তারপর বুড়ি এক মুঠো ধুলো তুলে দাঁড়িয়ে উঠলো আর বীভৎস এক চীৎকার করে সেই ধুলো আকাশে দিলো ছড়িয়ে। দেখতে-দেখতে আকাশ অন্ধকার করে ধুলোর ঝড় উঠলো। চারিদিকে সোঁ-সোঁ শব্দ। কিছু দেখা যায় না। পৃথিবী বুঝি আজ ধ্বংস হোলো। সেই ঝড়ের মধ্যে বুড়িকে মাঝে-মাঝে দেখা যায়: দু-হাত তুলে উলঙ্গ হয়ে নাচছে আর ভয়ঙ্কর চীৎকার করে হাসছে—তার সামনের দাঁত দুটো বড় ভয়ঙ্কর।…ঝড় যে রকম হঠাৎ উঠেছিলো সে রকম হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলো। কোনো দিকে বাড়ি বা গাছপালা দেখা যায় না। ধূ-ধূ করছে বালির সমুদ্র, আর সূর্য মাথার উপর, ক্ষমাহীন নিষ্ঠুর। সেই বালির সমুদ্রে সন্ধ্যা একা। এগিয়ে চলেছে, কোথায় জানে না। কিছু দূরে সে দেখলো অনেক হাড়, একপাল শীর্ণ শেয়াল সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অধিকাংশ শেয়ালেরই একটা করে চোখ নষ্ট হয়ে গেছে। অনেকগুলো শকুন: কতকগুলো মন্থর পায়ে ঘুরছে, কতকগুলো মাথার উপর উড়ছে। সন্ধ্যার দিকে তারা সবাই কটমট করে চাইতে লাগলো। একটা শেয়াল সামনের বিশ্রী বড় দুটো দাঁত বার করে খিঁচিয়ে এলো। ভয়ে দুরদুর করে উঠলো তার বুক। মরুভূমির সেই রুদ্র শ্মশান দিয়ে যেতে-যেতে সন্ধ্যা একটা কাঠের বাক্স দেখতে পেলো। সেদিকে সে চললো এগিয়ে, কেন চললো জানে না। যতই কাছে আসতে লাগলো ততই সেই বাক্সটা আয়তনে যেন বাড়তে লাগলো। একেবারে কাছে এসে সন্ধ্যা দেখলো বাক্সটা একটা পাহাড়ের মতো বিরাট। ছোটো-ছোটো সিঁড়ি উপর পর্যন্ত উঠে গেছে। বহু কষ্টে সন্ধ্যা সেই সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠলো। আর উপরে উঠতেই ভীষণ শব্দ করে বাক্সর ডালাটা গেলো খুলে। উপর থেকে ঝুঁকে সন্ধ্যা দেখতে লাগলো ভিতরে কী আছে। প্রথমে অন্ধকারে কিছু দেখতে পেলো না।

ক্রমশ সেই অন্ধকার ফিকে হয়ে এলো, কোথায় যেন অস্পষ্ট আলো জ্বলছে। সে আলোয় কোনো প্রাণ নেই, আনন্দ নেই, স্পন্দন নেই। সন্ধ্যা ভিতরে নেমে এলো, ভীষণ আতঙ্কে সমস্ত শরীর তার ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। সে হাঁটতে পারছে না, তবু হাঁটতে হচ্ছে। কারা যেন তার পাশ দিয়ে চলে গেলো : মাথা নিচু, ফিসফিস করে কথা কইছে। তাদের কথা কিছুই শোনা যায় না। সন্ধ্যাকে তারা দেখেও দেখলো না। সন্ধ্যা তাদের দেখতে পেয়েও দেখতে পেলো না। অনেকটা পথ আসার পর একটা ঘরের সামনে সে দাঁড়ালো। বুক কাঁপতে লাগলো তার ভয়ে আর উত্তেজনায়। দরজা দিয়ে অনেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে যাচ্ছে। কারুর মুখ সে দেখতে পেলো না। খোলা দরজা দিয়ে সে-ও ভিতরে ঢুকলো। ঘরে মস্ত এক খাট। সেখানে শাদা কাপড় বিছানো। সন্ধ্যাকে দেখে দুটো লোক সেই চাদর তুলে ফেললো আর পাশের শাদা দেয়াল আঁকড়ে সে যেন পাথর হয়ে গেলো : সেই শাদা বিছানায় বিজনের মৃতদেহ, চোখ আধবোজা আধখোলা, ঠোঁট ঈষৎ ফাঁক, রঙ খড়ির মতো। সন্ধ্যার সমস্ত দেহ অসাড় হয়ে এলো, এতোদিন পরে আবার তাদের দেখা হোলো। এই শতাব্দীর অভিশাপের মাঝে, মহা-শ্মশানের আলোয় আজ মুখোমুখী দাঁড়ালো এক নারী ও পুরুষ। বিরাট এক ধ্বংসস্তূপের মাঝে আজ তারা দু-জন : মৃত্যুর তুষারশীতল স্তব্ধতা বাসা বেঁধেছে তাদের বুকে।

যখন অনুরূপ এলো, যখন ডাক্তার এলো তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। রাত্রি প্রায় একটার সময় ডাক্তার ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, অনুরূপ বাইরে অপেক্ষা করছিলো। একটি নতুন শিশুর তীব্র চীৎকার খোলা দরজা দিয়ে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

কপালের ঘাম মুছে ডাক্তার বললো, "বি স্ট্রং মিঃ রায়। দু-জনকে বাঁচাতে পারলুম না। আপনার ছেলে বেঁচেছে।"

রাত্রে চমৎকার বাতসে বইছে। বাতাসে মাধবী ফুলের আনমনা গন্ধ।

বান্ধ

বামুনদিদিকে চেনে না এ-রকম লোক খুব কম। ছিপছিপে লম্বা গড়ন, শাদা-হলদে মেশানো রঙ, কানের পাশের চুলে পাক ধরেছে, তবে সিঁথির চুল এখনো কাকের মতো কালো, বাঁ-দিকের চোখের নীচে বড় একটা জড়ুল, চোখের তলায় তিন-চারটে রেখা। ফিকে-সবুজ তার চোখের তারা। পাড়ার সবাই তাকে বামুনদিদি বলে, ছেলে বুড়ো সবাই। বিধবা মানুষ। পরিষ্কার শাদা থান-কাপড় পরা। বাড়ির বাইরে যখন বেরোয় সিল্কের একটা চাদর গায়ে জড়িয়ে নেয়, শীতকালের জন্যে তুষের ধূসর একটা গরম চাদর বাক্সে তোলা থাকে। খুব বেশি শীত না পড়লে ব্যবহার করে না।

এমনিতে বেশ প্রফুল্ল, কিন্তু বামুনদিদি গম্ভীর হতেও জানে। ফলে পাড়ার সবাই তাকে বেশ সমীহ করেই কথা বলে। কালীঘাটে তার একতলা বাড়ির সামনে দিয়ে দেবনারায়ণবাবু বছর আষ্টেক আগে কারণে-অকারণে প্রায়ই ঘোরাঘুরি করতেন। দেবনারায়ণবাবু রিটায়ার্ড হাকিম। দুবার বিয়ে করেছিলেন। এক স্ত্রী এখনো বেঁচে, অনেকগুলি অপগণ্ড ছেলেও বর্তমান। তবু প্রাণে তাঁর সখের অন্ত ছিলো না। পরিপাটি করে চুলে কলপ দিতেন, কোঁচানো ধুতি পরতেন, শাদা শক্ত-হাতা কলারহীন শার্টের উপর পাকানো চাদর ফাঁস দিয়ে বাঁধতেন, সন্ধেয় বেরিয়ে মাঝ-রাতে বেড়িয়ে ফিরতেন। তখন একদিন বামুনদিদির সঙ্গে কি যেন তাঁর কথা হয়েছিলো—কী কথা কেউ জানে না। কিন্তু ফলটা সবাই

প্রত্যক্ষ করলো : দেবনারায়ণবাবু সে-পথ ছাড়লেন। সমবয়সী বন্ধুমহলে বামুনদিদির কথা উঠলে শুধু বলেন, "ওরে বাবা, উনি অতিশয় পুণ্যাত্মা। ওঁর সঙ্গে ইয়ার্কি নয়।"

এই আট বছরে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। দেবনারায়ণবাবুর অনেকগুলো দাঁত পড়ে গেছে, মাথায় প্রশস্ত টাক। সাইটিকায় প্রায়ই শয্যাশায়ী থাকেন, কচিৎ লাঠিতে ভর দিয়ে বাড়ির সামনে সামান্য পায়চারি করেন, নয়তো ফুটপাথের উপর চেয়ার আনিয়ে বসেন। বামুনদিদির কিন্তু বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। শুধু কানের পাশের চুলগুলো শাদা হয়ে গেছে। এখনো শরীর সোজা রেখে খালি পায়ে, শাদা থানের উপর সিল্কের চাদর জড়িয়ে হনহন করে সে ঘুরে বেড়ায়। রোদে বিদ্যুল্লতার মতো দীপ্ত শরীর, ঝক-ঝকে সোনার মতো রঙ—বাস্তবিক এককালে সে যে অসাধারণ রূপসী ছিলো সে-বিষয়ে কারুর সন্দেহ থাকে না।

বামুনদিদি সংসারে একা। কতদিন ধরে একা কেউ জানে না। থাকে কালীঘাটের মন্দিরের কাছে ছোটো একটি ঘর ভাড়া নিয়ে। কতদিন ধরে যে সেখানে আছে বাড়িওলারও বোধ হয় আজ মনে নেই।

নিজের সব কাজ সে তো করেই তা ছাড়া আছে নানা বাড়ির মেয়েদের ফাইফরমাস খাটা। সমস্ত সকালটা সে ঘুরেঘুরে বাজার করে, গঙ্গাস্নান সেরে কালীদর্শন করে আসে, রান্নাবাড়া করে, ঘর ঝাঁট দিয়ে, ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে, তারপর অন্য বাড়ির লোকেরা যখন আপিস-কলেজে বেরিয়ে যায়, বামুনদিদিও বেরোয় তার সিল্কের চাদরটা জড়িয়ে।

নানা পাড়ায় নানা বাড়িতে সে ঘোরে। বাড়ির শ্বাশুড়ি-বৌ-এর সঙ্গে তার সমান আলাপ। ছোটো ছেলেরাও তার বন্ধু যেন। সবাইকার সঙ্গেই হেসে-হেসে সে গল্প করে।

বলতে গেলে লোকের দানের উপরেই তার চলে। তবু শুধু-শুধু দান সে নেয় না। প্রতিদানে নানা কাজ করে ঋণ শোধ দেয়। তার মতো

কাঁথা সেলাই করতে, তত্ত্ব সাজাতে, চুল বাঁধতে, সেকা করতে, কেউ পারে না। নানা রকমের বড়ি দিতেও তার সমান কেউ নেই। তা ছাড়া মেয়েদের ফাইফরমাস তো আছেই। সবই সে হাসিমুখে করে! অনেক মেয়ের ধারণা আশ্চর্য হাত দেখতে জানে বামুনদিদি। এ-কথা তাকে জিগগেস করলে সোজা উত্তর কেউ পায় না। সে শুধু হাসে, নেহাৎ ধরাধরি করলে হয়তো মেয়েদের হাত টেনে নিয়ে দেখে, তারপর কোনো উত্তর না দিয়ে বলে, "আমি মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ মা, আমার কি আর অত বিদ্যে আছে।" কিছুতেই কোনো কথা কবুল করতে চায় না। ফলে তার উপর লোকের ভক্তি বেড়েই যায়।

মাঝে বোমার ভয়ে কলকাতার প্রায় সব ছেলেমেয়েদেরই লোকেরা বাইরে রেখে এসেছিলো। যারা চাকুরে শুধু তারাই ছিলো। অনেকে সপরিবারেই গিয়েছিলো। ভারি তখন অসুবিধেয় পড়েছিলো বামুনদিদি। যে বাড়িতে শুধু পুরুষ সে-বাড়িতে বামুনদিদি কখনো যায় না—হোক না নিজের বয়েস আজ পঞ্চাশের কাছাকাছি। হয়তো নিজের অতীতের দিকে চেয়ে সে শিউরে ওঠে! আবার কোনো পুরুষকে বিশ্বাস করা··· জানোয়ার, জানোয়ার···উত্তেজনায় তার বুক দ্রুত ওঠা-নামা করে, সমস্ত মুখ টকটকে হয়ে যায়, তপ্ত সোনায় যেন মধ্যাহ্ন-সূর্যের আভা এসে পড়ে।

নিজের যা পুঁজিপাটা ছিলো তাই ভাঙিয়ে কোনো রকমে ক-টা মাস সে চালিয়েছিলো। শেষে দিনে একবেলা খেতো। তা-ও যখন বন্ধ হবার উপক্রম সে ভেবেছিলো হয়তো ভিক্ষেই করতে হবে। সে-ও বরঞ্চ ভালো, প্রকাশ্য রাজপথে ভিক্ষে করা। কিন্তু যে-বাড়িতে মেয়েরা নেই সে-বাড়িতে সাহায্য চাইতে যাওয়া তার কাছে প্রশ্নের বাইরে।

কিন্তু বোধ হয় রামুনদিদির পুণ্য প্রভাবেই কলকাতার লোকেরা আবার ফিরে আসতে লাগলো। এক-একটা সংসারের উপর দিয়ে যেন দারুণ ঝড় বয়ে গেছে, সমস্ত গেছে উলট-পালট হয়ে।

মিত্তিরদের বাড়িতে যেতেই গিন্নি হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলো। তার এক ছেলে কলেরায় আর এক ছেলে সাপের কামড়ে মারা গেছে। কাঁদতে-কাঁদতে সে বললো, "এর চেয়ে বোমা পড়লে আর বেশি কি হোতো বামুনদি? আমার সংসারে বোমা তো পড়েই গেছে!"

"ঠিক বলেছো মা। নিজের কপালকে কি কেউ এড়াতে পারে?"

সান্যালগিন্নির বাড়ির ছেলেবুড়ো সবাই ম্যালেরিয়া ধরিয়ে এনেছে। ওষুধে-ডাক্তারে বাড়ি-ভাড়ায় গাড়ি-ভড়ায় মেয়ের বিয়ের জন্যে যা জমানো ছিলো প্রায় সমস্তই গেছে খরচ হয়ে। বামুনদিদি ভরসা দিয়ে বলে, "ভেবো না মা, যিনি নিয়েছেন তিনিই আবার দু-গুনো করে ফিরিয়ে দেবেন।"

হরিহরবাবুর স্ত্রী হার্টের অসুখে ভুগছিলেন। সেই ভিড়ের সময় হুড়োহুড়ি করে বাইরে গিয়ে বোমার হাত থেকে বেঁচেছিলেন বটে, কিন্তু যমের হাত থেকে বাঁচেননি। তাদের বাড়ির বুড়ি ঝি-কে বামুনদিদি সান্ত্বনা দিয়ে এলো।

শুধু ভালো হয়েছে একমাত্র মনোহরবাবুর। তাঁরা সপরিবারে গিয়েছিলেন মধুপুর। মেয়েটি সতেরোয় পড়লো, অথচ বিয়ের কিছু করতে পারছিলেন না। কিন্তু মধুপুরেই এক জমিদার পরিবারের সঙ্গে তাদের আলাপ হয়। আর সৌভাগ্যক্রমে অলকা তাদের চোখে লেগে যায়। তারাও ছেলের জন্যে বৌ খুঁজছিলো। কলকাতায় ফিরেই খুব ঘটা করে অলকার বিয়ে হয়ে গেলো। কুটনো কোটা, তত্ত্ব সাজানো, মেয়ে সাজানো ইত্যাদি নানা কাজ বামুনদিদি প্রায় একাই করলো। শুধু বিয়ের সময় রইলো না, বিধবা মানুষকে শুভ কাজের সময় থাকতে নেই। বামুনদিদি জানে, তাকে সে-কথা বলে দিতে হয় না।

কলকাতার অবস্থা আবার প্রায় স্বাভাবিক হয়ে গেলো। যারা বাইরে গিয়েছিলো একে-একে সবাই ফিরে এসেছে। ছেলেবুড়ো বৌ-ঝি সবাই বলে এবারে মাথার উপর বোমা পড়লেও তারা কলকাতার বাইরে যাবে না।

বামুনদিদিকে আবার সব সময় ব্যস্ত-চঞ্চল দেখা যায়। নানা কাজে সে ঘুরে বেড়ায়। বিশ্রাম নেবার সময় নেই।

দুপুর বেলায় মেয়েদের বিন্তি খেলার আড্ডায় বামুনদিদি খানিক বসে। সবাই চায় তাকে পাশে বসাতে। বামুনদিদি বসলেই নাকি জিৎবে। সবাইকেই খুসি করে সে। সরলার দিকে চেয়ে বলে, "কিগো মা, তোমার জন্যে কবে কাঁথা বুনতে লাগবো ?"

লজ্জায় মুখটা সিঁদুরের মতো লাল করে সরলা মাথা নীচু করে। তার শাশুড়ি বলে, "আর বোলো না বামুনদি। আজ তিন বচ্ছর বিয়ে হোলো বৌ আমার বাঁজা তালগাছ হয়ে বসে আছে। মা-কালীকে কত লোভ দেখালুম, বললুম সোনার খাঁড়া গড়িয়ে দোবো—তা-ও দেখো দিকিনি কাণ্ডখানা !"

মৈত্র-গিন্নি বলে, "মা-কালী কি করবে বাপু! আজকালকার ছেলে-মেয়েরা যে বেজায় সেয়না হয়ে উঠেছে! তারা জানে ছেলেপুলে হলেই ঝামেলা—আজ হাঁচি, কাল কাশি, পরশু জ্বর।"

চাটুজ্যেগিন্নি বললো, "আমার বিয়ের প্রথম তিন বছরে তো কোলে-পিঠে-কাঁখে তিনটি !"

তাকে বাধা দিয়ে সরলার শাশুড়ি বললো, "তোমার কথা আর বোলো না দিদি। বছরে যে দুটি করে বাচ্চা-কাচ্চা হয়নি এই তোমার ভাগ্যি।"

মৈত্রগিন্নি বললো, "এমনিতে চাটুজ্জেমশাইকে দেখলে তো বোঝবার জো নেই। এতো ভালোমানুষ, যেন ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানেন না।"

সবাই হো-হো করে হেসে উঠলো। সেনগিন্নি বললো, "এ তোমাদের ভারি অন্যায় বাপু। সবই ভগবানের হাত।"

আবার সবাই হাসলো।

সেখান থেকে বামুনদিদি গেলো বিরাজবাবুর বাড়ি। বিরাজবাবুর মেয়ে বললো, "আমার কাসুন্দির আচার কোথায় বামুনদি ?"

তার ছোটো ভাই টলতে-টলতে এসে বললো, "মুলকি," অর্থাৎ মুড়কি। ছেলেটিকে কোলে তুলে আদর করে বামুনদিদি মুড়কি দিলো, মেয়েকে দিলো কাসুন্দির আচার। বিরাজবাবুর স্ত্রী ছেঁড়া কাপড় দিয়ে বাসন কিনছিলো। একটা ছেঁড়া মশারি, তিনটে শাড়ি আর একটা ধুতির বদলে এক জোড়া কাঁসার কাঁকরাকাটা বাটি সে পছন্দ করেছিলো। বাসন দেখলে বিরাজবাবুর স্ত্রী কিছুতেই লোভ সামলাতে পারে না। বামুনদিদি তাকে খুব বকলো। বললো, "ফের মা তুমি ছেঁড়া কাপড়গুলো আক্কুটের মতো নষ্ট করছো ? আজ-বাদে-কাল মেয়ের জন্যে যখন লাগবে তখন কোথা থেকে জোগাড় করবে ?"

বাসনউলির দিকে চেয়ে করুণভাবে বিরাজবাবুর স্ত্রী বললো, "তা সত্যি, তবে আর কি করে কিনি ! খুকির ছেলেপুলে হলে আসিস।" বাটিগুলো ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখে একটা দীর্ঘনিশ্বেস চেপে ফিরিয়ে দিলো। বাসনউলি চোখে বিদ্যুৎ এনে বামুনদিদির দিকে চেয়ে ঝুড়িটা মাথায় তুললো।

"তুমি ভেবো না মা," বামুনদিদি বললো, "কাল চেৎলার হাট থেকে তোমার জন্যে ও-রকম দুটো বাটি কিনে আনবো। দেড় টাকার বেশি নেবে না। টাকা দিলেই বাসন পাবে, কিন্তু টাকা দিয়ে তো আর ছেঁড়া কাপড় পাবে না।"

দেখতে-দেখতে প্রায় বছর ঘুরলো। বিরাজবাবুর একটি নাতি

হয়েছে, ফুটফুটে সুন্দর। সরলার জন্যেও বামুনদিদি কাঁথা বুনতে লেগেছে, কাসুন্দি আর কুলের আচারও সরবরাহ করছে নিয়মমতো। কলকাতায় সত্যিসত্যি বোমাও পড়লো একদিন। তারপর দেখতে-দেখতে সহরের চেহারা দ্রুত বদলে যেতে লাগলো। প্রায় সর্বদাই মাথার উপর উড়োজাহাজ গোঁ-গোঁ করে বেড়ায়, চালের দর হু-হু করে উঠতে থাকে, কাপড়ও ছোঁয়া যায় না, এতো দাম।

বামুনদিদিকে সবাই জিগগেস করে, "সত্যি বল না দিদি, শ্রাবণ মাসে কি প্রলয় হবে আর তারপর থেকেই সত্য যুগ সুরু ?"

"কী করে বলবো মা ?" বামুনদিদি বলে, "সবই তো মা-কালীর ইচ্ছে। তবে খাবার-দাবারের যা দাম উঠছে তাতে আমরা যে সত্যযুগ পর্যন্ত টেঁকে থাকবো এমন ভরসা তো হয় না। চালের দোকানের সামনে দেখছি তো মা মানুষগুলো রাতদিন লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। রাত দিন। মাথার ওপর দিয়ে ঝড়-বৃষ্টি যাচ্ছে, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে জন্তুর মতো ভিজছে। সেখানেই তারা থাকে, রাঁধে, ঘুমোয়, সেখানেই তারা মরে। লোকগুলোর চেহারা যেন দিনকের দিন বদলে যাচ্ছে, শুকিয়ে যাচ্ছে যেন। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কথা, মা, আমরা শুনেইছি। এইবার চোখে দেখছি। সব মরবে, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে মরে যাবে। খেতে পাবে না, পরতে পাবে না।—এই সব দেখেই মা মনে হয় : এতো পাপ কি আর সহ্য হবে ? সত্যযুগ আসবে কিনা জানি না, তবে কলির শেষ হোলো বলে মনে হয়।"

রাস্তা দিয়ে বামুনদিদি হাঁটে। তার সিল্কের চাদরটা পোকায় কেটেছে, কাপড়ে তালি। বোধ হয় আরো একটু রোগা হয়ে গেছে। কিন্তু রঙটা যেন আরও উজ্জ্বল। মাঝে-মাঝে চালের দোকানের সামনে দাঁড়ায়। কঙ্কালের মিছিল যেন। মনে-মনে কি যেন ভাবে, কাকে যেন খোঁজে। তারপর দ্রুত পা চালায় বাড়ির দিকে। লোকেদের যা অবস্থা!

সবাই এখন হাত গুটিয়েছে, অনাগত বিভীষিকার জন্যে তারা সঞ্চয় করে রাখছে। বামুনদিদি মুখ ফুটে কারুর কাছে চায় না। যে যা দেয় তাইতেই কোনো রকমে একবেলা খায়।

অলকা শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরে এসেছে। কিন্তু সুস্থ শরীরে আসেনি। ওই ফুটফুটে মেয়েটা যেন বিছানার সঙ্গে প্রায় মিলিয়ে গেছে। শুধু তার বড়বড় চোখগুলো আরো বড় হয়েছে, আর ফরসা রঙ আরো হয়েছে শাদা। পেটে তার অসহ্য যন্ত্রণা। নানা ডাক্তার দেখছে। বামুনদিদি তাকে দেখতে যেতেই অলকার মা তো আড়ালে হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলো। তাকে বললো, "বামুনদিদি, মেয়েটা বোধ হয় আর বাঁচবে না। ডাক্তার বলছে পেট কাটতে। কাটলে কি আর ও বাঁচবে?"

তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বামুনদিদি অলকার কাছে বসলো। মাঝে-মাঝে মেয়েটা ভালো থাকে। কিন্তু যন্ত্রণা একবার আরম্ভ হলে কিছুতেই কমানো যায় না। নানা গল্প করলো। বললো, "শিগগীর সেরে ওঠো দিদি। তোমার জন্যে কুলের আর লঙ্কার আচার করে রেখেছি। সেরে উঠলেই দেবো।" আড়ালে তার মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, "কিছু ভেবো না মা, দেখো ও ভালো হয়ে উঠবে।"

বাড়ি থেকে বেরিয়ে মনটা তার সত্যিই খারাপ হয়ে গেলো। মেয়েটাকে সে বড্ড ভালোবাসতো, যা চেহারা হয়েছে তাতে সেরে উঠবে বলে তো মনে হয় না!

আকাশ কালো করে বৃষ্টি নেমেছে। আর সেই সঙ্গে দারুণ ঝড়। ক্রমাগত দিন পাঁচ-ছয় ধরে সূর্যের দেখা নেই। ভিজে কাপড়েই অর্ধেক সময় থাকতে হয়। বেরুতে গেলেই হয় ভিজতে। ছাতা তার নেই।

সেদিন অনেক রাতে বৃষ্টি থামলো। বামুনদিদি ঘুমুচ্ছিলো। হঠাৎ দরজার কড়া নাড়ার শব্দে ঘুম ভেঙে গেলো। খুব গভীর ঘুম তার নয়। ধড়মড় করে উঠে বসে আবার সে শব্দ শুনলো। থান কাপড়টা ভালো করে পরে রেড়ির তেলের আলোটা জ্বালিয়ে একটু ব্যস্ত হয়েই বামুনদিদি জিগগেস করলো, "কে রে?"

সময়ে-অসময়ে তার ডাক আসে। তাই বিশেষ আশ্চর্য বা উত্তেজিত সে হয়নি। হয় কোনো মেয়ের প্রসব-বেদনা উঠেছে, নয় তো কেউ খুব অসুস্থ। উত্তরের অপেক্ষা না রেখেই বামুনদিদি দরজা খুললো। আর একটু হলে সে আর্তনাদ করে উঠেছিলো!

বাইরে আশ্চর্য দৃশ্য। সমস্ত মেঘ সরে গেছে। আকাশটা অতিরিক্ত পরিষ্কার। প্রায় পরিপূর্ণ একটি চাঁদ তীব্র দীপ্তিতে জ্বলছে, তারাগুলো ফিকে হয়ে ঝলমল করছে। পিচের ভিজে পথ যেন রূপো দিয়ে বাঁধানো।

কিন্তু প্রকৃতির পরিবর্তন দেখে বামুনদিদি চমকে ওঠেনি। সে চমকে উঠেছিলো একটি মানুষের মূর্তি দেখে। দরজার সামনে উবু হয়ে বসে একটা লোক, এক-মাথা জটা, এক-মুখ অপরিষ্কার দাড়ি, পিঠে ঝোলা, খালি গা, পরনে কোপনির মতো কাপড় জড়ানো, হাতে বাঁকাচোরা লাঠি আর চটাওঠা এনামেলের বাটি। শুধু চোখের ফিকে-সবুজ তারাগুলো চাঁদের আলোয় জ্বলজ্বল করছে।

বোধ হয় ঘুম থেকে উঠেছিলো বলেই বামুনদিদি প্রথমে ভালো করে চিনতে পারেনি।

দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় বললো, "তুই কে? তুই কে?"

লোকটার গলার স্বর ভাঙা। এইবারে সে উঠে দাঁড়ালো। সমস্ত শরীরে হাড় জিরজির করছে। কত বয়েস বলা শক্ত। সে যুবকও নয়, প্রৌঢ়ও নয়। "আমি, আমাকে চিনতে পারছো না?" লোকটার গলা স্পষ্ট এবার কান্নায় ভেঙে গেলো।

বামুনদিদির হাত-পা থরথর করে কাঁপছে। "তুই এলি কেন? তোকে না আসতে বারণ করেছিলুম! ভিক্ষে করে বেড়াতিস, সেই তো ভালো ছিলি! আমার এখানে তোর থাকা হবে না জানিস, তোকে খাওয়াতে পরাতে পারবো না জনিস, তবু আমার এখানে কেন এলি? আমার জীবনের শনি তুই, রাহু···রাহুর মতো আমাকে গ্রাস না করে ছাড়বি না?"

"কী করবো মা..."

"চুপ কর্।"

কিন্তু চুপ না করেই লোকটা বলে চললো, "···আজ ছ-দিন ভিক্ষে পাইনি। খেতে পাইনি। গ্রামে শুনলুম কলকাতায় চাল বিলি হচ্ছে। তাই হাঁটতে-হাঁটতে এখানে এসেছি। আজ ছ-দিন ধরে আঁস্তাকুড়ের এঁটো-কাঁটা খেয়ে আছি। আর তো পারছি না, তাই তোমার কাছে এলুম। খেতে দাও।"

"আমাকে খেলে যদি তোর পেট ভরে তো আমাকেই খা!" বলতে-বলতে বামুনদিদির চোখ জলে ঝাপসা হয়ে এলো। তাকে এ-পর্যন্ত কেউ কাঁদতে দেখেনি।

বামুনদিদি অলকার হাত গুণে বলে গেছে তার উপরে রাহুর দৃষ্টি পড়েছে। এই রাহুকে খুসি করতে পারলেই সে সেরে উঠবে। বলে গেছে দুপুর বেলায় পিছনের গেটটা খোলা রাখতে। একটা লোক সোজা এসে উঠোনে বসবে। কোনো দিকে সে চাইবে না, কোনো কথা সে বলবে না। তাকেও যেন কোনো কথা কেউ জিগগেস না করে। লোকটা আর কেউ নয়, স্বয়ং রাহু। অলকার মা যেন অনেক রান্নাবাড়া করে রাখে। লোকটা এলেই তাকে যেন বড় কলাপাতায় খেতে দেয়, যতক্ষণ না লোকটা থামে ততক্ষণ যেন খাবার দেওয়া হয়। তার পেট ভরলে নিজে থেকেই উঠে যাবে। আর সেই যে সে যাবে, অলকার উপর রাহুর দৃষ্টিও যাবে ঘুচে। সে ভালো হয়ে উঠবে।

সমস্ত সকাল ধরে অলকার মা নিজে রান্নাবাড়া করেছে। গোটা একটা ইলিশ মাছ নানাভাবে রেঁধেছে, ভাত-তরকারি-ডালও পর্যাপ্ত-পরিমাণে আছে, তা ছাড়া মিষ্টি-দই-রাবড়িও আনানো হয়েছে। বাড়ির চাকর-বাকরদের মধ্যে চাপা একটা উত্তেজনা, ছোটো-ছোটো ছেলে-মেয়েদেরও বুক ধ্বক্-ধ্বক্ করছে। পাড়ার কয়েকজন মেয়ে খবর শুনে রাহুকে দেখতে জমা হয়েছে। বামুনদিদি কখনো মিথ্যে বলে না।

দুপুরবেলায় উঠোনে জোড়া কলাপাতা পেতে সব রকম খাবার অলকার মা নিজেই সাজিয়ে দিলো। বামুনদিদি এলো খানিকপরে। তবে তার সেই সদাপ্রফুল্ল মুখে যেন কালি পড়েছে। ছেঁড়া সিল্কের চাদরটা জড়িয়ে দোতালার বারান্দায় চিকের আড়ালে অন্য মেয়েদের পাশে সে চুপ করে বসলো। রাহুর সামনে কেউ বেরুতে রাজি নয়, পাছে তার অশুভ দৃষ্টি নিজেদের উপর পড়ে।

ফিসফিস করে সবাই কথা বলছিলো। গেটটা হঠাৎ খুলে যেতে মুহূর্তের মধ্যে সবাই চুপ করলো। আর কি আশ্চর্য, দেখা গেলো সত্যিই

রাহু

একটা লোক—এক-মাথা জটা, একমুখ দাড়ি, রোদে-পোড়া-তামাটে রঙ, হাতে এক লাঠি, পরনে কোপনি—মাথা নীচু করে এলো আর খাবারের সামনে বসে কোনো দিকে না চেয়ে খেতে আরম্ভ করলো। অলকার ছোটো ভাই ফিসফিস করে বললো, "দেখছো মা, চিড়িয়াখানার বাঘের মতো রাহু খাচ্ছে।"

তার মা তাড়া দিয়ে বললো, "চুপ কর্। রাহুকে ও-কথা বলতে নেই।"

কিন্তু কথাটা সে মিথ্যে বলেনি। একটা ক্ষুধার্ত জানোয়ারের মতো শব্দ করে সে খাচ্ছিলো। আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় রাহু খাওয়া শেষ করলো। চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না যে, কম করে তিনজন লোকের খাবার একটা মানুষ কখনো খেতে পারে। তবে রাহু তো আর মানুষ নয়। সেইজন্যেই বোধ হয় মেয়েরা বিশেষ আশ্চর্য হোলো না।

পাশের ঘটি থেকে ঢক্-ঢক্ করে খানিকটা জল খেয়ে রাহু মাথা নীচু করে যেমন এসেছিলো তেমনি বেরিয়ে গেলো। তবে যাবার সময় তার পা-দুটো যেন সামান্য কাঁপছিলো।

সবে তখন সন্ধে হব-হব। কলেজ স্ট্রীটের এক জায়গায় লোকের ভিড়। একটা ভিখিরি বমি করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে। তার চারদিকে ময়লা আর অসম্ভব দুর্গন্ধ। ভিড়ের মধ্যে একজন ডাক্তার ছিলেন। নাড়ি দেখে বললেন, "এখনো আছে, তবে বেশিক্ষণ থাকবে না।...আপনারা সরে দাঁড়ান; মনে হচ্ছে কলেরা।"

কে একজন এম্বুলেন্সের জন্যে ফোন করেছিলো। ঘণ্টা তিনেক

পরে যখন এম্বুলেন্স এলো, তার অনেক আগেই লোকটা মরে গেছে। কাছাকাছি মানুষ বড় একটা নেই। শুধু মাছি ভনভন করছে।

সে রাত্রে আবার আকাশ কালো করে বৃষ্টি নামলো। বাঙলা দেশে দুর্ভিক্ষ তো দেখা দিয়েইছে, এবারে বন্যা এলো। গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে যাচ্ছে। মাটির বাড়ি ধ্বসে পড়ছে, গরু-বাছুর ভেসে যাচ্ছে, মানুষ গাছে উঠে বাঁচবার চেষ্টা করছে। কচি ধানের চারা সব নষ্ট হোলো। চাষীরা তাদের ক্ষুধার্ত চোখ তুলে আকাশের দিকে চাইছে, যেন বোবা হয়ে গেছে।

আর কালিঘাটের এক খোলার ঘরে টিমটিমে রেড়ির তেলের আলোয় বামুনদিদি একা জেগে বসে আছে। অনেক রাত হোলো। তবু চোখে ঘুম নেই। এই বুঝি তার দরজার কড়া ঝনঝন করে বেজে উঠলো। তার অতীত জীবন ফুঁড়ে রাহু বেরিয়ে এসেছে। কখনো বেদনায়, কখনো আনন্দে—হ্যাঁ আনন্দে—তার গায়ে যেন রোমাঞ্চ হচ্ছে।

সমস্ত রাত সে জেগে কাটালো: এই বুঝি কড়া বাজে, এই বুঝি কড়া বাজে!

দস্যু

মাঘের শেষে এই গ্রামে প্রতি বছরেই বিরাট মেলা বসে।

গ্রামটি ছোটো, পাশ দিয়ে ছোটো একটি নদী বেঁকে পশ্চিম দিকে গিয়েছে। মাঝেমাঝে পাড়ের কাছে অনেকটা করে বালি দেখা যায়, হাড়ের মতো আশ্চর্য শাদা বালি। সূর্যের আলোয় চোখে ধাঁধাঁ লাগায়, জ্যোৎস্নায় অপরূপ হয়ে ওঠে। মাঘীপূর্ণিমার দিন এই মেলা।

স্রোত ঠেলে ঘণ্টা তিনেক উজানে যাবার পর ইস্টিশানের কাছে যাওয়া যায়। স্রোত বেশি থাকলে আরো এক ঘণ্টা বেশি লাগে। তবে বছরে দু-তিন মাস ছাড়া স্রোতের জোর থাকে না, মাঝেমাঝে মনেই হয় না স্রোত আছে বলে। বছরের অধিকাংশ দিনই মরা সাপের মতো সূর্যের আলোয় বাঁকা নদীটি পড়ে থাকে। মাঝেমাঝে আশ্চর্য ফুল ফোটে তার দেহে, গোলাপী আর সবুজ আর হলদে রঙ জড়ানো। কেউ তার নাম জানে না, খুশিমত নাম দেয় তারা: নোলোক ফুল, বিশ্বনাথের জটা, আরো নানা নাম। বিকেলে গা ধুতে এসে কমবয়সী মেয়েরা, যাদের বিয়ে হয়ে গেছে কিংবা হয়নি, যাদের স্বামী গ্রামে আছে কিংবা নেই, ওই ফুল নেবার জন্যে পাগল হয়ে ওঠে। পাড়ের কাছে বড় একটা ফুল দেখা যায় না, ফুটতে না ফুটতেই মেয়েরা কখন যে তুলে নেয় বোঝা যায় না। মাঝ-নদীতে এই ফুলেরা ফোটে। সমস্ত মাঘ মাস ধরে ফোটে: রাশি-রাশি ফুল, গোলাপী আর সবুজ আর হলদে রঙ জড়ানো। কমবয়সী মেয়েরা ভিজে আঁচল এঁটে জড়িয়ে নেয় তাদের সরু কোমরে। তারপর পাড়ে কোনো পুরুষ আছে কিনা আড়চোখে দেখে নিয়ে জল ছিটিয়ে নদীর

শুদ্ধ স্রোতকে চুরমার করে সেই ফুলের কাছে পৌঁছয় আর হুড়োহুড়ি করে যে যেটা পারে ছিঁড়ে আনে। তারপর ভিজে কাপড়ে কলসিতে জল ভরে, ভিজে চুলের এলো খোঁপায় ফুলগুলো গুঁজে হাড়ের মতো শাদা বালিতে ফোঁটা-ফোঁটা জল আর পায়ের দাগ এঁকে বাড়ি ফিরে আসে।

বছরের মধ্যে এই মাঘী পূর্ণিমার মেলাই এখানের শ্রেষ্ঠ উৎসব। কোন বছর থেকে যে এখানে প্রথম মেলা বসতে আরম্ভ হয়েছে কেউ-ই সঠিক-ভাবে তা বলতে পারে না। গ্রামের মধ্যে চোখে ছানি-পড়া যে সমস্ত নড়বড়ে লোক এখনো বেঁচে আছে তারাও বলে ছেলেবেলায় এখানকার মেলা থেকে তিলের নাড়ু কিনে খেয়েছে। কেনই বা যে এই মেলা এই গ্রামে বসে তার উত্তরও কেউ জানে না। আসলে এই প্রশ্নটাই এখানকার কাউকে স্পর্শ করেনি।

এই গ্রামের মধ্যে আর চারপাশে অসংখ্য ছোটো-বড় মন্দির আছে: মহাদেবের মন্দির। প্রবাদ, বিশ্বকর্মা স্বয়ং এক রাতের মধ্যে এখানে একশো-আটটি শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন হাজার-হাজার বছর আগে এক মাঘী পূর্ণিমার রাত্রে। কিন্তু বিশ্বকর্মার এই খামখেয়ালী সৃষ্টির কোনো সন্তোষজনক উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে এখানে এককালে যে অসংখ্য নতুন মন্দির সৃষ্টি হয়েছিলো তার প্রমাণ এখনো পাওয়া যায় মন্দিরের ভগ্নস্তূপ দেখে। অধিকাংশ মন্দিরেই শিবলিঙ্গ নেই, যেগুলিতে আছে তার কোনোটিতেই বড়-একটা কেউ যায় না। না-যাবার কারণ ভয় —মহাদেবের ভয় নয়, সাপ আর জন্তু-জানোয়ারের। অধিকাংশ মন্দিরকেই গ্রাস করছে ফণিমনসা আর নানা আগাছার জঙ্গল। যে মন্দিরটি গ্রামের শেষ বাড়ি থেকে মাত্র ত্রিশ হাত দূরে কয়েক বছর আগে ডোম-পাড়ার কয়েকটা ছোকরা বেতফল তুলতে গিয়ে সেখান থেকে পাঁচটা চিতা'র বাচ্ছা বার করেছিলো। গ্রামের প্রাচীন লোকেরা বলাবলি করে কলিকালে দেবতা মন্দির ছেড়ে চলে গিয়েছেন। ফলে মন্দিরগুলো

জন্তু-জানোয়ারের আঁতুড়ঘরে পরিণত হয়েছে। এই সমস্ত জীর্ণ মন্দিরের ভগ্নস্তূপের মধ্যে প্রতিবারেই বাঘের বাচ্চা না পাওয়া যাক নেড়ি কুত্তা আর খ্যাঁকশেয়ালের বাচ্ছা একটু খোঁজ করলেই পাওয়া যায়। শুধু যে জন্তু-জানোয়ারের বাচ্ছাই পাওয়া যায় তাই নয়, মানুষের বাচ্ছাও দেখা গিয়েছিলো একবার।

শুধু দুটি মন্দিরে এখনো পূজো হয়। শহরের এক ধনী ভদ্রলোক প্রতি মাসে পাঁচ টাকা করে হরিহর পণ্ডিতকে পাঠান, হরিহরই পুরোহিত। মন্দিরের মধ্যে বিশেষ উপলক্ষ্য ছাড়া প্রদীপ জ্বালানো হয় না। দর্শন করতে ভিতরে এসে আন্দাজে শিবলিঙ্গ স্পর্শ করে লোকে যায়। ভিতরে অসংখ্য চামচিকে আর ছুঁচোর বসবাস। চামচিকের সোঁদা গন্ধে ভিতরের রুদ্ধ বাতাস বিষিয়ে উঠেছে। সন্ধেয় সাপের ভয়ে হরিহর পণ্ডিতও মন্দিরের ভিতরে ঢোকে না। মন্দিরের বাইরে উঁচু বাঁধানো বারান্দায় পাড়ার বুড়োরা জমা হয়ে তাস-পাশা খেলে, তামাক টানে, গল্পগুজোব আর পরনিন্দা-পরচর্চা করে।

মাঘ শেষ হতে চললো, কিন্তু শীত এখনো কমেনি। যাবার আগে শেষ কামড় বসিয়ে যাবে। ফাল্গুনের মাঝামাঝি উত্তরে হাওয়া দিক বদল করে।

মেলার কিছুদিন আগে থেকেই অস্বাভাবিক উত্তেজনায় সমস্ত গ্রাম বিকারগ্রস্ত রোগীর মতো হঠাৎ উঠে বসে। তারা কি যে আশা করে তার কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। তবে কিছু যে একটা হবে, যা আগে কখনো হয়নি, এই ধরণের একটা ধোঁয়াটে আশা তাদের মনের মধ্যে পাকিয়ে ওঠে।

গ্রামের পূবদিকের বিরাট মাঠে ইতিমধ্যেই ছেঁড়া তাঁবু আর ছোটো-ছোটো ছাউনি পড়তে আরম্ভ করেছে। মেলায় যারা দোকান দেবে কিছুদিন আগে থেকেই তাদের আসতে হয়। আগে না এলে ভালো

জায়গা পাওয়া যাবে কেন? নদীর দু-পাশেও অনেক নৌকো জমতে শুরু করেছে: ছোটো আর বড়, নতুন আর পুরোনো, নানা ধরণের নানা মাপের নৌকো।

মেলা এক দিনই। কিন্তু অনেক দিন আগে থেকেই নানা তোড়জোড় চলে, মেলা শেষ হবার পরেও অনেক দিন যায় গুটিয়ে নিতে।

হাজার ধরণের অপরিচিত লোকের ভিড় হয় এই মেলায়। গ্রামের লোকেরা তাই আগে থেকেই সাবধান হয়। রাত্রে দরজা ভালো করে বন্ধ রাখে, উঠোনে এঁঠো বাসন ফেলে রাখে না। অনেক বছর আগে একবার মেলার পর গ্রামের দুটি মেয়ে চুরি গিয়েছিলো। কেউ বলে তারা সুবিধেমতো লোকের সঙ্গে ইচ্ছে করেই পালিয়েছিলো। কিন্তু পালাক কিংবা চুরিই যাক, প্রতিবারেই মেলার আগে থেকে গ্রামের লোকেরা তাদের যুবতী ও কুমারী মেয়ে-বৌদের সাবধানে সাবধানে রাখে। নদীতে স্নান করা, গা ধোয়া মেয়েদের এক রকম বন্ধই হয়ে যায়। তা ছাড়া ওইটুকু তো নদী, এতো নৌকোর ভিড়ে তারা স্নান করবেই বা কোথায়? অবস্থাটা খুবই অসুবিধের সন্দেহ নেই, বিশেষ করে তাদের পক্ষে যাদের বাড়ির কাছে পুকুর নেই। তাই এইবার গ্রামের লোকেরা পরামর্শ করে নদীর একটা ঘাট চাঁচের বেড়া দিয়ে অস্থায়ীভাবে ঘিরে দিয়েছে।

গ্রামের পূবদিকের মাঠে অনেক দোকান বসেছে: তেলেভাজা, মিষ্টি, চা, চপ-কাটলেট, জামা-কাপড়, কাঠের আর টিনের খেলনা—এ সমস্ত তো আছেই তা ছাড়া তাঁবু পড়েছে চারটে আর সেগুলোই উত্তেজনার জিনিস এখানকার লোকের কাছে। সবচেয়ে বড় তাঁবুটা মাঠের

মাঝখানে, প্রতিবারেই এখানটায় যাত্রা হয়। এবারেও হবে, তবে যাত্রা নয়: থিয়েটার। শহর থেকে এই থিয়েটার-পার্টি এসেছে। এবারে আর সীতার-বনবাস বা ভীষ্মের-শরশয্যা নয়। এবারে আনকোরা থিয়েটার: শরৎ চাটুজ্জের বই 'গৃহদাহ'। দস্তুরমতো স্টেজ, দস্তুর-মতো স্ক্রীন, জোরালো ডে-লাইট। গ্রামের তেল চুকচুকে টেরিকাটা বিড়িফোঁকা সন্ধেয়-নদীর-তীরে-বাঁশি-বাজানো ছোকরারা অতিমাত্রায় উৎসাহী হয়ে উঠেছে এই ব্যাপারে। তাদের মধ্যে কে আবার খবর এনেছে গোঁফকামানো কিংবা গোঁফদাড়ি-না-ওঠা ছেলেরা মেয়ের পার্ট করবে না, তাদের দলে নাকি আসল মেয়ে আছে! আসল মেয়ে! উর্বশীর মতো দেখতে, মেমেদের মতো ফর্সা। দলের মধ্যে গুজোব উঠেছে সেই মেয়েরা নাকি নিজেদের রূপের জোরে বিলেত পর্যন্ত ঘুরে এসেছে। অদ্ভুত নাকি নাচতে পারে, আর গান! তাদের গান শুনলে নাকি স্থির থাকা যায় না।

যে-সব বুড়ো-আধবুড়ো লোকেরা প্রতি সন্ধেয় মন্দিরের পাথরে-বাঁধানো বারান্দায় বসে তামাক টানে আর তাস-দাবা খেলে এই ব্যাপারে সবাই তারা চটেছে। আজকাল সেখানে খেলা হয় না, পৃথিবীটা যে দ্রুত উচ্ছন্নের পথে যাচ্ছে এই নিয়েই আলোচনা চলে। তারা ঠিক করছে থিয়েটারে কেউ যাবে না, তাদের গ্রামের কেউ যাতে না যায় সে জন্যেও বাড়ি-বাড়ি গিয়ে অনুরোধ জানাবে। আর বলবে মাঠের পশ্চিম দিকে পলাশডাঙার যে যাত্রাদল এসেছে সেখানেই যেন লোকে যায়। তাছাড়া থিয়েটারে মাথা পিছু দু-আনা থেকে পাঁচ আনা পর্যন্ত টিকিট, কিন্তু পলাশডাঙার যাত্রাদলে মাথা পিছু দু-পয়সা। এটাও তো ভাববার কথা।

কিন্তু ভিতরে-ভিতরে বুড়োর দলেরও কৌতূহলের সীমা নেই। তারা ভাবছে অন্ধকারে এক কোণে মুড়িসুড়ি দিয়ে বসলেও কি অন্ত

লোকে চিনতে পারবে? ভিড় তো আর নিজেদের গ্রামের নয়। কোনো রকমে ভিড়ে মিশে দেখবার উপায় থাকলে নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে অনেকে যে দেখবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

মাঠের দক্ষিণ দিকে পাশাপাশি ছোটো-ছোটো তিনটে তাঁবু। এরই দুটো তাঁবুর মাঝে যে সামান্য একটু ফাঁক আছে সেখান দিয়ে ধূ-ধূ ফাঁকা মাঠ আর সরু মেঠো পথ চোখে পড়ে। গরুর গাড়ির সেই সরু পথ যেখানে বেঁকেছে তার সামনেই একটা পলাশ গাছ। প্রকৃতির এক আশ্চর্য খেয়ালে হঠাৎ সেখানে রাশি-রাশি লাল পলাশ ফুটেছে। দুটো তাঁবুর ফাঁক দিয়ে হঠাৎ দেখলে চোখে ধাঁধাঁ লাগে, মনে হয় গাছটায় আগুন লাগলো বুঝি! পৃথিবীতে এ বছরে এই পলাশ গাছেই বোধ হয় প্রথম ফুল ফুটলো প্রগল্‌ভ মেয়ের মতো: খাপছাড়া লাগে, প্রগলভতা দৃষ্টিকটুও লাগে, কিন্তু সেই সঙ্গে সমস্ত শরীর সিরসির করে ওঠে! অন্য তাঁবুটার পিছনেই অনেক দিনের পুরানো তেঁতুল গাছ। কী বিরাট তার শরীর, বিশেষত তার গুঁড়িটা: হাজার ফাটা দাগ, শুকনো ছাল উঠছে, দেখলে মনে হয় কোনো স্থূল বৃদ্ধের দেহ। কিন্তু আশ্চর্য তার পাতাগুলো: সিল্কের মতো মসৃণ, ফিকে নরম সবুজ। সব সময় ঝলমল করছে। এই স্থূল বৃদ্ধ গুঁড়ির সঙ্গে যৌবনের হঠাৎ খুসির মতো পাতাগুলো কেমন যেন খাপছাড়া লাগে বৃদ্ধের মুখে শিশুর স্বচ্ছ হাসির মতো।

এই তিনটে তাঁবুর মধ্যে সবচেয়ে বাঁ-দিকের যেটি সেটায় ফটো তোলা হয়। কুড়ি মিনিটের মধ্যে ছবি তুলে দেবে, খরচ আট আনা। অনেক লোকে ছবি তুলিয়েছে, ভিজে পোস্টকার্ডের উপর নিজেদের ছবি দেখে অতিমাত্রায় খুসি হয়ে উঠেছে। অধিকাংশ লোকেরই আজ জীবনে প্রথম ছবি তোলা হোলো আর সম্ভবত এই শেষ। জীবনে একাধিকবার ছবিতোলা হয়েছে এমন সৌভাগ্যবান লোক এ-গ্রামে খুব কমই আছে।

দ্বিতীয় তাঁবুটাও কম আশ্চর্য নয়। তাঁবুর সামনে কাঠের প্যাকিং বাক্স পাশাপাশি রেখে উঁচু একটা মঞ্চ তৈরি হয়েছে। তার উপর একটা লোক দাঁড়িয়ে মাঝেমাঝে চীৎকার করছে: "দেখে যান বাবু দেখে যান। দু-দু আনা বাবু, এমন মেয়ে কখনো দেখেননি। হিমালয় থেকে পাওয়া গিয়েছে, বাঘের গর্তের মধ্যে ছিলো। কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত ষোল বছরের মেয়ে, কোমর থেকে পা পর্যন্ত তিন বছরের খুকি। দেখে যান বাবু, দেখে যান। দু-দু আনা, বাবু, দু-দু আনা···।" লোকটার জামাকাপড় অদ্ভুত: ছেঁড়া পেন্টুলুন, তালিমারা কোট, এক গালে শাদা রঙ, অন্য গালে কালো রঙ, মাথায় সোলার একটা টুপি, খড়ি মাখিয়ে শাদা করা হয়েছে। লোকটা বক্তৃতা বন্ধ করে মাঝেমাঝে সেখানে দাঁড়িয়েই নানা ম্যাজিক দেখাচ্ছে: কখনো মুখ দিয়ে অসংখ্য কাগজের ফালি টেনে-টেনে বার করছে, কখনো জ্বলন্ত মশাল মুখের মধ্যে পুরে নিভিয়ে ফেলছে। যখন ভিড় বাড়ছে তখনই ম্যাজিক বন্ধ করে বাঁ হাতে বড় একটা ঘণ্টা ঢং-ঢং করতে-করতে সে চীৎকার করছে: "চলে আসুন বাবু···দু-আনা, দু-দু আনা···।" সেই তাঁবুর দরজার উপর একটা ছবি-আঁকা পর্দা ঝোলানো। ছবিতে বীভৎস একটি মেয়ের চেহারা—দেহের ঊর্দ্ধাংশ যুবতীর মতো, নিম্নাংশ শিশুর মতো। এ-রকম কোনো অদ্ভুত জিনিস এর আগে এখানকার মেলায় কখনো আসেনি। তাই মেলার লোকেরা এখানেও কম ভিড় করছে না। যারা ভিতর থেকে দেখে বেরিয়ে আসছে দশজন লোক তাদের ঘিরে জিগগেস করছে, "কী রকম দেখলেন মশাই?"

একটি যুবক, খুব সে কথা বলতে পারে, ইংরিজি কথাও একটা-দুটো জানে, বললো, "ওয়াণ্ডারফুল মশাই, ওয়াণ্ডারফুল। দেখে আসুন। দেখবার জিনিস বটে।"

আর এক ছোকরা হঠাৎ সেই তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে আগের

যুবকটিকে বললো, "কী রে, দেখেছিস ?"

"দেখিনি আবার ? আমিই তো আগে দেখলুম।"

"মানে সব দেখেছিস ?"

"সব মানে ?"

কানের কাছে মুখ এনে ছোকরা চোখের একটা ভঙ্গী করে বললো, "সব মানে সব। চার আনা দিলেই মেয়েটার গায়ের জামাকাপড় খুলে দেখাচ্ছে।…"

রুদ্ধনিশ্বেসে পূর্বোক্ত যুবকটি বললো, "যাঃ, মাইরি বলছিস ?"

"মাইরি বলছি! আর জানিস আট আনা দিলে," মুখটা আরও কাছে এনে প্রায়-শোনা-যায়-না এ রকম গলায় সে বললো, "আট আনা দিলে একবার ছুঁতে দেয়। আমার তো আট আনাই খরচ হয়ে গেলো। রাত্রে থিয়েটার দেখবার পয়সা জোগাড় করবো কী করে তাই ভাবছি।"

ইংরিজি-জানা যুবকটি আর কোনো কথা না বলে ভিতরে ঢুকে গেলো, দ্বিতীয় ছোকরা বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে-করতে বিড়ি ধরালো।

এরপরের তাঁবুটির দরজার উপর বড়-বড় করে লেখা "প্যারাডাইজ রেষ্টুরেণ্ট।" ভিতরে গোটা পাঁচেক কেরোসিন কাঠের টেবিল। প্রত্যেক টেবিলের চারদিকে ছোটো-ছোটো চারটে করে চটাওঠা টিনের চেয়ার। এখানেও ভিড় কম নয়। দেড় পয়সা করে এক পেয়ালা চা, তা ছাড়া বাসি কেক, বিস্কুট আর তেলেভাজা চপ-কাটলেট পাওয়া যায়। গ্রামের সেই সব টেরিকাটা বিড়ি-ফোঁকা তেল-চুকচুকে-মাথা ছেলের ভিড়ই এখানে বেশি। দু-একজন বুড়ো আধবুড়ো লোকও আছে। প্লেটে গরম চা ঢেলে ফুঁ দিয়ে ঠাণ্ডা করতে-করতে তারা চুমুক দিচ্ছে।

দয়া

এই তাঁবুর পাশেই ছোটো একটি চাঁচের চালা। সেই চালঘর ভাড়া নিয়েছে আলখাল্লা পরা একটা লোক। এক মুখ তার কাঁচাপাকা দাড়িগোঁফ, চোখ দুটো সব সময়েই তীক্ষ্ণ আর সজাগ। এ-ঘরে বিশেষ কোনো আসবাব নেই। একটা প্যাকিং বাক্সের উপর লোকটা তার ঝুলিটা রেখেছে।

সেখানেও বেশ ভিড়।

শোনা গেলো লোকটার কাছে পৃথিবীর যাবতীয় অসুখের ওষুধ আছে। অদ্ভুত তার ওষুধ। সব অসুখ সারতে বাধ্য। লোকটা তার মোটা ভারি গলায় প্রায় চীৎকার করেই কথা বলে। তার জামা-কাপড়, গোঁফদাড়ি আর গলা শুনলে বেশ ভয়-ভয় করে, তার কথা অবিশ্বাস করতে সাহস হয় না। দেশি গাছগাছড়া থেকেই সে নাকি অধিকাংশ ওষুধ আবিষ্কার করেছে। বিলেত থেকেও নাকি আনিয়েছে।

ভিড়ের মধ্যে থেকে একটা লোক হঠাৎ কাঁপতে-কাঁপতে ডাক্তারের কাছে উঠে এলো। একটা ছেঁড়া জাপানী কম্বল চাদরের মতো করে সে জড়িয়েছে। গালে আর মাথায় জড়িয়েছে ছেঁড়া কাপড়, অনেকটা ব্যাণ্ডেজের মতো করে বাঁধা। অসহ্য যন্ত্রনায় সমস্ত মুখ মাঝে-মাঝে তার কুঁকড়ে যাচ্ছে।

লোকটা ভাঙা-ভাঙা গলায় কাঁপতে-কাঁপতে ডাক্তারকে যা বললো তার সারমর্ম হচ্ছে এই : তার দাঁতের গোড়া হঠাৎ ফুলে দিন চারেক ধরে এই অবস্থা হয়েছে। অসহ্য যন্ত্রণা। মনে হয় মাথাটাই বুঝি ছিঁড়ে পড়বে। এই চার-দিন চার-রাত্রি সে কিছু খেতে পারেনি, দু-চোখের পাতা এক করতে পারেনি। গ্রামের কবিরাজের ওষুধ সে খাচ্ছে, কিন্তু কমা তো দূরের কথা, ক্রমশ যেন বেড়েই চলেছে তার যন্ত্রণা।

ডাক্তার ঝুলি থেকে একটা টর্চ বার করে গম্ভীরভাবে বললো, "হাঁ কর।"

হাঁ করলো লোকটা অনেক যন্ত্রণা সহ্য করে। ভালো করে পরীক্ষা করলো ডাক্তার। তারপর বললো, "হুঁ…এর ওষুধ এক টাকা।"

"এক টাকা…?" অস্পষ্টভাবে জড়িয়ে-জড়িয়ে লোকটা বললো, "এক টাকা কোথায় পাবো? কবিরাজ মশাইকে তো দু-আনা দিয়েছি ওষুধের জন্যে।"

"তবে কবিরাজের ওষুধই খাও," প্রায় ধমক দিয়ে উঠলো ডাক্তার, "যা অবস্থা দেখছি, আর দু-দিন বড় জোর বাঁচবে আমার ওষুধ না খেলে।…আমি ঠকিয়ে টাকা নোবো না। এই এতো লোক তো রয়েছেন এখানে। এঁদের সামনেই তোমাকে ওষুধ দোবো। তারপর তুমি ওইখানে বসবে। যন্ত্রণা কমলে আর ভালো বোধ করলেই আমাকে টাকা দেবে। যদি দশ মিনিটের মধ্যে না কমে, তাহলে এক পয়সাও চাই না।"

ডাক্তারের কথা শুনে সেখানকার সবাই মাথা নেড়ে বললো, "ঠিক কথা।"

লোকটা দশ মিনিটে সুস্থ হয়ে যাবে ভেবে চঞ্চল হয়ে উঠলো, তারপর তার ফোলা গাল বহুকষ্টে নাড়িয়ে বললো, "কিন্তু এক টাকা আমি পাবো কোথায়? আপনাকে এক টাকা দিলে আমরা খাবো কী? আমার পাঁচটি ছেলেমেয়ে, তা ছাড়া বউ।"

কিন্তু তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে ডাক্তার আবার ধমক দিয়ে উঠলো, "দেখো, আমার কাছে ওষুধ পাবে, কিন্তু দয়া পাবে না। জীবনে কাউকে আমি দয়া করিনি, আমাকেও কেউ দয়া করেনি। দুঃখের কথা বলে লাভ নেই। চিকিৎসাই আমার ব্যবসা, দয়া করা নয়।"

কী ভেবে অসুস্থ লোকটা এগিয়ে এসে বললো, "তা হলে ওষুধ দিন। কিন্তু না কমলে টাকা দোবো না।"

"নিশ্চয়ই। না কমলে টাকা নোবো কা করে? সবাই তো রয়েছেন।"

ডাক্তার তার ঝুলি থেকে কতকগুলো শুকনো পাতা বার করে হাতের চেটোয় রেখে একেবারে ধূলোর মতো গুঁড়িয়ে ফেললো। তারপর আর একটা শিশি থেকে কয়েক ফোঁটা ওষুধ ছোটো কাঁচের গেলাসে ঢেলে একটু জল দিলো। আলোর দিকে তুলে কি খানিক লক্ষ্য করে শেষে গেলাসটা তার হাতে দিয়ে বললো, "খেয়ে ফেলো।" ওষুধটা খাওয়া হলে লোকটাকে হাঁ করিয়ে যে দাঁতে যন্ত্রণা হচ্ছে সেটার উপর শুকনো গুঁড়ো পাতা এক টিপ দিয়ে বললো, "ওই কোণে বস। মুখ দিয়ে এখন একটু জল কাটবে। একটু পরেই ঠিক হয়ে যাবে।"

সেখানে যত লোক জড় হয়েছিলো সবাই অসুস্থ লোকটিকে লক্ষ্য করতে লাগলো। দশ মিনিটও কাটলো না, লোকটা উঠে দাঁড়ালো।

"কী? ভালো লাগছে না?" খসখসে রুক্ষ গলায় ডাক্তার প্রশ্ন করলো।

লোকটা বললো, "কী আশ্চর্য! ব্যথা যে একেবারে নেই। সত্যিই অদ্ভুত ওষুধ আপনার!" সেখানকার লোকেরা এই আশ্চর্য ঘটনায় ভীষণ অবাক হয়ে গেলো। নানা কথা বলতে লাগলো নানা লোকে।

কিন্তু ডাক্তার বললো, "টাকাটা দিয়ে যাও।"

ট্যাঁক থেকে টাকা বার করলো লোকটা। কি একবার বলতে চেষ্টা করলো, তারপর ডাক্তারের চোখের দিকে চেয়ে হঠাৎ ঘাবড়ে গিয়ে চুপ করে গেলো। শুধু নিঃশব্দে দিলো টাকাটা। ডাক্তার আরো কয়েক পুরিয়া ওষুধ দিলো। বললো, "বাড়ি গিয়েই খেয়ে নাও। গরম জিনিস খাবে। তারপর এই ওষুধটা খাবে আর এই

পুরিয়াটা দাঁতের ওপর দেবে। খুব ঘুম হবে। পারো তো সেঁক লাগিও। আর সব সময়ে বেঁধে রেখো।”

নানা লোকের মুখে ঘুরতে-ঘুরতে কথাটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো: মেলায় নাকি আশ্চর্য এক ডাক্তার এসেছে। যে-কোনো অসুখ সে চক্ষের নিমেষে সারিয়ে দিতে পারে। তা ছাড়া অলৌকিক ক্ষমতাও নাকি আছে। সে নাকি অনেক মরা লোককেও বাঁচিয়েছে।

নানা লোক আসতে লাগলো ডাক্তারের কাছে। অধিকাংশ লোকই তাদের অসুস্থ আত্মীয়দের জন্যে ওষুধ নিলো: হাঁপানি আর যক্ষ্মা, ডেঙ্ জ্বর আর কালাজ্বর, এমন কি কুষ্ঠের পর্যন্ত! সবাইকেই ডাক্তার বললো তার ওষুধে দু-তিন দিনেই অসুখ সারবে। কিন্তু টাকা-পয়সা সম্বন্ধে লোকটা অতিমাত্রায় সচেতন। এক পয়সা কাউকে ছাড়লো না।

এক বুড়ি হঠাৎ হাউ-হাউ করে কাঁদতে-কাঁদতে ডাক্তারের প্রায় পা জড়িয়ে ধরলো। বললো, তার একমাত্র ছেলে দিন পঁচিশ জ্বরে পড়ে রয়েছে। গতকাল থেকে কি রকম হাঁপাচ্ছে সব সময়, জ্ঞান নেই, তার জন্যে ওষুধ চাই।

“তিন টাকা,” গম্ভীর মুখে বললো ডাক্তার।

“তিন টাকা?” প্রায় ভেঙে পড়লো বুড়ি। “তিন টাকা?—বাবা দয়া কর, দয়া করে বাবা বিধবার একমাত্র ছেলেকে বাঁচাও; দয়া কর···।”

আবার ধমক দিয়ে উঠলো ডাক্তার। সেই আগেকার কথাগুলোই বললো, “দয়া···? দয়া-টয়া আমার নেই। দয়া আমি কাউকে করি না। আমার ব্যবসা ওষুধ দেওয়া, দয়া করা নয়।”

একেবারে যেন ভেঙে পড়লো বুড়ি, “তবে আমার কী হবে বাবা? আমার ছেলে যে মরে যাবে! তুমি ছাড়া কেউ যে তাকে বাঁচাতে পারবে না!”

মুখের একটা কঠিন ভঙ্গী করে লোকটা বললো, "আমি কী করবো বল? দয়া আমাকে কেউ করেনি, আমিও কাউকে দয়া করি না। তিন টাকা দাও, ওষুধ পাবে, নইলে পাবে না। এই শেষ কথা।"

খানিকটা হাঁ করে বুড়ি অতি ভয়ে-ভয়ে তার কথাগুলো শুনলো। তারপর টলতে-টলতে বেরিয়ে গেলো। ঘণ্টা খানেক পরে আবার ফিরে এলো সে, ডাক্তারের হাতে তিনটে টাকা দিলো। তিনটে টাকা ঝুলিতে রেখে গম্ভীর মুখে তাকে ওষুধ দিলো ডাক্তার। বুড়ির মুখ দেখে মনে হোলো তার শেষ সম্বল বিক্রী করে এই তিনটে টাকার জোগাড় করেছে। কিন্তু সে-সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই কেউ তাকে করলো না। ডাক্তার পাছে চটে সেই ভয়ে বুড়িও কোনো কথা জিগগেস করলো না। নিঃশব্দে ওষুধ নিয়ে কাঁপতে-কাঁপতে চলে গেলো।

বেশ রাত হয়েছে। অধিকাংশ দোকানের আলোই নিভে গেছে। শুধু থিয়েটারের তাঁবুর ডে-লাইটগুলো তখন জ্বলজ্বল করছে, আর মেলা ভেঙে সব লোক জমা হয়েছে সেখানে। দারুণ জমে উঠেছে থিয়েটার। ছেলে-বুড়ো-মেয়ে সবাই সেখানে হাজির। পলাশডাঙার যাত্রা আধঘণ্টা খানেক চলেছিলো। কিন্তু তারপরেই খবর এলো এ-রকম থিয়েটার নাকি এ-গ্রামে কখনো আসেনি: এ-রকম অদ্ভুত জিনিস শোনা যায় না, দেখা যায় না কখনো। দেখতে-দেখতে যাত্রার জায়গা খালি হয়ে গেলো। সবাই ছুটলো থিয়েটারের তাঁবুতে: বিড়িফোঁকা তেল-চুকচুকে ছোকরার দল, মন্দিরের বাঁধানো বারান্দায় যারা দৈনিক তাস-দাবা খেলে সেই সব বুড়ো-আধবুড়োর দল, চুরি যাবার ভয়ে যে সব যুবতী মেয়েরা বড় একটা রাত্রে বেরুতো-না, সেই সব মেয়ের দল। তাঁবুর

মধ্যে আর তিল ধরবার জায়গা নেই। তাঁবুর বাইরেও চাদর আর কম্বল মুড়ি দিয়ে বহুলোক ভিড় করে রয়েছে। তারা দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু ভাঙা-ভাঙা কথা আর গান শুনতে পাচ্ছে মাঝে-মাঝে। তাইতেই তাদের তৃপ্তি। সেই থিয়েটারের তাঁবুর অদ্ভুত নেশায় সবাই আচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

মেলার মধ্যে ডাক্তারই বোধ হয় একমাত্র লোক যে থিয়েটারে যায়নি। চাঁচের ছাউনির মধ্যে একটা বেঞ্চিতে বসে তখনো সে অন্ধকারে তামাক টানছিলো। তামাকটা শেষ হলেই সে শোবে ঠিক করেছে।

এমন সময় একটা ক্ষীণ কান্নার স্বর তার কানে ভেসে এলো। যেন একটি মেয়ে কাঁদছে আর কান্না চাপবার চেষ্টা করছে।

"কি বিপদ! মাঝরাতে আবার কাঁদে কে? কান্না-টান্না আমার ভালো লাগে না।..."

একটু নড়েচড়ে বসে হুঁকোটায় আরো কয়েকবার সে জোরে-জোরে টান দিলো। দূর থেকে মাঝে-মাঝে শানানো নারীকণ্ঠে থিয়েটারের তাঁবু থেকে গান ভেসে আসছে। ভাঙা-ভাঙা খাপছাড়া লাইন। কিন্তু আরো একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে, শুনতে না পেলেই ডাক্তার খুসি হোতো: হাঁপিয়ে-হাঁপিয়ে কে যেন কাঁদছে, কে যেন কাঁদছে আর হাঁপাচ্ছে।

হুঁকোটা রেখে ডাক্তার বাইরে বেরিয়ে এলো। প্রথমে সে বুঝতে পারলো না কোথা থেকে ভেসে আসছে কান্নার স্বর। একটু থামতেই বুঝতে পারলো, চা-য়ের দোকানের তাঁবুর পাশের তাঁবু থেকে। প্যারাডাইজ রেস্টুরেণ্ট বন্ধ হয়ে গেছে। সেখানে কোনো আলো নেই, কোনো লোক নেই। ডাক্তার সেই তাঁবু পেরিয়ে দাঁড়ালো পাশের তাঁবুর সামনে, যেখানে সমস্ত দিন অদ্ভুত নারীমূর্তি দেখানো হয়েছে।

বেশ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে সেই কান্না। নিঃসন্দেহে কোনো মেয়ে কাঁদছে : হাঁপিয়ে-হাঁপিয়ে, থেমে-থেমে।

"কী হয়েছে ভেতরে ! কে আছো ?" ডাক্তার জিগগেস করলো। কোনো উত্তর এলো না। কয়েক মুহূর্তের জন্যে কান্না বন্ধ হোলো। তারপর আবার শোনা গেলো সেই কান্না।

"কি বিপদ ! ভেতরে কে রয়েছো ?" ডাক্তার জোরে প্রশ্ন করলো।

কান্না থেমে গেলো। তারপর মেয়েলি গলায় ক্ষীণ সুরে উত্তর এলো, "আমি।"

"তুমি কে" ?

"আমি ? আমি কেউ না।" আবার সেই কান্না শোনা যেতে লাগলো।

"কি বিপদ !—কেউ না মানে ? তুমি মেয়ে তো ? তোমার স্বর শুনে তো তাই মনে হচ্ছে।"

কিন্তু কোনো উত্তর এলো না। শুধু কান্নার শব্দ।

"আর কে ভেতরে আছো ?" ডাক্তার তাঁবুর বাইরে থেকে না-জানা লোককে উদ্দেশ্য করে জিগ্‌গেস করলো।

"কেউ নেই," ভিতর থেকে উত্তর এলো, "সবাই থিয়েটারে গেছে।"

"শুধু তুমি আছো ?"

"হ্যাঁ, শুধু আমি আছি"

ডাক্তার পকেট থেকে টর্চ বার করে জ্বালালো, তারপর কাপড়ের দরজা ঠেলে এলো ভিতরে। সেখানে নানা খুচরো জিনিস, একদিকে শুধু একটা ছোটো কাঠের বাক্স।

"তুমি কোথায় ?" ডাক্তার জিগ্‌গেস করলো।

"আমি এই কাঠের বাক্সয়।" উত্তর এলো কাঠের বাক্স থেকে।

"কাঠের বাক্সয়?" বিস্মিত সুরে বলে ডাক্তার সেখানে এগিয়ে গেলো। দেখলো কাঠের বাক্সের মধ্যে ছোটো একটা বিছানা পাতা। সেখানে একটি মেয়ে শুয়ে রয়েছে। কোমর পর্যন্ত পুরোনো কম্বলে ঢাকা। মেয়েটির মুখ দেখলে মনে হয় আঠারো থেকে কুড়ির মধ্যে তার বয়েস, এক মাথা চুল। কিন্তু এই কাঠের বাক্সের মধ্যে তার সমস্ত দেহটা কুলুলো কী করে সেইটেই আশ্চর্য ব্যাপার।

"তুমি কে?" ডাক্তার আবার প্রশ্ন করলো, "এই কাঠের বাক্সেই বা রয়েছো কেন, কাঁদছিলেই বা কিসের জন্যে?"

"আমাকে চেনো না তুমি?" মেয়েটি আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলো, "আমাকে তুমি দেখোনি? কেন, মেলার সবাই তো আমাকে দেখেছে: দু-আনা দিলে আমাকে উপর থেকে দেখা যায়, চার-আনা দিলে আমার জামা কাপড় খুলে দেখানো হয়, আট-আনা দিলে আমাকে একবার ছোঁয়া যায়।...তোমার কপাল ভালো, পয়সা খরচ হলো না আমাকে বিনা-পয়সাতেই দেখতে পেলে।...দাঁড়িয়ে রইলে কেন? দেখে নাও. আমাকে দেখে নাও। এই কম্বলটা সরাও, আমাকে দেখো, আমাকে ছোঁও। আমি অদ্ভুত মেয়ে, কোমর থেকে ওপরের দিকটা ষোল বছরের মেয়ের মতো, কোমর থেকে নিচের দিকটা তিন বছরের খুকির মতো।..."

ডাক্তার প্রথমে কিছুই বুঝতে পারলো না। অনেক দিন পরে এই বোধ হয় সে প্রথম কথা খুঁজে পেলো না।

"দাঁড়িয়ে রইলে কেন? সাহস হচ্ছে না খুলতে? আচ্ছা নিজেই খুলে দিচ্ছি।" বলে মেয়েটি হঠাৎ তার দেহের উপর থেকে কম্বলটা সরিয়ে দিলো আর অদ্ভুত একটা আর্তনাদ করে উঠলো ডাক্তার: তার চোখের সামনে ফুটে উঠলো একটি বিকলাঙ্গ নারীমূর্তি. উপরটা ষোল বছরের মতো, তলার দিকটা ঠীক যেন তিন বছরের।



টর্চ নিভিয়ে ডাক্তার প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো, "ঢাকা দাও, ঢাকা দাও তোমার দেহ।"

"কেন?" বিস্মিত হয়ে অন্ধকারের মধ্যে মেয়েটি প্রশ্ন করলো, "তুমি ভয় পেলে নাকি? কৈ, এতো লোকে তো দেখেছে, কেউ তো ভয় পায় না।"

"ঢাকা দাও, ঢাকা দিয়েছো তোমার শরীর?" ডাক্তার চীৎকার করে প্রশ্ন করলো।

"হ্যাঁ, দিয়েছি। আলো জ্বালাও।" বললো মেয়েটি।

ডাক্তার আলো জ্বালালো। মেয়েটি তার দেহের উপর আবার কম্বলটা টেনে দিয়েছে: ছেঁড়া আর পুরোনো আর দুর্গন্ধময় একটা কম্বল।

ডাক্তারের চোখের দিকে চেয়ে মেয়েটি বললো, "এবার বল আমি কে? আমি কি মানুষ? তুমি তো আমাকে সবটাই দেখলে।"

"তু-তুমি কী করে এ রকম হলে? জন্ম থেকেই কি এ রকম?"

"না না—আমাদের জন্মাবার পর..."

বাধা দিয়ে ডাক্তার প্রশ্ন করলো, "তোমাদের? মানে?"

"ও! আমরা দু-বোন একসঙ্গে জন্মাই। আমাদের জন্মাবার পর থেকেই দুটো হাঁড়ির মধ্যে আমাদের রাখা হয়েছিলো। চোদ্দ বছর আমরা হাঁড়িতে ছিলুম, আমাদের দেহের ওপরের অংশটা স্বাভাবিক-ভাবে বেড়ে উঠলো, কিন্তু কোমর থেকে বাড়লো না। চোদ্দ বছর পরে হাঁড়ি ভেঙে আমাদের বার করা হোলো, জানো চোদ্দ বছর পরে!"

"চোদ্দ বছর হাঁড়ির মধ্যে ছিলে!" ডাক্তারের গলায় বিস্ময় আর অবিশ্বাসের সুর, "অসম্ভব! কী করে থাকতে পারলে?"

"ও, বুঝেছি! হাঁড়ির তলায় একটা করে গোল গর্ত থাকতো।—এবার বুঝেছ, জন্তুদের মতো ছিলুম। তারপর যখন বেরিয়ে এলুম তখন...

তখন না মানুষ না জন্তু!—কত হাজার-হাজার লোক আমাদের দেখলো। কত লোক, তোমার মতো আশ্চর্য হলো।...আমার বাবার বেশ রোজগার হতে লাগলো...।"

আবার বাধা দিয়ে উঠলো ডাক্তার, "তোমার বাবার মানে? কে তোমার বাবা?"

"কেন, লোকেদের সামনে যে আমাকে দেখায়? বাবাই তো আমাকে দেখায় লোকেদের চুপি-চুপি বলে, চার-আনা দিলে সবটা দেখতে পাবে, আট-আনা দিলে একবার ছুঁতে পাবে।" খুব সহজ গলায় মেয়েটি বললো। একটু সে থামলো তারপর কাঁদতে লাগলো, "আমার বোন তিন বছর আগে হঠাৎ মরে গেছে। আমি এখনো বেঁচে আছি। ভাবছি কবে মরবো। কবে মরবো বলতে পারো?" কিন্তু ডাক্তারের কাছ থেকে কোনো উত্তরের আশা না করে আবার সে বলতে আরম্ভ করলো, "আমার মন আঠারো বছরের মেয়ের মতো, আমার ওপরের দেহ আঠারো বছরের মেয়ের মতো। কিন্তু আমি তো মানুষ নই। আমার ইচ্ছের কী দাম? আমার লজ্জার কী দাম? কিছুই না।...চার-আনা দিলেই আমার সবটা দেখতে পাবে, আট-আনা দিলেই একবার ছুঁতে পাবে।...আপত্তি করলে মার খেতে হবে, খেতে দেবে না। খিদেয় পাগল হয়ে গেলেও খেতে দেবে না। যতদিন না মরি ততদিন এখান থেকে পালাতে পারবো না।"

মেয়েটি আবার সেই রকম করে হাঁপাতে-হাঁপাতে কাঁদতে লাগলো, দূর থেকে অস্পষ্ট থিয়েটারের গান ভেসে এলো তার কান্নার ফাঁকে-ফাঁকে।

হঠাৎ কান্না থামিয়ে মেয়েটি বললো, "কিন্তু তুমি কে?—এর আগে আমাকে দেখোনি, আজ রাতে থিয়েটার দেখতে গেলে না, আশ্চর্য লোক তো!"

"আমি? আমি ডাক্তার।" ডাক্তার উত্তর দিলো।

"ডাক্তার?" হেসে উঠলো মেয়েটি, "কী অসুখ সারাতে পারো তুমি? আমাকে কি সারাতে পারো?"

"পারি বৈকি!" কি যেন ভাবতে লাগলো ডাক্তার, "এক শিশি ওষুধেই তুমি সেরে যাবে।"

"সেরে যাবো? বল কি?" টর্চের আলোয় মেয়েটির চোখ চকচক করতে লাগলো, "সেরে যাবো? হাঁটতে পারবো? মানুষ হবো?"

"হুঁ।" গম্ভীর স্বরে সে উত্তর দিলো।

"দয়া কর, দয়া করে আমাকে ওষুধ দাও, দয়া কর...," বলতে-বলতে মেয়েটি হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলো।

"দয়া, দয়া, দয়া!" ততক্ষণে ডাক্তার আবার সেই পুরোনো মানুষ হয়ে গেছে, "দয়া কথাটা শুনলেই সমস্ত রক্ত আমার মাথায় চড়ে যায়। জীবনে আমি কাউকে দয়া করিনি, আমাকেও কেউ কখনো দয়া করেনি। তোমাকে দয়া করতে যাবো কেন? আমি চললুম। ঘুমোও। কেঁদে আমার ঘুমটা আর মাটি কোরো না।"

ডাক্তার অন্ধকারে নিজের ছাউনিতে এসে আবার বসলো সেই পুরোনো বেঞ্চিতে। মাঘী পূর্ণিমার রাত্রে সমস্ত আকাশ আলো হয়ে রয়েছে। দূর থেকে থিয়েটারের গান ভেসে আসছে। মাঝে-মাঝে একটি বিকলাঙ্গ মেয়ের কান্নাও শোনা যাচ্ছে: হাঁপিয়ে-হাঁপিয়ে সে কাঁদছে।

মিনিট পনেরো কুড়ি ডাক্তার পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো। তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে নিজের ঝুলি থেকে একটা শিশি বার করলো। তাতে শাদা গুঁড়ো-গুঁড়ো একটা ওষুধ। কাঁচের গেলাসে ডাক্তার খানিকটা সেই গুঁড়ো ঢাললো, তাতে মেশালো জল। তারপর এক হাতে টর্চ অন্য হাতে ওষুধের গেলাসটা নিয়ে সেই তাঁবুর কাছে

এলো। এক মুহূর্ত কী যেন ভাবলো। তারপর টর্চ জ্বালিয়ে ঢুকলো ভিতরে। মেয়েটি তখনো ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছিলো। আলো দেখে কান্না থামিয়ে বললো, "কে?"

"আমি ডাক্তার। তোমার জন্যে ওষুধ এনেছি," কাঠের বাক্সের কাছে দাঁড়িয়ে ডাক্তার বললো, "কথা বোলো না। খেয়ে নাও ওষুধটা। খেলেই ঘুমিয়ে পড়বে। যখন ঘুম ভাঙবে দেখবে তুমি ভালো হয়ে গেছো। মানুষ হয়ে উঠেছো।"

মেয়েটি হাঁ করলো। ডাক্তার ঢেলে দিলো ওষুধ তার মুখে।

"ভালো হয়ে উঠবো তো?" কোনো রকমে জড়িয়ে-জড়িয়ে মেয়েটি একবার প্রশ্ন করলো, তারপর আর কোনো কথা বলতে পারলো না। বাইরে এসে ডাক্তার আছড়ে ভেঙে ফেললো তার ওষুধের গেলাস। দাঁতে দাঁত ঘঁষে বললো, "দয়া, দয়া! জীবনে এই প্রথম দয়া করলুম।"

আরো খানিক পরে দেখা গেলো ডাক্তার তার ছাউনি থেকে বেরিয়ে এসেছে। কাঁধে ঝুলি, হাতে একটা পুঁটলি। কোনো দিকে সে চাইলো না। মাঠের যে-পথ দিয়ে এসেছিলো সেই পথ দিয়ে ফিরে চললো।

পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় পৃথিবীর ধূলোয় তার কালো ছায়া পড়তে লাগলো।

মৃত্যুতিথি

রাত্রি সাড়ে বারোটায় নির্মল যখন টেলিফোনে খবর পেলো তার বাবার খুড়তুতো ভাই উমাপ্রসাদ শ্যামবাজারে মারা গেছেন তখন খুব বেশি আশ্চর্য হয়নি। তিনি যে আর বাঁচবেন না এ-কথা গত কুড়িদিন আগে বোঝা গিয়েছিলো। অনেকদিন ধরে তিনি পক্ষাঘাতে নিশ্চল হয়ে পড়েছিলেন। দিন কুড়ি আগে পৌঁছেছিলেন মৃত্যুর খুব কাছে। কিন্তু ডাক্তারের সমস্ত হিসেব ভুল প্রমাণ করে তিনি এই কুড়িটা দিন বেঁচেছিলেন। যে অবস্থায় বেঁচেছিলেন তার চেয়ে মৃত্যু অনেক ভালো। তাই টেলিফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রাখতে-রাখতে নির্মলের মন থেকে একটা ভারি বোঝা নেমে গেলো। আর একটু হলেই টেলিফোনের চোঙায় মুখ রেখে সে বলতে যাচ্ছিলো : যাক, বাঁচা গেলো! ভাগ্যিস কথাগুলো উচ্চারণ করেনি!

বালিগঞ্জ থেকে শ্যামবাজার যে অনেকটা দূর ব্ল্যাকআউটের রাতের দিকে চেয়ে হঠাৎ তার মনে হোলো। দিনের বেলায় কলকাতার মধ্যে দূরত্বের প্রশ্নই ওঠে না। কয়েক আনা খরচ করে অনায়াসে এ-মাথা ও-মাথা ঘোরা যায়। কিন্তু রাত্রি সাড়ে বারোটায় যখন বাস-ট্রাম বন্ধ তখন সব-কিছুরই রঙ বদলে গেছে।

প্রথমে যে শাদা পাঞ্জাবীটা পরেছিলো শোকের বাড়ির পক্ষে সেটা বেশি পরিষ্কার মনে হওয়ায় বদলে আধময়লা একটা হাতকাটা শার্ট পরে তাড়াতাড়ি নির্মল প্রস্তুত হয়ে নিলো।

এক পেয়ালা চা হলে মন্দ হোতো না। কিন্তু চাকরকে দিয়ে

চা করাতে গেলে অনেকটা সময় মিছিমিছি নষ্ট হবে। তাই শুধু সিগারেট ধরিয়ে সে বেরিয়ে এলো। এতো রাত্রে ট্যাক্সি ছাড়া উপায় নেই। একজনের মৃত্যু উপলক্ষ্যে খানিকটা বিলাসিতা করা যাক, ভাবলো নির্মল। আর হাসলো। তাই শিখ ড্রাইভারের আট রূপেয়ার কমে না-যাবার ঘোষণা শুনেও হাসিমুখে সে শুধু বললো, "জলদি চলো।"

চমৎকার রাত। হুঁ-হু করে সমুদ্রের হাওয়া বইছে। কী তিথি? একটু পরেই অসম্পূর্ণ চাঁদটা ডুবে যাবে। চৌরঙ্গীর দীর্ঘ পথ চাঁদের লালচে আলোয় আর সমুদ্রের হাওয়ায় সে স্নান করলো। এতোক্ষণে ঘুমের জড়তা কেটে গেছে। সমস্ত শরীরে শুধু মধুর অবসাদ। এমন আশ্চর্য রাত সে কি কখনো আগে দেখেছে, এমন লালচে জ্যোৎস্নার আর উদ্দাম হাওয়ার রাত?

চৌরঙ্গীতে দিব্যি গাড়ি চলেছে, ট্যাক্সি আর মিলিটারি লরি। দু-একটা যে প্রাইভেট গাড়ি না আছে তা নয়। অনেক টমি টলতে-টলতে হেঁটেই চলেছে, ট্যাক্সিতে পুরুষ আর নারীমূর্তি। মনে-মনে সে ভাবলো যত অসময়ই হোক না কেন চৌরঙ্গীর জীবন কখনো থেমে যায় না।

চৌরঙ্গী পেরিয়ে যেতেই সব আবার চুপচাপ। আকাশের অসম্পূর্ণ-চাঁদটা বড়বড় বাড়ির আড়ালে অদৃশ্য হোলো। বুঝি ডুবেই গেছে এতোক্ষণে। দুটি কক্ষচ্যুত তারার মতো লাল আর শাদা আলো জ্বালিয়ে একটি এয়ারোপ্লেন পাহারা দিয়ে বেড়াচ্ছে। চাঁদ ডুবলো। গতকাল সন্ধেয় চাঁদের দিকে চেয়ে যারা ভয় পেয়েছিলো তারা এখন নিশ্চিন্ত হোলো।

বড় রাস্তায় ট্যাক্সি ছেড়ে নির্মল শ্যামবাজারের গলিতে ঢুকলো। বাতাসে চুল এলোমেলো করে দিয়েছে। ভালোই হয়েছে। শোকের বাড়িতে চমৎকার মানাবে। গলির একধারে চটিজোড়া বিসর্জন দিতে হোলো। হাজার হোক উমাপ্রসাদ তো তার জ্যাঠামশাই ছিলেন।

সে ভেবেছিলো বাড়ি ঢোকবার আগে কান্নাকাটি শুনতে পাবে। কিন্তু একেবারে চুপচাপ দেখে খুব স্বস্থ বোধ করলো। সমস্ত বাড়িময় আলো জ্বলছে। ব্ল্যাকআউট শেডের জন্যে বাইরে আলো বেরুচ্ছে না, শুধু আলোর মৃদু আভা আশেপাশের পুরোনো নোনাধরা দেওয়ালে পড়েছে।

গলির মোড়ে লণ্ঠন হাতে নিধি দাঁড়িয়েছিলো। বয়েস পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি। বারো বছর বয়েস থেকে এ-বাড়িতে আছে। দিব্বি হৃষ্টপুষ্ট নধর চেহারা। কথা বলে আধো-আধো মেয়েলি গলায়। তার স্বর শুনলেই নির্মলের সর্বাঙ্গ জ্বালা করে। তাকে দেখে নিধি হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেললো। বললো, "কর্তাবাবুকে আর রাখতে পারলুম না দাদাবাবু। তিনি চলে গেলেন।"

লণ্ঠনের-লালচে আলোয় নির্মল লক্ষ্য করলো হতভাগা এই দুর্ঘটনার রাত্রেও দিব্যি পরিপাটি করে তার অতিরিক্ত তৈলসিক্ত চুল আঁচড়েছে। ধমক দিয়েই বললো নির্মল, "চুপ কর"। দাঁতে দাঁত ঘষে মনে-মনে বললো, "স্টুপিড।"

শোকোচ্ছ্বাসে বাধা পড়ায় ঘাবড়ে গিয়ে নিধি চুপ করলো। নির্মলকে দেখিয়ে চোখ দুটো মুছে আলো নিয়ে সে এগিয়ে আসছিলো।

"আমার সঙ্গে আসতে হবে না?" এক রকম রুক্ষ স্বরেই নির্মল বললো, "আলো নিয়ে অন্যদের জন্যে দাঁড়িয়ে থাক।" গলির মোড়ে আলো নিয়ে ফিরে যেতে-যেতে নিধি সম্ভবত তাকে নির্বংশ হবার অভিশাপ দিচ্ছিলো।

তিনতলার ঘরে উমাপ্রসাদ থাকতেন। অসুখের পর ক্রমাগত তিন বছর এই ঘরেই ছিলেন। অত্যন্ত প্রিয় ঘর তাঁর। ছেলেবেলায় এখানে রাত জেগে পরীক্ষার পড়া তৈরি করেছেন, বিয়ের পর এখানে ফুলশয্যার রাত জেগেছেন, আজ এখানেই তাঁর মৃত্যু হোলো।

বাইরে থেকে নির্মল দেখলো ঘরের মেঝেয় বিছানা পাতা, উমাপ্রসাদের শায়িত মৃতদেহ তার উপর। ঘরে তিন-চারটি ছোটো-ছোটো ছেলে-মেয়ে, উমাপ্রসাদের স্ত্রী, পাড়ার কয়েকটি মেয়ে আর তিন পুত্রবধূ। বাইরের বারান্দায় যাঁরা বসে আছেন সবাই তাঁরা পুরুষ।

উমাপ্রসাদের স্ত্রীর বেশ বয়স হয়েছে। ষাটের কম নয়। স্বামী-স্ত্রীর বয়সের ব্যবধান ন' বছরের। অতএব উমাপ্রসাদ প্রায় সত্তর বছর বেঁচেছিলেন। বেশ দীর্ঘায়ুই বলতে হবে।

মেয়েরা নিঃশব্দে কাঁদছে। যাদের ফরসা রঙ তাদের চোখমুখ কান্নায় গোলাপী হয়ে গেছে। পুরুষদের মধ্যে কেউই কাঁদছে না, শু ১৮ সময়োচিত গম্ভীর।

উমাপ্রসাদের বড় ছেলে নিখিল এ বাড়িতে থাকে না। খবর পেয়ে এসেছে। এক কোণে বসেছিলো। নির্মলকে ইসারায় কাছে ডাকলো। একটু জড়ানো স্বরে বললো, "খুব শিগগীর তো চলে এলি! ট্যাক্সিতে বুঝি?"

তার মুখ দিয়ে স্পষ্ট হুইস্কির গন্ধ বেরুচ্ছে। আজ রাত্রেও সে তাহলে নেশা করেছে? তবে আশার কথা অন্য দিনের মতো বেহেড হয়নি। মুখের কাছ থেকে সরে বিরক্ত হয়েই নির্মল বললো, "ট্যাক্সি ছাড়া আর কিসে আসবো?"

"হুঁ, তাও তো বটে", বলে নিখিল বুকের উপর মাথাটা ঝুঁকিয়ে যেমন বসেছিলো তেমনি রইলো।

নিত্যানন্দবাবু পাড়ার প্রবীণ লোক। এ বাড়ির সব খবর জানেন, অনেক দিনের আলাপ। নির্মলকে ডেকে বললেন, "কি মুস্কিলেই যে পড়া গেলো। নিখিল বড় ছেলে। ওরই তো মুখাগ্নি করার কথা। বলেছিলুম 'বাবা, কটা দিন আর নেশা করিস নে।' তা শুনবে কেন? মাতালের মরণ! আজকেও নেশা করেছে। এ বাড়িতে চাকর

ধরে-ধরে নিয়ে এলো। পা জড়িয়ে যাচ্ছে। ওকে শ্মশান পর্যন্ত নিয়ে যাওয়াই এক হাঙ্গামা হবে দেখছি।”

“কেরে? নির্মল এলি?” উমাপ্রসাদের স্ত্রী ঘর থেকে প্রশ্ন করলেন। গলাটা ভেঙে গেছে। তবে যতটা তিনি ভেঙে পড়বেন বলে নির্মল ভয় পেয়েছিলো স্বর শুনে তত কিছু মনে হোলো না।

গলাটা পরিষ্কার করে নির্মল উত্তর দিলো “হ্যাঁ জ্যাঠামা।”

“আয় বাবা ঘরে আয়।”

পাড়ার কয়েকটি যুবতী বৌ তাকে দেখে ঘোমটা দিলো। কয়েকজন বিধবা বুড়ি-আধবুড়ি স্ত্রীলোক মাথায় কাপড় দিয়ে একটু সরে বসলো। নির্মলকে কাছে বসিয়ে উমাপ্রসাদের স্ত্রী বললেন, “তুই-ই আমার একমাত্র ভরসা, নিমু। শুনছি নিখিল এসেছে। কিন্তু তাকে দিয়ে কতটা কি উপকার হবে জানি না। নেহাৎ ওকে দিয়ে যদি না চলে তবে দিলীপকে দিয়েই কাজটা করিয়ে নিস।”

“তুমি ভেবো না জ্যাঠামা। সব বন্দোবস্ত হয়ে যাবে।”

তাঁর চোখ দিয়ে নিঃশব্দে দু-ফোঁটা জল বেরিয়ে এলো। আর কোনো কথা বললেন না। তখনো পরনে তাঁর চওড়া লালপাড় শাড়ি, সিঁথেয় সিঁদুর। শুধু সমস্ত মুখ অসম্ভব শুকিয়ে গেছে। চুলগুলো যেন হঠাৎ শাদা হয়েছে। মুখময় দেখা দিয়েছে অনেক নতুন রেখা। হঠাৎ যেন তিনি খুব বুড়ি হয়ে গেছেন।

এতোক্ষণ এই শোকের বাড়ির বাতাস তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। এইবার প্রথম নির্মলের মনে হোলো গলার কাছটা যেন ব্যথা করছে।

নিখিল ছাড়া উমাপ্রসাদের আরো দুটি ছেলে আছে, একজন করাচি আর একজন নাগপুরে সরকারি কাজ করে। মেজো ছেলের একমাত্র ছেলে দিলীপ। ছোটোটির এখনো ছেলেপুলে হয়নি। আর নিখিলের দুটি মেয়ে, ছেলে নেই। অতএব দিলীপই হোলো বড় নাতি। দিন

কুড়ি আগে উমাপ্রসাদের সংকটাপন্ন অবস্থায় তার দুই প্রবাসী-পুত্রকে টেলিগ্রাম করে আনানো হয়েছিলো। কিন্তু দিন সাতেক আগে স্ত্রীদের রেখে দু-জনেই ফিরে গেছে। কারণ ডাক্তাররা সঠিকভাবে কিছু বলতে পারেনি। সে-অবস্থায় রোগীকে ছ-দিন থেকে ছ-মাস পর্যন্ত বেঁচে থাকতে দেখা গিয়েছে।

নিখিলের দুই মেয়েকে ঘরের বাইরে নির্মল ডাকলো। বড়টির বয়েস ষোলো-সতেরো, বেশ বাড়ন্ত গড়ন। ছোটোটি এখনো ফ্রক পরে। তাদের সে বললো, "সব সময়ে এখন ঠাকুমার কাছে থাকবি, বুঝলি?"

বড়টি ঘাড় নাড়লো। ছোটোটির হাতে আয়না। সে ফিসফিস করে জিগগেস করলো, "নিমুকাকা, দাদু কি সত্যি মরে গেছে? আমি এই আয়নাটা মুখের ওপর ধরেছিলুম। দেখো তো কোনো দাগ পড়েছে কিনা!"

আয়নাটার দিকে ভালো করে না চেয়েই নির্মল বললো, "কে তোকে এ-সব শেখালো?"

'রাঙা-কাকীমা দেখতে বলেছিলেন। মানুষ বেঁচে থাকলে নাকি আয়নায় দাগ পড়ে! সত্যি, বল না নিমুকাকা?"

"লক্ষ্মী মেয়ে, ঠাকুমার কাছে বসে থাক। দাগ কিছু পড়েনি।"

নির্মলের কথা শুনে তারা দু-জনে আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। এই বোধ-হয় জীবনে তারা প্রথম মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে।

ইতিমধ্যে পাড়ার মোড়ল রামহরি কোমরে গামছা বেঁধে এসে হাজির। এ-পাড়ায় রামহরিকে বরাবর সে দেখেছে বাড়ির রোয়াকে বসে বেকার ছোকরাদের নিয়ে হয় কুলাপি নয় ঘুগনি খেতে আর আড্ডা দিতে। তাকে না দেখলে বুঝতে হবে হয় গেছে সিনেমা বা ফুটবল ম্যাচ দেখতে নয়তো মড়া পোড়াতে। লোকটাকে কোনোদিন নির্মল আমোল দেয়নি। আজ রাত্রে এই প্রথম তাকে বন্ধু বলে মনে হোলো

চাপা গলায় সে বললো, "আমরা রেডি নিমুদা। দলবল নীচে বসে আছে। ঘোতন গেছে খাট আর ফুল কিনতে, মদনাকে পাঠিয়েছি কীর্ত্তনিয়াদের ডাকতে। তারা এলো বলে।"

খুসি হয়ে নির্মল বললো, "খুব ভালো করেছো, ভাই। তোমরাই এখন ভরসা।"

"কিছু ভাবতে হবে না নিমুদা," খুসি হয়ে রামহরি বললো, "এই শর্মা যতদিন আছে ততদিন সব একেই ছেড়ে দাও। মড়া পুড়িয়ে-পুড়িয়ে তো হাড়ে ঘুণ ধরে গেলো।" নির্মলের চোখে চোখ পড়তেই বুঝলো কথাটা খুব ভালো বলেনি, তাই ঢোক গিলে পরের মুহূর্তে বললো, "আমিও তো ওনাকে জ্যাঠামশাই বলতুম। আমারই কি বুকে আজ কম লেগেছে!"

ঠুক-ঠুক লাঠির শব্দে তারা দু-জনে চেয়ে দেখলো বৃদ্ধ বদ্যিনাথবাবু সোজা তিনতলায় এসেছেন। মৃত্যু এসে এ বাড়ির সদর-অন্দর এক করে দিয়েছে।

বদ্যিনাথবাবু উমাপ্রসাদের একমাত্র বাল্যবন্ধু। ভদ্রলোক তিনতলায় উঠে হাঁপিয়ে পড়েছিলেন। সামনের দিকে খানিক ঝুঁকে সিঁড়ির রেলিঙ ধরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। নির্মল তাঁকে বললো, "বসুন।"

"উমা তা হলে আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালালো?" বৃদ্ধের গলা ভেঙে গেছে, ধূসর চোখে জল চিকচিক করছে। নির্মলকে অত্যন্ত নীচু গলায় বললেন, "মা কোথায়? দেখছো বাবা how death has chosen the wrong person! বুড়ি রইলো বেঁচে আর তার ছেলে গেলো চলে!"

সত্যিই তো। এ-পর্যন্ত নির্মলের সে-কথাটা মনে হয়নি। উমাপ্রসাদের মা যে বেঁচে রয়েছেন এবং এ-বাড়িতেই আছেন! প্রায় নব্বই বছর তাঁর বয়েস হোলো। এখনও বেশ শক্ত, শুধু গত বছর চার-পাঁচ ধরে মাথাটা যেন গোলমাল হয়ে গেছে। লোকে বলে ভিমরতি হয়েছে।

শোনা যায় যৌবনে তিনি নামকরা সুন্দরী ছিলেন। তখনকার দিনের অনেক বিখ্যাত ধনী তাঁকে বিয়ে করবার জন্যে পাগল হয়ে গিয়েছিলো। অবশ্য বিয়ে হয় তাঁর তখনকার দিনের মস্ত এক জমিদারের সঙ্গেই। কিন্তু বেশি দিন তিনি স্বামীর সঙ্গে সংসার করতে পারেননি। তাঁদের বিবাহিত জীবন মাত্র চার বছরের এবং সেই সময়ের মধ্যেই তাঁর স্বামী মদ এবং বাইজীর পিছনে প্রায় সমস্ত সম্পত্তি উৎসর্গ করে লিভার-এ্যাবসিসে মারা যান। উমাপ্রসাদ সবে তখন ভূমিষ্ঠ হয়েছেন।

বৃদ্ধা আজকাল সবসময় দরজা-জানালা বন্ধ করে থাকেন। বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে সমস্তই তাঁর গেছে শুধু শ্রবণশক্তি এখনও আশ্চর্য প্রখর। এমন কি অস্বাভাবিক রকম প্রখর বলা যায়। কার কাছে তিনি নেছেন কলকাতায় বোমা পড়েছে। সেই থেকে বোমার ভয়ে তিনি অস্থির। ঘরের জানালা-দরজা খোলেন না, নিজেও বড় একটা বাইরে আসেন না। এমন কি জানালার ফুটো পর্যন্ত তুলো দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছেন। নির্মল তাঁর খোঁজ নিতে গেলেই বলেন, "ছ্যাখ তো বাবা কোথাও ফাঁক আছে কিনা। ফুটো থাকলেই ঘরে বোমা সেঁধুবে।"

নির্মল হেসে বলে, "ঠাকুমা, বোমা আরশোলা না ইঁদুর যে গর্ত দিয়ে আসবে ?"

তাই শুনে রেগে তিনি বলেন, "বোমা নিয়ে ফাজলামো করিস না! আমি কি শুনিনি হাতিবাগানে কত লোক মরেছে! উমিকে বললুম আমাকে কলকাতার বাইরে পাঠিয়ে দে, বললুম মা'কে আর ঝি করে বাড়িতে রাখিসনি, লোকে যে নিন্দে করবে। তা নয়, বাবু মুখে সিগারেট গুঁজে বৌকে পাশে বসিয়ে থিয়েটার দেখেই বেড়ান। এদিকে মা যে মরছে বোমার জ্বালায় সে খেয়াল নেই!"

উমাপ্রসাদকে তিনি যে খুব ভালোবাসতেন এতো অত্যন্ত স্বাভাবিক

কথা। কিন্তু এখন তাঁর মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে এ-বাড়িতে বন্দী করে ছেলে তাঁকে ঝি-র মতো খাটাচ্ছে আর নিজে বেড়াচ্ছে বৌ নিয়ে ফুর্তি করে।

কী মনে করে নির্মল চুপিচুপি দোতলায় এলো। দোতলার কোণের ঘরে তিনি থাকেন। সেদিকেই শুধু আজ রাতে আলো জ্বালানো হয়নি।

দরজায় কান পেতে নির্মল ভেবেছিলো কিছুই শুনতে পাবে না। কিন্তু বৃদ্ধাকে বিড়বিড় করে কথা বলতে শুনে আশ্চর্য হোলো। তাঁকে ঘাঁটিয়ে লাভ নেই ভেবে নির্মল চুপিচুপি চলে আসছিলো। কিন্তু তার মৃদু পায়ের শব্দও বৃদ্ধার কান এড়িয়ে গেলো না। "কে রে, দরজার কাছে কে?" তিনি জিগগেস করলেন।

নির্মল প্রথমটায় ভয়ানক চমকে উঠেছিলো। উত্তর না দিলে পাছে তিনি গোলমাল বাধান এই ভয়েই সে বললো, "ঠাকুমা, আমি নিমু।"

"ওঃ নিমু, তাই বল।—হ্যাঁ রে, বলতে পারিস, উমি বৌ নিয়ে থিয়েটার দেখে ফিরেছে কিনা? সেই যে কখন বেরিয়েছে এখনও ফেরবার নাম নেই! কি আক্কেল বল দিকিনি: বুড়ি মা রইলো ঘরে, ঝি-র কাজ করতে-করতে হাড় কালি হোলো, আর উনি কিনা বৌ নিয়ে থিয়েটার দেখে ফিরলেন না!"

কয়েক মুহূর্তের জন্যে যেন বোবা হয়ে গেলো নির্মল! তারপর চাপা গলায় বললো, "খুব সাবধান ঠাকুমা, ঘর থেকে বেরিও না। বাইরে বোমা পড়ছে!"

"বোমা? বলিস কি, সত্যি?" বৃদ্ধা যে খুব ভয় পেয়েছেন স্পষ্ট সে-কথা বোঝা গেলো। "কিন্তু শব্দ তো শুনতে পাচ্ছি না! বুড়ি হয়েছি বলে বোধ হয় কানে কম শুনছি।"

তা হলে অন্তত আজকের দিনে যে সবাই নিশ্চিন্ত থাকতো নির্মল

মনে-মনে সেকথা ভাবলো। বললো, "হ্যাঁ ঠাকুমা, দূরে পড়ছে। আমরা বেশ শুনতে পাচ্ছি। তাই তোমাকে সাবধান করতে এলুম।"

"আমি ঠিক আছি, আমার জন্যে ভাবিস না। তবে উর্মির জন্যেই ভাবনা। কচি বৌটাকে নিয়ে এই কি থিয়েটারে যাবার সময়? ওর বুদ্ধিশুদ্ধি কবে হবে? আমাকে চিরকাল ভাবিয়ে-ভাবিয়ে শেষ করলো!" একটু থেমে আবার তিনি বললেন, "নিধি হারামজাদা কী করছে? তাকে বল না একবার বাইরে গিয়ে খোঁজ করতে।"

"তাই বলছি," বলে নির্মল চলে আসবার জন্যে ফিরে দেখলো উপর থেকে রামহরি নামছে। নির্মলকে দেখেই সে বললো, "এই যে নিমুদা। তোমাকেই খুঁজছি। ঘোতন খাট আর ফুল নিয়ে ফিরেছে।"

বাধা দিয়ে নির্মল বললো, "এই চুপ!" তারপর বৃদ্ধার ঘরের দিকে ইসারা করতেই রামহরি এক মুহূর্তে ব্যাপারটা বুঝে নিলো।

রামহরির কথা কিন্তু বৃদ্ধার কান এড়িয়ে যায়নি। ঘর থেকে চেঁচিয়ে বললেন, "কে রে? ফুল আর খাটে কী হবে? এই বোমা পড়ার সময় বাইরে কি কেউ ফুল আনতে যায়? উর্মি ফিরেছে বুঝি? বেশ ছেলে যা হোক! —মা-কে ঝি করে আবার কি ফুলশয্যে করছে?"

ঠোঁটের উপর আঙুল তুলে চুপ করতে ইসারা করে নির্মল বললো, "ফুল কোথায় ঠাকুমা! জ্যাঠামশাই-এর যে অসুখ। তাই ডাক্তার ডাকতে গিয়েছিলো। ডাক্তার এসেছে। কি শুনতে যে কি শোনো আজকাল!"

"ডাক্তার? তাই বল। আমি যেন শুনলুম ফুল এসেছে। উর্মি আবার অসুখ বাধিয়েছে? আর পারি নে বাপু। কোনদিক সামলাই? এদিকে বোমা, ওদিকে অসুখ। তা ছাখ, আমি তো এখন বাইরে বেরুবো না—যে বোমা পড়ছে! তুই ভালো করে ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ ন। আর তাকে ছাড়িস নে যেন। বোমার সময় বাড়িতে একটা

ডাক্তার থাকা ভালো। কখন কী কাজে লাগবে বলা যায় না।—দেখি এখন জানলাগুলো ঠিক বন্ধ আছে কিনা।” বৃদ্ধা আবার প্রত্যেক জানালা-দরজা টেনে-টেনে বন্ধ করতে লাগলেন।

তিনতলায় এসে নির্মল দেখলো নিখিল পকেট থেকে কি যেন একটা বড়ি বার করে মুখে ফেলছে। কাছে গিয়ে কাঁধে নাড়া দিয়ে জিগগেস করলো, “কী আবার খেলে ?”

হেসে নিখিল বললো, “ও কিছু নয়, এ্যাসপিরিন। দু-টো খেয়েছি—আর এই একটা খেলুম। বেশ পরিষ্কার লাগছে। এখন মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ করতে হবে কিনা!”

রামহরি তাড়া দিয়ে বললো, “ভটচায্যি মশাই এসে গেছেন। নাও নিখিলদা, ওঠো। তোমার পূজো-আহ্নিক কী সব করা দরকার করে নাও। হাঁটতে পারবে তো ?”

দাঁড়িয়ে নিখিল বললো, “খুব পারবো।” কিন্তু তখনও পা দুটো টলছে।

“যা পারবে বুঝেছি,” রামহরি বললো, “তুমি পূজো-আহ্নিক সেরে নাও। আমি বরঞ্চ দ্যোতনাকে আর একবার পাঠাই। একটা রিক্স জোগাড় করে আনুক।”

হেসে নিখিল বললো, “সে-ই ভালো রে। এতোটা পথ তা হলে আরাম করে যাওয়া যায়।”

“তা সত্যি,” বললো রামহরি, “আজকেই তো তোমার আরাম করবার দিন!” তার কথাগুলো নিখিল শুনতে পেলো না, কিংবা শুনেও শুনলো না ঠিক বোঝা গেলো না।

ঘরে সে ঢুকতেই মেয়েরা বেরিয়ে গেলো। দিলীপ বসে রইলো উমাপ্রসাদের মৃতদেহ ছুঁয়ে। খালি গায়ে নতুন পৈতে পরে জরাজীর্ণ পুরোহিতের সামনে বসে নিখিল জড়িয়ে-জড়িয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলো

যেদিন জানাজানি হোলো নিখিল মদ ধরেছে 'সেদিনই উমাপ্রসাদ তাঁর নতুন উইল করলেন। বাড়ি ও সম্পত্তি সমান দু-ভাগ করে দিলেন অন্য দুই ছেলেকে। নিখিলকে কিছুই দিলেন না; শুধু তার মেয়েদের বিয়ের সময় যাতে হাজার দশেক টাকা পায় সেই ব্যবস্থা করলেন। সেই দিনই নিখিল এ-বাড়ি ছেড়েছিলো। আর আসেনি।

উমাপ্রসাদের মৃত্যুর পর আজ আবার তাকে আসতে হয়েছে।

এখন তার মাথায় নানা ভাবনা ঘুরছে।…কপাল তার ভালো, অন্য দু-ভাই আজ অনুপস্থিত। তার এক ডাক্তার-বন্ধুকে নিয়ে এসেছে। ডেথ-সার্টিফিকেটে মৃত্যুর কারণ লিখিয়েছে: সেরিব্র্যাল হেমারেজ। নিমতলা ঘাটের রেজেস্ট্রি খাতায় এই কথাগুলো লেখাতে পারলেই তার স্বার্থসিদ্ধি হবে। উইল করার সময় উমাপ্রসাদ যে সুস্থ মস্তিষ্কে ছিলেন না সেই নিয়ে একটা মামলা রুজু করা তা হলে যেতে পারবে। উকিলদের সঙ্গে আগেই পরামর্শ সে করে রেখেছে। এখন নেশার ঝোঁকে পাছে ভুল করে না বসে সেইজন্যে চেষ্টা করছে এ্যাসপিরিন ট্যাবলেট খেয়ে সুস্থ হতে।

নিখিলকে দিয়ে মন্ত্র পড়ানো শেষ হোলো। নির্মল আর রামহরি মৃতদেহকে নতুন কাপড় পরালো, নতুন চাদর জড়িয়ে দিলো তার গায়ে। পাড়ার একটি মেয়ে উমাপ্রসাদের কপালে চন্দন লাগিয়ে দিলো, দিলীপ এক শিশি দামী এসেন্স দিলো ঢেলে। সুগন্ধে সমস্ত ঘর ভরে উঠলো।

মৃতদেহকে ঘর থেকে বাইরে আনবার আগে উমাপ্রসাদের স্ত্রী এলেন। মৃতদেহের দু-পায়ে মুখ ঢেকে মিনিট দুই তিনি চুপচাপ রইলেন। তারপর খুব আস্তে-আস্তে বললেন, “এই ঘরে তুমি আমাকে প্রথম এনেছিলে, এই ঘরে তোমার সঙ্গে প্রথম এসেছিলুম।” আর কোনও কথা বললেন না। যখন মুখ তুললেন সমস্ত শরীর তাঁর কেঁপে-কেঁপে উঠছে।

আর দেরি করা ঠিক নয়। নির্মল ইসারা করলো রামহরিকে। তারপর তারা দু-জনে বিছানাশুদ্ধ মৃতদেহকে তুলে বেরিয়ে এলো। সিঁড়ি

দিয়ে নামবার সময় নির্মলকে উমাপ্রসাদের স্ত্রী বললেন, "দ্যাখ নিমু, যেন জোরে হরিবোল দিস না। মা শুনতে পাবেন। আর উনিও মোটেই পছন্দ করতেন না।"

"তাই হবে জ্যাঠামা, আপনি ভাববেন না," বললো নির্মল।

"না বাবা, আর ভাববো না। আমার সমস্ত ভাবনা আজ শেষ হোলো। শুধু দেখিস শেষ-কাজটা যেন ঠিকমতো হয়। নিখিল পারবে তো? নইলে দিলীপ রইলো। সে ছেলেমানুষ। তাকে দেখিস।"

দোতালা দিয়ে নামবার সময় তারা শুনতে পেলো বৃদ্ধা বলছে "হ্যাঁরে, কিসের গোলমাল রে? উমি ফিরলো বৌ নিয়ে?"

কেউ উত্তর দিলো না। তাড়াতাড়ি নেমে এলো।

পথে নেমে নির্মল দেখলো লণ্ঠন নিয়ে নিধি দাঁড়িয়ে আর রিক্সায় বসে নিখিল একটা সিগারেট ধরিয়েছে। তাদের দেখে মুখ থেকে সিগারেট নামিয়ে নিখিল অকস্মাৎ বিকৃত কণ্ঠে চীৎকার করে উঠলো, "বল হরি, হরিবোল।"

"এই চুপ-চুপ," রামহরি আর নির্মল একই সঙ্গে প্রায় চীৎকার করে উঠলো, "তোমার কি মাথার ঠিক নেই? ঠাকুমা-র কানে গেলে তিনি যে এক কাণ্ডই বাধিয়ে বসবেন!"

"ধুত্তোর ঠাকুমা!" সিগারেটে টান দিয়ে বললো নিখিল, "হরিবোল না দিলে বাবা যে স্বর্গে যাবেন না!"

রামহরি বললো, "চলো নিমুদা, আর দাঁড়ানো নয়," তারপর বিড়বিড় করে বললো, "বাপের ওপর ভক্তি বটে।"

তখনো তারা গলির মোড় পর্যন্তও পৌঁছোয়নি, অকস্মাৎ সমস্ত অন্ধকার আর নিস্তব্ধতা কাঁপিয়ে একটি মেয়ে কেঁদে উঠলো। আশে-পাশের বাড়ির দেওয়ালে ধাক্কা লেগে সে-কান্না যেন পথ-হারিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

"কে কাঁদছে ? জ্যাঠামা ?" নির্মল বললো আশ্চর্য হয়ে, "কিন্তু একি তাঁর স্বর ?"

রামহরি বললো, "বোধ হচ্ছে তো তাঁরই। যাক, কাঁদা ভালো ! তিনি যে-রকম নিজেকে সামলে ছিলেন আমার তো ভয় হয়ে গিয়েছিলো।"

নিখিলকে দিয়েই মুখাগ্নি করানো হোলো। বেশ খুসি-খুসি তার হাব-ভাবখানা। চারিদিকে ঘন অন্ধকার। একদিকে ধূ-ধূ করে চিতা জ্বলছে। রামহরির দলের জন্যে নিখিল দু-টিন সিগারেট আনিয়ে দিয়েছিলো। কিছুদূরের বেঞ্চিতে বসে তারা আড্ডা দিচ্ছে আর সিগারেট টানছে। নির্মল বসেছিলো ঘাটের সিঁড়িতে। তখন সাড়ে তিনটে। একপাশে দু-জন ডোম ছেঁড়া কাপড় মুড়ি দিয়ে নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমুচ্ছে। হু-হু করে হাওয়া বইছে। দুটি কক্ষ্যচ্যুত তারার মতো এয়ারোপ্লেনটা ঘুরে বেড়াচ্ছে আলো জ্বালিয়ে। ঘাটের কাছ দিয়ে জলপুলিশের মোটরলঞ্চটা চলে গেলো।

"কখন শেষ হবে রে ?" নিখিল প্রশ্ন করলো রামহরিকে।

"সে-কথা বলা যায় নাকি ? তিন ঘণ্টাও লাগতে পারে।" বললো রামহরি।

নিখিল রেগে বললো, "কেউই ঠিক করে বলতে পারেন না ! ডাক্তারকে জিগগেস করলুম বাবা কতদিন বাঁচবে, তিনি বললেন দু-ঘণ্টাও হতে পারে—ছ-মাসও হতে পারে।"

রামহরিও গরম হয়ে উত্তর দিলো, "কি করবো বলো নিখিলদা ; তোমার মেজাজ বুঝে তো লোক মরবে না বা মড়া পুড়বে না !"

"হুম," একটা শব্দ করে নিখিল গুম হয়ে বসলো নির্মলের পাশে। সিগারেটের টিনটা নির্মলের দিকে বাড়িয়ে বললো, "তুই আর কতক্ষণ থাকবি?"

"শেষ পর্যন্তই থাকবো," বললো নির্মল।

আর বিশেষ কোনো কথা হোলো না। গঙ্গার ছোটো-ছোটো ঢেউ ঘাটে ছলাৎ-ছলাৎ শব্দ করতে লাগলো।

তারা যখন বাড়ি ফিরলো সবে তখন সূর্য উঠছে। ভিজে-কাপড়ে বেশ শীত করছিলো নির্মলের।

যত তারা বাড়ির কাছে আসতে লাগলো ততই স্পষ্ট হতে লাগলো একটি মেয়ের কান্না। তারা ধরে নিয়েছিলো উমাপ্রসাদের স্ত্রী-ই বুঝি কাঁদছেন। কিন্তু উঠোন পেরিয়ে উপরে চেয়ে নির্মল দেখলো অনেক লোক তিনতলায় ভিড় করে দাঁড়িয়ে। সবাই তারা কাঁদছে। আর তাদের মধ্যে সবচেয়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে উমাপ্রসাদের বৃদ্ধা মাকে। কাশ-ফুলের মতো শাদা চুল, গায়ের রঙ দুধে-আলতামেশানো আশ্চর্য গোলাপী। বারান্দার রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে কচিছেলের মতো হাউ-হাউ করে তিনি কাঁদছেন। অত্যন্ত স্বাভাবিক ম-ায়ের মতো তাঁর কান্না।

নিখিলের স্ত্রীকে সামনে পেয়ে নির্মল জিগগেস করলো, "ব্যাপার কি বৌদি? ঠাকুমা এলেন কী করে? কে-ই বা ওঁকে বললো?"

"কি জানি ভাই," তিনি বললেন, "বাড়ি থেকে বেরিয়ে তোমাদের মধ্যে বিকট জোরে কে যেন 'হরিবোল' দিলো আর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ওঁর গলা আমরা পেলুম। আমরা বেরিয়ে দেখি ঘরের দরজা খুলে শ্বশুরের নাম করতে-করতে পাগলের মতো আলু-থালু হয়ে তিনি ওপরে

উঠে আসছেন। প্রথমেই মা'কে জিগগেস করলেন, 'উর্মি কোথায় বৌমা?' তাঁর গলার স্বর শুনে আমরা চমকে উঠলুম। একেবারে সহজ মানুষের মতো তাঁর গলা! আমরা কেউ তাঁর কথার উত্তর দিলুম না। কত্তামা বললেন, "ও বুঝেচি। উর্মি আর নেই। আমাকে ফেলে সে চলে গেলো। তাকেই বুঝি ফুল দিয়ে সাজিয়ে ওরা নিয়ে গেলো?"—তারপর থেকে সেকি কান্না ঠাকুরপো, যদি দেখতে! শ্বশুরের ছেলে-বেলাকার কত কথা বলছেন আর যত বলছেন তত কাঁদছেন। কে বলবে ওঁর মাথা খারাপ!"

যে ডাক্তার উমাপ্রসাদের চিকিৎসা করতেন রাত্রে তাঁকে পাওয়া যায়নি। রোগী দেখতে শ্রীরামপুরে গিয়েছিলেন। ভোর-রাত্রে ফিরে খবর পেয়েই এসেছেন। তিনি ভালো করে বৃদ্ধাকে লক্ষ্য করছিলেন। নির্মলকে বললেন, "ওঁর জন্যে ভাববার কিছু নেই। কাঁদতে দিন। খুব সম্ভব এটা স্থায়ী হবে না—টেম্পোরারি স্যানিটি।"

বদ্যিনাথবাবু তখনো এক পাশে বসেছিলেন। বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, "দেখেছো, how death has chosen the wrong person!"

বউগাছ

অণিমার স্বামী অনেক দিন থেকে বাড়ি বদল করবে-করবে করছিলো। ছেলেটি মারা যাবার পরেই আর দেরি না করে তারা সত্যিই বাড়ি বদল করলো।

দমদমে নতুন একটি কলোনি গড়ে উঠেছে। এ-বাড়িটি সেখানেই। নতুন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দোতলা একটি বাড়ি। সামনে ও পিছনে বেশ খানিকটা জমি সবুজ কাঁচা বাঁশের বেড়া দেওয়া। বাড়িওলা ভদ্রলোকটি রিটায়ার্ড সরকারি চাকুরে। সমস্ত জীবনের সঞ্চিত টাকা দিয়ে দুটি বাড়ি করেছেন। একটিতে নিজে থাকেন, অন্যটি ভাড়া দেন। প্রৌঢ় ভদ্রলোক। অণিমাকে বললেন, "মা লক্ষ্মী! সামনের দিকটায় বাগান কোরো, পেছনের জমিতে শাক-শবজি লাগিও। পেছনে ছোটো একটা পুকুরও আছে। সেখানে বাচ্চা-বাচ্চা পোনা ছেড়ো, হাঁস-মুর্গিও পুষো। আজকাল যা ডিমের দর!"

পুরুষোত্তম নীচে মালপত্র নামাচ্ছিলো। কি নিয়ে কুলিদের সঙ্গে তার সামান্য বচসাও হচ্ছিলো। সেখানে অণিমা দাঁড়িয়ে কী করবে? ভাবলো, দোতলটা একবার ঘুরে দেখে আসি। নতুন বাড়ির দেয়ালে-ঘরে কাঁচা চুণ আর রঙের গন্ধ। সেই গন্ধভরা কয়েকটা ঘর পেরিয়ে অণিমা লাল সিঁড়ি পেলো। অল্প-অল্প ধুলো পড়েছে। তরতর করে সে উঠে এলো দোতলায়। আর উপরে উঠে একটু হাঁপাতে-হাঁপাতে যেন তার মনে হোলো একটি ছোটো ছেলেও তার পিছন-পিছন উঠে এসেছে: মোটাসোটা, একমাথা চুল, টলে-টলে হাঁটে। মনে হতেই সমস্ত রক্ত

তার বুকে এসে যেন ধাক্কা মারলো। কে এলো, টুলটুল নাকি? সিঁড়ির রেলিঙের উপর এক-বুক ঝুঁকে অণিমা নীচের দিকে চাইলো। একতলার বন্ধ বারন্দাটা দেখা যায়। আসলে সেটাও একটা লম্বা ঘরের মতো। কোনের দিকে মাত্র একটি জানালা খোলা থাকায় সেখানে পরিষ্কার আলো নেই। সেই ঝাপসা আলোয় অণিমার মনে হোলো একটি ছোট্ট ছেলের ছায়া যেন টলতে-টলতে বাইরে চলে যাচ্ছে।

ততক্ষণে তার বুকের দুরন্ত কাঁপুনি কমে এসেছে। সিঁড়ি থেকে সরে সে উপরের ঘরগুলি দেখতে লাগলো। মাঝারি সাইজের দুটি ঘর। দুটিকেই শোবার ঘর করা যেতে পারে। তা-ছাড়া ছোটো একটি বাথরুম আর আরো ছোটো একটি ঘর—সেখানে বাক্স-প্যাটরাগুলো গুছিয়ে ফেলতে হবে। বড় দুটি ঘরের মধ্যে যেটা উত্তরদিকের সেটা পড়লো বাড়ির পিছনে। এ-বাড়িটা দক্ষিণমুখো। এই পিছনের ঘর দিয়ে পুকুর-টুকুর দেখা যাবে নিশ্চয়ই। অণিমা একে-একে জানালা দরজাগুলো খুলতে-খুলতে উত্তর দিকের ঘরটাতে এলো, আর এ-ঘরের জানালাটা খুলতেই হু-হু করে হাওয়া গেলো বয়ে। চমৎকার দেখা যায়: পুকুরটা খুব এমন ছোটো নয়। জলটাও বেশ পরিষ্কার, সামনের ঘাটটা বাঁধানো। পুকুরটার উল্টো দিকে এক বিরাট বটগাছ, অনেকগুলো ঝুরি নেমেছে। সেই বটগাছের ওপাশ দিয়ে সবুজ কাঁচাবাঁশের বেড়াটা চলে গেছে। অনেক শুকনো পাতা গাছের তলায় জমা হয়েছে, আগাছার সংখ্যাও অল্প নয়। আহা, টুলটুল বেঁচে থাকতে-থাকতে তারা যদি এ-বাড়িটায় উঠে আসতো। কলকাতার ফ্ল্যাটের সেই আঁটসাঁট দম-বন্ধ-করা ঘরগুলোয় বেচারা ভালো করে যেন নড়তে-চড়তেই পারতো না। এখানে কত জায়গা। এ-ঘর থেকে ও-ঘরে টুলটুল ছুটে বেড়াতো, হাঁটতে তো শিখেইছিলো। ওই বটগাছের ডালে অণিমা দোলনা খাটিয়ে দিতো। শুধু এই পুকুরটার জন্যেই ভাবনা। যা দুরন্ত ছেলেটা। কখন যে

আবার চোখে ধুলো দিয়ে এই পুকুরঘাটে চলে আসতো কে জানে! ভাবতে-ভাবতে ভয়ে তার বুকের ভিতরটা যেন শুকিয়ে এলো। তারপরেই পুরুষোত্তমের স্বর শুনে মনে পড়লো টুলটুল তো বারো দিন আগে মারা গেছে।

"এখন কি আর জানলায় দাঁড়িয়ে দেখবার সময় আছে অনু?" একটু অনুযোগের সুরেই সে বললো, "রান্নাঘর ভাঁড়ারঘর গুছোতে আরম্ভ করে দাও। আমি কুলিদের দিয়ে খাট-বিছানা-বাক্স সমস্ত তোলাচ্ছি। এককড়েটা দারুণ ফাঁকিবাজ। এখানে এসেই উড়েছিলো। সেটাকে ছেড়োনা। খুঁটিনাটি সমস্ত কাজে তোমাকে সাহায্য করবে।" তারপর জানালার কাছে এসে বললো, "বাঃ, চমৎকার বাড়ি। কলকাতায় পঞ্চান্ন টাকা মাসে-মাসে দিয়ে এতোদিন যেন সিন্ধুকে বন্ধ থাকতুম। এতো বড় বাড়ি, জমি, পুকুর—অথচ ভাড়া মাত্র পঁয়তাল্লিশ। খুব ভালো পাওয়া গেছে, নয়?"

স্বাভাবিক সুরেই অণিমা বললো, "তা তো বটেই। কিন্তু রান্নার যোগাড় করবো তো কয়লা-টয়লা আছে? নতুন উনুন পাতানো হয়েছে?"

"ওই ত্যাখো। আসল কথাটা বলতেই ভুলে গেছি। আজ সকালে সুরেশবাবুর ওখানে নেমন্তন্ন। বাস্তবিক, এমন বাড়িওয়ালা পাওয়াও খুব কম ভাগ্যের কথা নয়। চমৎকার লোক। কাছেই তাঁদের বাড়ি। একবাড়ি লোকজন, ছেলেপুলে, কাচ্চাবাচ্চা। সুরেশবাবুর বড় ছেলেটি আমার বয়েসি: তার বৌ তোমার চেয়ে হয়তো কয়েক বছরের বড়। তিমধ্যেই তিনটি বাচ্চা। যাক, তোমাকে আর সমস্ত দিন একা-একা থাকতে হবে না। আমি আপিস চলে গেলে দুপুরটা ও-বাড়িতেই থাকতে পারো। সুরেশবাবুও সেই কথা বলছিলেন।"

সমস্ত দিন ঘর-দোর গুছিয়ে সন্ধের মুখে পুরুষোত্তম গেলো পাড়ায়

আলাপ করতে। যাবার সময় অণিমাকে গা ধুয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে নিতে বলে গেলো। এককড়েটাও স্থবিধে বুঝে অণিমার কাছে এসে বললো, "বৌদি, আমি বাজারটা একবার ঘুরে দোকান-টোকান চিনে আসি।"

"চট করে আসিস," বললো অণিমা, "আর দুটো দেশলাই, এক বোতল কেরাসিন তেল, বাবুর জন্যে পাঁচ প্যাকেট সিগারেট আর এক ডজন কাপড়কাচা সাবানও আনিস। মনে থাকবে তো? এই নোটটা ভাঙিয়ে জিনিসগুলো কিনিস।"

সমস্ত দিন কাজের তাড়ায় অণিমা নিশ্বেস ফেলতে পারেনি। গা ধুতে যাবার আগে কি মনে করে সে আবার এলো সেই উত্তর দিকের ঘরটায়, আর খোলা জানালা দিয়ে ঝুরি-নামা বটগাছের দিকে চেয়ে, কি আশ্চর্য, মুহূর্তের মধ্যেই সে সব কিছু ভুলে গেলো! তাড়াতাড়ি গা ধুয়ে, ঘরে ধুনো দিয়ে এখুনি যে রান্না চড়ানোর কথা! কী করে যে সে ভুলতে পারলো সেইটাই আশ্চর্য। সে শুধু দেখতে লাগলো। সূর্যাস্ত হয়ে গেছে। পুকুরের স্থির জলে এখনো আকাশের আলো আয়নার মতো চকচক করছে। শুধু বটগাছটার তলায় মাঝে-মাঝে অন্ধকার। সেদিকে চেয়ে থাকতে-থাকতে অণিমার মনে হোলো আলোর শাদা রঙ দ্রুত বদলে যেন একটা অস্পষ্ট নীল-সবুজ মেশানো রঙ হোলো। সন্ধের হাওয়ায় হাজার-হাজার পাতা কাঁপছে। আর যে ডালটায় অণিমা সকালে ভেবেছিলো টুলটুলের দোলনা খাটানোর কথা, ঠিক সেই ডালটারই তলায়, একটি ছোটো ছেলে খালি গায়ে তার দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে যেন ধুলো নিয়ে খেলছে। এতোদূর থেকে খুব ভালো বোঝা যায় না, তবু এক রকম স্পষ্টই অণিমার মনে হোলো ছেলেটি আর কেউ নয়, তার টুলটুল! সেই অস্পষ্ট নীলচে-সবুজ আলোয় সব কিছুই বিশ্বাস করা যায়। অণিমা মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার পিপাসিত চোখ মেলে দেখতে লাগলো, একটা

অব্যক্ত আনন্দে আর বেদনায় যেন বুকের কাছটা উঠলো টাটিয়ে। টুলটুল তা হলে চলে যায়নি, টুলটুল তা হলে তার সঙ্গে-সঙ্গে এই নতুন বাড়িতে এসেছে! কী করে সে এলো: আহা, তার নরম পায়ে কাঁকর ফুটে হয়তো কেটে গেছে! সেই জানালায় দাঁড়িয়ে অণিমা দেখতে লাগলো: টুলটুলের খেলা আর শেষই হয় না। কতক্ষণ অণিমা দাঁড়িয়েছিলো নিজেই সে জানে না। হঠাৎ পুরুষোত্তমের স্বর শোনা গেলো। টুলটুলও বোধ হয় শুনতে পেয়েছিলো। খেলা ফেলে ঘাড় ঘুরিয়ে অণিমার দিকে সে চাইলো, তারপর ফিক করে হেসে বটগাছের ভিতরে, যেখানে ইতি-মধ্যে অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে, সেখানে যেতে-যেতে যেন মিলিয়ে গেলো!

পুরুষোত্তম ফিরে এসে খুব রাগারাগি করলো। আটটা বাজে, অথচ অণিমার এখনো গা ধোয়াই হয়নি, রান্না চড়ানো তো দূরের কথা। তারপর হঠাৎ অণিমার চোখের দিকে চেয়ে জিগগেস করলো, "ওকি, চোখ দুটো লাল কেন? জ্বর হয়নি তো?"

সকাল পৌনে ন'টার মধ্যেই স্নান সেরে দুটো ভাতে-ভাত মুখে দিয়ে পুরুষোত্তম মোড় থেকে বাস ধরে। পুরুষোত্তমের দুপুরে খাবার জন্য অণিমা লুচি-তরকারি ছোটো টিনের কৌটোটায় ভরে দেয়। তারপর আর কোনো কাজ থাকে না। পুরুষোত্তমের ফিরতে বেশ রাত হয়। একে তাদের আপিসে কোনো দিনই সাতটার আগে ছুটি হয় না, তার উপর এতো দূর আসতেও কম করে ঘণ্টাখানেক লাগে।

দুপুরে ঘুমুনো অণিমার অভ্যেস নেই। প্রথম কয়েক দিন তো গেলো পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করতেই। কিন্তু যতক্ষণ সে বাড়ির বাইরে থাকে একটা অদৃশ্য শক্তি যেন ক্রমাগত তাকে টানতে থাকে

বাড়ির দিকে। কেবলি তার মনে হয় টুলটুল তাকে খুঁজে না পেয়ে হয়তো এ-ঘর থেকে ও-ঘর ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর মাঝে-মাঝে হয়তো কাঁদছে।

সুরেশবাবুর স্ত্রী সেদিন জিগগেস করলেন, "তোমার ছেলেটি কত বড় হয়ে গেলো বৌমা ?"

প্রথমে অণিমা ভালো করে প্রশ্নটা বুঝতেই পারেনি। বুঝতে পেরে বুকটা হঠাৎ যেন ছ্যাৎ করে উঠলো, একটা অশুভ আশঙ্কায় মুখটা শুকিয়ে গেলো। টুলটুল তো ফিরে এসেছে! সে কি সত্যি ছেড়ে যেতে পারে ?

গিন্নির ছোটো নাতিটিকে কোলে তুলে আদর করতে-করতে সে উত্তর দিলো, "এই আষাঢ় মাসে তার দু-বছর হবে, মা।"

উত্তর শুনে গিন্নি একবার নিজের পুত্রবধূর দিকে চাইলেন, তারপর দীর্ঘনিশ্বেস ফেলে বললেন, "আহা বাছা, সবই কর্মফল। এই কচি বয়েসে এতোবড় শোক পেলে: কথায় বলে পুত্রশোক! আর একটি খোকা তোমার হোক মা!"

এ-সব কথা অণিমার ভালো লাগে না। যে-বাড়িতেই যায় এই ধরণের কথা তাকে শুনতে হয়। শুনতে-শুনতে এক-এক সময় সমস্ত ভিতরটা যেন হাঁপিয়ে ওঠে। নানা কাজের দোহাই দিয়ে সে ফিরে আসে। বাড়ি ফিরে সে যেন বাঁচে। এ-বাড়ির বাতাসে যেন টুলটুলের স্পর্শ জড়িয়ে রয়েছে। যেন সে এইমাত্র ছিলো, এইমাত্র চলে গেছে। এ-ঘর থেকে ও-ঘরে অণিমা বিনা কারণে ঘুরে বেড়ায়! শেষে উত্তর দিকের ঘরে এসে জানালা খুলে বসে।

সমস্ত দুপুর ধরে অল্প গরম হাওয়া বটগাছটার নতুন-পুরোনো হাজার-হাজার পাতা কাঁপিয়ে ঝিরঝির করে বয়ে যায়। একটা আশ্চর্য উদাস অথচ মধুর সুরে অণিমার সমস্ত মন ভরে ওঠে। বটগাছের দিকে

চাইতে-চাইতে তার যেন নেশা ধরে। জানালা ছেড়ে, হাজার তাড়া থাকলেও, সে উঠতে পারে না। চুপচাপ বসে থাকে। পুকুরে মাঝে-মাঝে একটা-দুটো মাছ টুপ-টুপ করে লাফিয়ে স্থির জলে গোল চক্র তুলে আবার গভীর জলে অদৃশ্য হয়। মাঝে-মাঝে একদল শালিখ বটগাছটায় উড়ে এসে বসে, খুব খানিক কিচকিচ করে আবার যায় উড়ে। মগডালে একজোড়া চিল থাকে। মাঝে-মাঝে তাদের ডাক সমস্ত দুপুরটাকে যেন চিরে ফেলে। অণিমা এ-সব দেখেও দেখে না, শুনেও শোনে না। সে শুধু অপেক্ষা করে থাকে: কখন সন্ধে হয়ে আসবে, কখন সেই নীলচে-সবুজ আলোয় পুকুরপাড় আর বটগাছের চুড়ো অপরূপ হয়ে উঠবে। ঠিক সেই সময়েই টুলটুল আসে। কোথা থেকে যে আসে অণিমা জানে না। হঠাৎ এক সময় দেখে তার দিকে পিঠ করে ধূলোয় বসে সে খেলা করছে। দুষ্টুমি করেই যেন অণিমার দিকে চেয়ে দেখে না। অণিমা তার হাবভাব দেখে স্পষ্টই বুঝতে পারে টুলটুল বেশ জানে তার মা দোতলার জানালা থেকে তার দিকেই চেয়ে আছে, সমস্ত দিন ধরে অপেক্ষা করে আছে তারই জন্যে। বটগাছের তলাকার শুকনো পাতার উপর, সেখানকার নীলচে-সবুজ আলোছায়ায় টুলটুল কিন্তু নিজের মনেই ধূলো-বালি নিয়ে খেলে যায়। আর অপরূপ এক আনন্দ-বেদনায় অণিমার সমস্ত শরীরটা সিরসির করতে থাকে, যেন খুব মৃদু বিদ্যুৎপ্রবাহ তার শরীর দিয়ে মাটিতে নেমে যাচ্ছে। কতক্ষণ যে এইভাবে বসে থাকে নিজেই সে জানে না। হঠাৎ এক সময় পুরুষোত্তমের গলার স্বর শোনা যায়। এককড়ের হাতে কলকাতা থেকে কিনে আনা কখনো মাছ, কখনো চা-চিনি-বিস্কুট, কখনো বা জামা-কাপড়-গামছা দিয়ে জুতোর মসমস শব্দ করতে-করতে উঠে আসে। তার পায়ের শব্দ টুলটুল অতদূর থেকেও ঠিক শুনতে পায়। ঘাড় ফিরিয়ে একবার সে জানালার দিকে চেয়ে ফিক করে হাসে, তারপর গাছটার ভিতর দিকে ঘন অন্ধকারে

টলতে-টলতে এগিয়ে গিয়ে মিলিয়ে যায়। শুধু কয়েকটা জোনাকি দপ-দপ করে গাছতলায় জ্বলতে থাকে আর অণিমা আশ্চর্য হয়ে দেখে সেই নীলচে-সবুজ কালো কখন মিলিয়ে গিয়ে চারদিক ঘন অন্ধকারে ঢেকে গেছে। দাঁড়িয়ে উঠে কি রকম যেন দুর্বল-দুর্বল লাগে। এখনো তার গা ধোয়া হয়নি দেখে পুরুষোত্তমের কাছে বকুনি খাবার ভয়ে রীতিমতো সে শঙ্কিত হয়ে পড়ে। তাড়াতাড়ি জলের ঘরে ঢুকে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়।

দিনের পর দিন এইভাবেই কাটতে লাগলো। টুলটুল যে মরে যায়নি, সে যে এখনো বেঁচে আছে, তাকে যে অণিমা প্রত্যহ দেখতে পায়—এই কথাগুলো পুরুষোত্তমকে কতবার বলতে গিয়ে অণিমা থেমে গেছে। কী ভাবে এই সহজ কথাটা যে বলবে সে বুঝতে পারে না। এক-একবার ইচ্ছে করে লুকিয়ে-লুকিয়ে পুরুষোত্তমকে দেখিয়ে দিতে। কিন্তু টুলটুল যা চালাক, তাকে ফাঁকি দেওয়া তো আর সহজ নয়। অণিমার চালাকি ধরে ফেলে রাগ করে সে যদি আর না আসে!

সেদিন পুরুষোত্তম আপিস থেকে এসে বললো, "জানো অণু, একটা অঘটন ঘটেছে। সোমবার দিনটা হঠাৎ ছুটি পাওয়া গেছে। রোববার সকালে আমরা বাগবাজারে মাসীমার কাছে যাবো। সেখানে রোববারটা থেকে সোমবার রাত্রে ফিরবো। তোমার তো অনেকদিন কলকাতায় যাওয়া হয়নি। রোববারে বরঞ্চ একটা কিছু বাংলা সিনেমা-টিনেমা দেখা যাবে।"

পুরুষোত্তম ভেবেছিলো অণিমা এ-খবরে খুব খুসি হয়ে উঠবে। কিন্তু অণিমার ভাব-ভঙ্গিতে কোনো উৎসাহ না পেয়ে বললো, "কী হোলো, ইচ্ছে করছে না?"

ভয়ে-ভয়ে অণিমা বললো, "না-না তা নয়। তবে আবার ও-সব হাঙ্গামা করা কেন? অনর্থক বাজে পয়সা নষ্ট। এই তো বেশ আছি।"

কিন্তু পুরুষোত্তম কোনো ওজর-আপত্তি শুনলো না, রবিবার সকালে অণিমাকে নিয়ে কলকাতায় চলে এলো। বিকেলে তারা মাসীমার ছেলেমেয়েদের নিয়ে দল বেঁধে সত্যি-সত্যিই দেখে এলো একটা বাংলা ছবি। ফিরতি পথে মিনু জিগগেস করলো, "কী রকম লাগলো বৌদি?"

অণিমা বললো, "আমি ভাই ভালো করে দেখতে পাইনি। অভ্যেস নেই তো! মাথাটা বড্ড ধরেছে আর চোখ জ্বালা করছে।"

"ওমা, সে কি কথা বৌদি! এই ক-মাস বাইরে থেকে যে একেবারে পাড়াগেঁয়ে হয়ে গেলে!"

বাস্তবিক, সিনেমা-ঘরের সেই অস্পষ্ট আলোছায়ায় অণিমা শুধু সেই বটগাছটাকেই দেখেছে যেখানে সন্ধের নীলচে-সবুজ আলোয় টুলটুল প্রত্যহ তার দিকে পিঠ করে খেলা করে। আজ অণিমাকে না দেখে সে হয়তো কত রাগ করবে, হয়তো কাঁদবে!

দমদমে সোমবার তারা রাতকরেই ফিরলো। অণিমা অন্ধকারে জানালা খুলে অনেকক্ষণ রইলো দাঁড়িয়ে। কতকগুলো জোনাকির সবুজ আলো ছাড়া আর কিছুই দেখা গেলো না। বাঁকানো এক ফাঁলি চাঁদ বটগাছের ওপাশে হেলে পড়েছে। আর রাত্রের হাওয়ায় একটা ঝাঁকড়া-চুলো দৈত্যের মতো বটগাছটা শুধু মর্মর শব্দ করে কাঁপছে।

পরের দিন পুরুষোত্তম আপিস চলে যাবার পরেই তাড়াহুড়ো করে সংসারের কাজ শেষ করে হাঁড়িতে যতটা ভাত আর হেঁসেলে যত তরকারি ছিলো সমস্তই এককড়ের জন্যে বেড়ে দিয়ে অণিমা জানালায় এসে বসলো।

খাবার প্রবৃত্তি তার নেই। দুপুরে পাড়ার কয়েক বাড়ির মেয়েরা এসেছিলো। তাদের ইচ্ছে ছিলো বেশ জাঁকিয়ে বিন্তি খেলা হয়। কিন্তু শরীরটা ভালো নেই বলে তাদের সবাইকেই অণিমা বিদায় দিলো। তারপর বটগাছটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো বসে।

বোধ হয় তার তন্দ্রা এসেছিলো। কতক্ষণ সে তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিলো জানে না, হঠাৎ ধড়মড় করে জেগে উঠলো। কে যেন তার কানে-কানে ফিসফিস করে ডাকলো! জেগে উঠে অণিমা দেখলো বাইরে সেই আশ্চর্য নীলচে-সবুজ আলো, আর বটগাছের আলোছায়ায় টুলটুল। সে খেলছে না। গালে একটা হাত দিয়ে চুপ করে বসে রয়েছে। আজ আর অণিমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে নয়, পাশ ফিরে। তার মুখটা এইভাবে দেখতে সবচেয়ে ভালো লাগতো অণিমার। হঠাৎ সে-কথা মনে পড়লো।

এমন সময় সিঁড়িতে পুরুষোত্তমের পায়ের শব্দ গেলো শোনা, আর টুলটুলও উঠলো দাঁড়িয়ে। আজ সে হাসলো না, আজ যেন অনেকটা ক্লান্ত পায়ে ধীরে-ধীরে চলে গেলো। যাবার আগে একবার তার বড়-বড় কালো-কালো চোখ দুটো তুলে অণিমার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে শুধু চেয়ে দেখলো।

অণিমাকে দেখে পুরুষোত্তম বললো, "তোমার অসুখ করেছে নাকি? মুখচোখ এ-রকম শুকনো কেন! জ্বরটর হয়নি তো?"

ক্লান্ত ভাবে দাঁড়িয়ে উঠে অণিমা বললো, "কি জানি! শরীরটা ভালো লাগছে না।"

সেই রাত্রেই খুব জ্বর হোলো অণিমার। সমস্ত রাত অস্বস্তিতে ছটফট করলো। সকালেই পুরুষোত্তম ছুটলো ডাক্তারের খোঁজে।

ভালো করে পরীক্ষা করে একটা প্রেসক্রপসন লিখে ডাক্তার বাইরে এলো। পুরুষোত্তমকে বললো, "ভয়ের কিছু নেই, সাধারণ ইনফ্লুয়েঞ্জা। তবে এই অবস্থায় ফ্লু হওয়া ভালো নয়।"

"এই অবস্থায় মানে ?" বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলো পুরুষোত্তম।

আরো বিস্মিত হয়ে ডাক্তার বললো, "কেন, আপনি কি জানেন না আপনার স্ত্রী প্রেগ্‌ন্যাণ্ট ?"

সেদিন বিকেলেই জ্বর কমে গেলো অণিমার। সন্ধের মুখে চুপিচুপি জানলায় এসে বসলো। দেখলো আশ্চর্য ব্যাপার। বিরাট বটগাছটা দড়ি দিয়ে নানাভাবে জড়ানো। কুড়ুল-করাত দিয়ে রাশিরাশি ডালপালা কাটা হয়েছে আজকের দিনের মধ্যেই। অনেক কুলি মজুরের ভিড়। তারা সন্ধের মুখে কাজ সেরে বাড়ি ফিরছে। আর সেই নীলচে-সবুজ আলোয় অণিমার মনে হোলো দূরের রাস্তায় যেন একটি ছোট্ট ছেলে ছলছল চোখে কাটা-গাছটার দিকে চেয়ে রয়েছে দাঁড়িয়ে। আজ সে অণিমার দিকে ফিরেও দেখলো না। সুরকির পথ ধরে টলতে-টলতে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো।

তাকে জানালার কাছে বসে থাকতে দেখে পুরুষোত্তম খুব রাগ করলো। বললো, "তোমার কি একটা কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই ? অসুখের উপর এখানে উঠে এসেছো !"

বিছানায় ফিরে যেতে-যেতে ধরা-গলায় অণিমা বললো, "রাগ কোরো না গো, লক্ষ্মীটি ! আমি এক্ষুনি শুতে যাচ্ছি। কিন্তু বটগাছটা ওরা কাটছে কেন ?

"ওখান দিয়ে টেলিগ্রাফের তারটার যাবে নাকি পোস্ট পুঁতবে—সুরেশবাবু বলছিলেন।" বিরক্ত হয়ে বললো পুরুষোত্তম, "কিন্তু তুমি আর উঠোনা। চুপ করে শুয়ে থাকো।"

বিছানায় ফিরে উপুড় হয়ে অণিমা ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো। এমন কান্না সে জীবনে কাঁদেনি। সবাই যেন ষড়যন্ত্র করে তার কাছ থেকে টুলটুলকে চিরকালের জন্যে ছিনিয়ে নিচ্ছে। টুলটুলের ছলছলে চোখ আর ক্লান্ত ভঙ্গিটির কথা ঘুরেঘুরে কেবলি তার মনে পড়তে লাগলো।

টুলটুলকে আর কোনোদিন সে দেখতে পাবে না। কয়েকদিনের মধ্যেই পৃথিবী থেকে সেই বিরাট বটগাছের অস্তিত্ব লুপ্ত হবে যার নীলচে-সবুজ আলো-অন্ধকারে টুলটুল এতোদিন খেলা করে এসেছে।

মানুষ থেকে দেবতা পর্যন্ত ষড়যন্ত্র করেছে আজ টুলটুলের বিরুদ্ধে। অণিমাকে নিংড়ে নতুন একটি জীবন পৃথিবীতে আসছে। কত প্রাচীন একটি বটগাছকে নিশ্চিহ্ন করে টুলটুলকে তারা দূর করে দিচ্ছে।

উপুড় হয়ে ফুলে-ফুলে অণিমা কাঁদতে লাগলো। এমন কান্না টুলটুলের মৃত্যুর দিনেও সে কাঁদেনি। কারণ সত্যিই তখন সে বিশ্বাস করতে পারেনি টুলটুল মারা গেছে। আজ তার কাছে সত্যিকারের মৃত্যু হোলো টুলটুলের।

টি-বি

"ছাখো না", ট্রেন ছাড়তে সুধাময় বললো, "দেওঘর তোমার খারাপ লাগবে না।"

"আর খারাপ লাগলেই বা উপায় কি?" একটু ঝাঁঝাঁলো গলায় বিশাখা উত্তর দিলো। "আমাদের আবার ভালো-লাগা খারাপ-লাগা। বাঁদীর জীবন। ঝি রাখতে পয়সা লাগে, তাই বিয়ে করে ফেলো একটা। দু-বেলা দু-মুঠো খেতে দিলেই ব্যাস : মর মাগী তুই খেটে!"

আর কোনো কথা বলা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না, সুধাময় জানে। গলার সুর ক্রমশ সরু আর শানানো হয়ে উঠবে। কামরার যতগুলো জীবন্ত চোখ নিঃশব্দে তাদের দিকে ফিরে বিনা-পয়সার মজা ভোগ করবে। কথা না-বলাই ভালো, বিগত জীবনের অভিজ্ঞতা ঐ-কথাই মনে করিয়ে দিলো সুধাময়কে আর সে, হঠাৎ যেন দরকারি একটা খবর মনে পড়েছে এই ভাব দেখিয়ে, টাইম-টেবিল খুলে বসলো।—কিন্তু দেওঘর না গিয়ে উপায়ই বা কি! গত দু-তিন বছর সেখানে যাওয়া হয়নি। ইসমাইল লিখেছে কতকগুলো ঘর এবার সারানো দরকার। পশ্চিমের পাঁচিলটাও প্রায় মাটিতে এসে মিশেছে। তা-ছাড়া, সামনের দিকে আরো কয়েকটা ঘর তুললে অনেক বেশি ভাড়া পাবার সম্ভাবনা আছে। এই দুর্দিনে দু-পয়সা বেশি কে না চায়?

বিশাখাকে এ-সব কথা বোঝানো আর যারই পক্ষে সম্ভব হোক না কেন, সুধাময়ের পক্ষে নয়। তার নিজের মতটাই প্রধান ও চরম যুক্তি। সুধাময়ের শ্বশুরবাড়ির সবাই এবার গোপালপুরে যাচ্ছে।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত ঠিক ছিলো তারাও সেখানে যাবে। কিন্তু তারপরেই এলো ইসমাইলের চিঠি আর সুধাময় ভেবে দেখলো, এই পূজোর ছুটিতে দেওঘর গিয়ে নিজেদের বাড়িগুলোর সংস্কার না করলে আবার সময় পাওয়া কঠিন। আর তা-ছাড়া কি-ই বা এমন খারাপ জায়গা দেওঘর ? কত লোকেই তো সেখানে বেড়াতে যাচ্ছে। তাদের বিগত বিবাহিত জীবনের অনেক দিন তো দেওঘরেই কেটেছে। টাইম-টেবিলের অঙ্ক আর ইস্টিশানের নামের উপর চোখ রেখে আজ হঠাৎ সুধাময় দার্শনিক হয়ে উঠলো : কত তাড়াতাড়ি পৃথিবী তাদের কাছে রঙ বদলাচ্ছে ! সে যেন বৈজ্ঞানিক, অনেক দূরে বসে টেলিস্কোপের মধ্যে দিয়ে মঙ্গলগ্রহকে দেখছে। এইতো সে-দিনও সেখানে কমলালেবুর রঙ ছিলো, আজ গেলো কোথায় ?

সবদিক দিয়ে দেখলে দেওঘরই ভালো : মনে-মনে ভাবলো সুধাময়। ছুটিতে লোকে কেন দলবেঁধে বেরোয় ? মানুষ—বছরের বেশির ভাগ দিনগুলোই তো হিজিবিজি মানুষের ভিড়ে অসাড় হয়ে থাকে। সহরের চিড়িয়াখানায় পরিমিত জায়গায় ঘেঁষাঘেঁষি ঠাসাঠাসি করে কাটাতে হয়। মন বিষিয়ে ওঠে। ক্লান্ত লাগে। মানুষের কথা ভাবতে ক্লান্ত লাগে সুধাময়ের। তাই ছুটির সময় মানুষের সমুদ্র সাঁতরে কোনো নির্জন দ্বীপে উঠতে সে ভালোবাসে : যেখানে চেনা-লোক আর তৈলাক্ত মসৃণ কথার স্রোত স্তব্ধ হয়ে থাকে।

তাই দেওঘরই ভালো।

কিন্তু বিশাখাকে এ-কথা বোঝাবে কে ? গত কয়েকটা দিন সে বিষাক্ত ঘা-এর মতো কুৎসিত করে তুলেছে। সুধাময় একবার মত বদলেছিলো। যত ক্ষতিই হোক সে ঠিক করেছিলো গোপালপুরেই যাবে। বিশাখা কিন্তু বেঁকে বসলো। আশ্চর্য ! অল্প ভাবলেই কিন্তু আর আশ্চর্য মনে হয় না ; সে সুধাময়কে কথা-শোনাতে ভালোবাসে। এতো সহজে

তার কথা-শোনানো বন্ধ হবে এটা সে চায় না। দেওঘরেই তাই তারা যাবে।

কলকাতার জীর্ণ আকাশের আভাষ এখানে নেই। অনেক দূরে ট্রেন এসে পড়েছে। এখানকার আশ্বিনের ধারালো নতুন আকাশে শীতের সামান্য ছোঁয়া লেগেছে। মাঠে এখনো জল শুকোয়নি। সতেজ সবুজ ফসলের চারা।

আড়চোখে বিশাখার দিকে চেয়ে সুধাময় সিগারেট ধরালো। কামরার কোণের দিকে হেলান দিয়ে, বেঞ্চির উপর পা দুটো তুলে, জানালার বাইরে চেয়ে সিগারেটে টান দেওয়া সুধাময়ের কাছে চরম বিলাস। ভারি ভালোবাসে সে। শুধু বিশাখা যদি অতটা অবুঝ না হোতো!

ডিবে থেকে পান বার করলো বিশাখা। নিজে একটা নিলো, তারপর ডিবেটা ঠেলে দিলো সুধাময়ের দিকে। এটা শুভলক্ষণ, সুধাময় জানে। এখন তাকে শুধু আরও খানিক চুপ করে থাকতে হবে। তারপর ক্রমশ হয়তো কেটে যাবে বিশাখার মনের কুয়াশা।

উৎসাহিত হয়ে সুধাময় আর একটা সিগারেট ধরালো। কামরার মধ্যে এতোক্ষণে সবাই থিতিয়ে বসেছে। জীর্ণ দেহ, পাণ্ডুর ফ্যাকাশে চোখ: কত চাপা মানুষের ভিড়। আজ এই পূজোর ছুটিতে, কতদিন পরে আপিসের খাতা আর কলম থেকে চোখ তুলে এরা বাইরে চাইবার অবসর পেয়েছে। এই কটা দিনের ছুটি তাদের পাণ্ডুর দেহে আর ফ্যাকাশে চোখে যেন নতুন জীবনের পালিশ লাগিয়েছে। স্পষ্ট সে-কথা বোঝা যায়।

বিশ্বাস করা কঠিন এমন সুন্দর দিনে ট্রেনে করে যেতে কারুর খারাপ লাগে। কী করে খারাপ লাগতে পারে সুধাময় ভেবে কিনারা পেলো না। গোপালপুরই হোক আর দেওঘরই হোক, এই যাওয়াটাই তো

সবচেয়ে বড় কথা। এই যাওয়াটাই তো চরম আনন্দের, দুপাশের ক্ষেতে যখন সবুজ উদ্ধত চারা আর উপরে আশ্বিনের ধারালো নতুন আকাশ।

তবে বিশাখাকে সুধাময় অনেকটা চিনে ফেলেছে। তার মনের চামড়া বয়েসের ট্যানিন এ্যাসিডে শক্ত হয়ে গেছে। প্রকৃতির এই আশ্চর্য পরিবর্তন সেখানে আর সামান্যতম অনুভূতির ঢেউও তোলে না। স্থূল জিনিসের চাপে সে সুস্থ থাকে। সিগারেটে একটা দীর্ঘ টান দিয়ে সুধাময় ভাবলো বিশাখার সঙ্গে সমুদ্রের গভীরতম প্রদেশের জলজ জন্তুর একটা সাদৃশ্য আছে। তারা কখনো উপরে ভেসে ওঠে না, জলের চাপ কমলে তারা ফেঁপে ওঠে, ফুলে ওঠে, ফেটে যায়। বিশাখাও তাই। সংসারের স্থূল চাপের বাইরে সে আসতে চায় না। সে হাঁপিয়ে ওঠে নির্জনতা আর নিঃসঙ্গতা নিয়ে। এ-করণেই সে গোপালপুরে যেতে চেয়েছিলো, সেখানে বিরাট সংসার, প্রচুর হৈ-চৈ। সেখানে স্থূল সাংসারিক চাপ। সেখানে সে সুস্থ।

বিশাখা চুপ করে রয়েছে। সুধাময় ডিবে থেকে পান বার করলো। কায়দা করে এবার কথা আরম্ভ করলে ফল ভালো হতেও পারে। সুধাময় এখন ওস্তাদ বৈজ্ঞানিক হয়েছে : বিশাখার মতো জটিল আর সূক্ষ্ম যন্ত্রকে ঠিকমতো চালাবার কায়দা সে আয়ত্ত করে ফেলেছে। কখন কোন সময় কোন চাবি টিপতে হয় সে-কথা তার জানা।

"একটু চূণ দিতে পারো ?"

বিশাখা কাগজে-মোড়া শুকনো এক ঢেলা চূণ এগিয়ে দিলো।

"চা খেতে ভারি ইচ্ছে করছে। পরের ইস্টিশানে একবার খোঁজ করতে হবে।"

বিশাখা নড়ে বসলো। "হ্যাঁ, ইস্টিশানের ময়লা চা খেয়ে অসুখ না বাধালে সুখের ষোল-কলা ভর্তি হবে কেন ?"

যাক। মনে-মনে একটা স্বস্তির নিশ্বেস ফেললো সুধাময়। তার

কথার তীর একেবারে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। উৎসাহিত হয়ে বললো, "ইস্টিশানের চা খেলে কি অসুখ করে কখনো? পাগল আর কি! গরম জলের মধ্যে জার্মস বাঁচতে পারবে কেন?"

"না, তা কি আর পারে? ময়লা কাপ তো ওরা ধোয় ভারি। সাতশো টি-বি রুগীর এঁঠো না খেলে আর চলছে না!"

"না-না, ভাঁড়ে করে খাবো। তাতে তো আর···"

"জানিনা বাপু। কে তোমার সঙ্গে তর্ক করবে বল! একটা কথা যদি শোনো···"

"না-না, তাই কি আর বলছি নাকি? তুমি অমত করলে খাবো কেন? তবে কিনা ট্রেনে চা খেতে খুব ভালো লাগে, তাই···"

"যাক, ঢের হয়েছে। যা ভালো বোঝো তাই কোরো।"

সুধাময় একটু বিমর্ষ হয়ে চুপ করলো। এ-প্রসঙ্গ এখানেই চাপা দেওয়া ভালো।

"বেরোবার আগে মুখের কথাটা একবার খসালেই তো পারতে। এ বাঁদী তো ছিলোই। ফ্লাস্কে করে চা না হয় করেই আনতুম।"

"অত হাঙ্গামা করে চা খাবার কি দরকার!" একটু থেমে সুধাময় বললো, "চায়ের জন্যে তো সত্যিই আর কষ্ট হচ্ছে না। সন্ধেয় ওখানে পৌঁছেই না হয় খাওয়া যাবে। ইসমাইল সব ব্যবস্থা করে রাখবে নিশ্চয়ই।"

"হ্যাঁঃ! ইসমাইল তোমার জন্যে চা নিয়ে বসে থাকচে! চাল-ডাল দু-টো ফুটিয়ে রাখলেই বাঁচি।"

"না গো না। লোকটা খুব এক্সপার্ট। দেখো, সব ব্যবস্থা ও নিজেই করে রাখবে।"

"দেখা যাক।" বিশাখা চুপ করলো।

কথার ঝাঁজ কমে এসেছে। নিঃসন্দেহে এটা ভালো লক্ষণ। আরো

ঘণ্টা খানেকের মধ্যে সে স্বাভাবিক হয়ে আসবে ভেবে সুধাময় স্বস্তির নিশ্বেস ফেললো।

কিন্তু ঘণ্টাখানেকও অপেক্ষা করতে হোলো না। পরের ইস্টিশানে গাড়ি থামতে বিশাখা নিজেই চা-ওলাকে ডাকলো, কিনলো দু-ভাঁড় চা, তারপর বললো, "চা-চা! এই নাও। হোলো তো?"

সুধাময় একমুখ হাসলো। হোলো বৈকি, খুব ভালোই হোলো!

ট্রেন আবার ছাড়লো। তারপর তাদের দু-জনের অনাবশ্যক ব্যবধান এলো কমে। বিশাখা যে এতো তাড়াতাড়ি আবার স্বাভাবিক হয়ে আসবে সুধাময় সে-কথা ভাবেনি। দূরে সবুজ পৃথিবীর সীমা ঘুরছে, জানালার ভিতর দিয়ে দেখতে ভারি ভালো লাগে। পৃথিবীর গ্রামোফোন ঘুরছে, শব্দে-ছন্দে-ঝঙ্কারে অপরূপ! কখনো চকিত পালিয়ে-যাওয়া শালগাছের পিছনে নিশ্চিন্ত নীল আকাশ আর পাউডার-পাফের মতো থোপা-থোপা মেঘ কি যেন মনে পড়িয়ে দেয়! বোধ হয় অনেক—অনেকদিন আগেকার এক সবুজ পৃথিবী আর সোনালী আলোর গল্প! সুধাময়ের ভালো লাগলো: তৈলাক্ত মসৃণ মানুষের ভিড় ছিঁড়ে এই অলস উধাও যাত্রা।

"এবারে একদিন ত্রিকূটে যাওয়া যাবে, কী বল?"

"বুড়ো হতে চললুম, এখন কি আর উঠতে পারবো?"

"খুব পারবে। বুড়ো আবার কি? তা-ছাড়া ওপরে যে উঠতেই হবে তা-তো নয়! নীচেই কোনো গাছতলায় সমস্ত দিন কাটানো যাবে। টাটকা তাজা হাওয়া..." বলতে-বলতে সুধাময়ের যেন নেশা ধরে গেলো। মানুষের ভিড় নেই, গোলমাল নেই, হৈ-চৈ নেই: সবুজ পৃথিবী, আর সতেজ গাছ, আশ্বিনের আকাশে তখন সবে শীতের ধার, রোদে আর বাতাসে ঝলমলে মর্মরিত দুপুর, আর শান্ত সন্ধ্যা নিছক আলসেমি করে কাটানো, মাঝে-মাঝে সিগারেট টানা—এর চেয়ে ভালো আর কী

হতে পারে সুধাময় হঠাৎ ভেবে পেলো না!

সন্ধে সাতটায় তারা দেওঘরে পৌছলো।

ইস্টিশানে ইসমাইল হাজির রয়েছে! পরিষ্কার ডোরাকাটা সার্ট আর ধবধবে ধূতি পরে একহাতে লণ্ঠন অন্য হাতে লাঠি নিয়ে সে অপেক্ষা করছিলো। অনেক দিন পরে তার মনিব আসছে, কী করলে বাবু-মা খুসি হয় এ নিয়েই সে ব্যস্ত। লোকটা বেজায় চটপটে আর বুদ্ধিমান। তার কথা-বলা আর হাব-ভাব সমস্তই মাজাঘষা। এখানে সুধাময়ের কতকগুলো ছোটোবড় বাড়ি আছে। ভাড়া নেহাৎ মন্দ পাওয়া যায় না। সহর থেকে কিছু ছাড়িয়ে দু-তিন বিঘে জমির ভিতর বাড়িগুলো ছড়ানো। বাকি জায়গাটায় প্রকাণ্ড বাগান। আম, পেয়ারা, পেঁপে, জামরুল ইত্যাদি গাছের ভিড়। ফুলগাছও আছে। সুধাময়ের বাবা যে-সময়ে এখানে জমি কিনেছিলেন তখন দাম খুব শস্তা ছিলো। এখন দাম বেশ বেড়েছে। ইসমাইল লোকটা পুরোনো আমোলের। তার উপরেই এখানকার সমস্ত ভার: বাড়ি সারানো থেকে ভাড়াটে জোগাড় করা আর ভাড়া সংগ্রহ করে সুধাময়কে পাঠানো পর্যন্ত সমস্তই। লোকটা বিশ্বাসী, এ-পর্যন্ত তার ব্যবহারে কোনো খুঁত পাওয়া যায়নি।

সুধাময় আর বিশাখার পায়ে হাত দিয়ে ইসমাইল প্রণাম করলো, তারপর কুলি দিয়ে জিনিসপত্রগুলো অল্পক্ষণের মধ্যেই নামিয়ে প্ল্যাটফর্মে জড় করলো। সূর্যাস্ত বহুক্ষণ হয়েছে। সন্ধ্যার মিলিয়ে-আসা আলোয় পশ্চিমের আকাশটা এখনো নীল হ্রদের মতো টলটল করছে। হাওয়ায় সমস্ত শরীর মাঝে-মাঝে মৃদু সিরসির করে: ভালো লাগে।

"গাড়ি ঠিক করে রেখেছি মা।" ইসমাইল জানালো, "আর দেরি করবেন না, চলুন।"

বিশাখা স্পষ্টই খুসি হয়ে উঠেছে! "চলো যাওয়া যাক। যেতে তো আবার ঘণ্টা খানেক লাগবে।"

চেকারকে টিকিট দিয়ে তারা ঘোড়ার গাড়িতে উঠলো। ইসমাইল মালপত্র তুলে বসলো কোচওয়ানের পাশে। সুধাময় নিশ্চিন্ত হয়ে একটা সিগারেট ধরালো। গাড়ি ছেড়ে দিলো।

তারা যখন বাড়ি পৌঁছলো আকাশে তখন আর আলোর কোনো আভাষ নেই। আশ্বিনের স্বচ্ছ আকাশে তীক্ষ্ণ তীব্র তারার ভিড়। ইসমাইল দরজা খুলে দাঁড়িয়েছে। বাড়ির মালিগুলোও গাড়ির শব্দে বাইরে ছুটে এলো। তাদের মনিব এসেছে। স্পষ্টই তারা উত্তেজিত আর খুসি। তারা মালপত্র নিয়ে অন্ধকারেই দিব্বি চলে গেলো। ইসমাইল লণ্ঠন নিয়ে পথ দেখাচ্ছে। ডানদিকের পেয়ারা গাছগুলোয় অনেক জোনাকি। ঝিঁ-ঝিঁ ডাকছে আশে-পাশের ঝোপ থেকে।

এই বড় কম্পাউণ্ডের মধ্যে গোটা পাঁচ-ছয় ছোটো-বড় বাড়ি। মাঝেরটাই বড় আর ভালো। সেটাতেই সুধাময় থাকবে লিখেছিলো। তাই ইসমাইল এ-বছর সেটা ভাড়া দেয়নি। অন্য তিনটে বাড়িতে ভাড়াটে এসেছে। আর দুটো বাড়িও ভাড়া হয়ে গেছে, আজকালের মধ্যে লোক এসে পড়বে।

অন্ধকারের মধ্যে অন্য বাড়িগুলোয় কেরোসিনেব আলো জ্বলছে। বাড়ির পুরোনো কুকুরটা হঠাৎ কোথা থেকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো। বিশাখার হাতে আগে সে প্রত্যহ ভাত খেয়েছে। সুধাময় বললো "দ্যাখো-দ্যাখো, তোমার ভুলু এসেছে। তোমাকে ভোলেনি তো!"

বিশাখা নিচু হয়ে কুকুরটাকে থাবড়ে দিলো, "ওমা, কী ছিরিই হয়েছে। তোকে বুঝি কেউ খেতে-টেতে দেয় নারে?"

লণ্ঠন নিয়ে ইসমাইল দাঁড়িয়েছিলো। বললো, "খেতে দেবো নাকি মা! রোজ নিজের হাতে খাওয়াই। হতভাগাটা পাড়ায়-পাড়ায় ফাঁকি দিয়ে বেড়ায়। কিন্তু খাওয়ার সময় ঠিক হাজির। ভারি ফাঁকিবাজ হয়েছে।"

বাঁ-দিকের হাত পঞ্চাশেক দূরে ছোটো একটা বাড়ি। সেখানে ভাড়াটে এসেছে। খিড়কির দরজায় কপাট-দুটো খোলা, একটি মেয়ে তাদের দেখছে। ছোটো ছেলেটি তার শাড়ি ধরে দাঁড়িয়ে। লণ্ঠনের আলো তাদের মুখে পড়েনি। তাই কিছু বোঝা গেলো না।

বিশাখা বললো, "যাক! মুখ বুজে আর থাকতে হবে না। কালকেই আলাপ করবো। ওঁরা কে ইসমাইল?"

"উনি রায়বাবুর স্ত্রী। একমাস হোলো এসেছেন। কিছুদিন থাকবেন।"

এখানে পথটা ডানদিকে বেঁকেছে। আর একটু দূরেই বড় বাড়িটা দেখা গেলো। প্রথমে ঢাকা বারান্দা, তারপর ঘর। ঘরে কেরোসিনের আলো জ্বলছে। মালিরা মালপত্র বারান্দার একপাশে নামিয়েছে।

ইসমাইল বললো, "ভেতরে চলুন মা। আমি চা-খাবার নিয়ে আসছি।"

চা-এর নামে সুধাময় উৎসাহিত হয়ে উঠলো। ইসমাইল কিছুক্ষণের জন্যে হোলো অদৃশ্য। তারা ভিতরে এলো।

নতুন চুণকাম করা হয়েছে। ঘরে কাঁচা চুণের গন্ধ। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘর। ইসমাইল মেঝে ধুইয়ে, ঝাঁট দিইয়ে, একেবারে তকতকে করে রেখেছে। ছোট্ট ব্র্যাকেটের উপর কেরোসিনের বড় আলোটায় বেশ ভালোই আলো হচ্ছে। এটা বসার ঘর। মাঝের টেবিলে নতুন ছোট্ট ঝুড়িতে বাগানের টাটকা ফল সাজানো, কিছু ফল কেনাও হয়েছে বোঝা গেলো।

বিশাখা সত্যিই উৎসাহিত হয়ে উঠেছে। লণ্ঠন নিয়ে এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে বেড়াতে লাগলো। সুধাময় ইজি-চেয়ারে হাত-পা এলিয়ে গা-ঢেলে দিলো। ইতিমধ্যে ইসমাইল এলো ফিরে। হাতে মস্ত বড় এক ট্রে: দু-পেয়ালা গরম চা দিয়ে ধোঁয়া উঠছে। দু-টো প্লেটে ফল আর নিমকি সাজানো।

মাঝের টেবিলে সেগুলো নামিয়ে ইসমাইল আদেশের অপেক্ষা করতে লাগলো। "ওগো এসো গিন্নীর, খাবার দিয়েছে," ডাকলো সুধাময়। ফিরে এলো বিশাখা।

"বাঃ, সত্যিই ইসমাইল তোমার একস্‌পার্ট। সব ঘরগুলো ঝকঝক তকতক করছে। ওমা," ট্রের দিকে চেয়ে সেই আগেকার বিশাখা হয়ে উঠলো যেন, "ওমা। এতো সব কখন আনলে ইসমাইল?"

চেয়ার দুটো টেনে তারা টেবিলের কাছে সরে এলো। "পেয়ালা-পিরিচ পেলে কোথা থেকে?" বিশাখার স্বরে বিস্ময়।

"ও সমস্ত রায়বাবুদের বাড়ি থেকে নিয়ে এলুম মা। ওনাদের ওখানেই আজ খাবার বন্দোবস্ত করেছি। বেশি দেরি নেই। ওনাদের লোক এসেই আজ রাতে খাবার দিয়ে যাবে।"

"ওগো, ট্রেনের মুখ-হাত আগে ধুয়ে এসো। বাথরুমে জল-সাবান সবি আছে। ইসমাইল, বিছানাটা খুলে তোয়ালেটা বার করে দাও দিকিনি।"

চটপট বিছানা খুলে ইসমাইল তোয়ালে বার করে দিলো। বাথরুম থেকে মুখ-হাত ধুয়ে এলো সুধাময়। সমস্ত জিনিসপত্র ইসমাইল তখন গোছ করে রাখছে। পাশের ঘরটা শোবার। অল্পক্ষণের মধ্যেই বিছানা পেতে, মশারি টাঙিয়ে ইসমাইল ঠিক করে ফেললো।

"আজ এ-রকম থাক মা। কাল আপনি দেখিয়ে দেবেন, তখন সাজিয়ে রাখবো।"

সকালে যে আগুণ ছিল সন্ধ্যায় যে তাকে জল হতে দেখবে, সত্যি বলতে কি, সুধাময় এতোটা আশা করেনি। ইসমাইলের উপর মনেমনে সে কৃতজ্ঞ হয়ে উঠলো। যাক গে, ছুটিটা তাহলে কাটবে ভালোই।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে বাইরের ঢাকা বারান্দার ছু-টো ডেক চেয়ারে তারা গল্প করছে তখন। খুসিতে কারুর চোখেই ঘুম নেই। সেই পুরোনো পলাতক দিনের সৌরভে আজকের সন্ধে হঠাৎ যেন ভরে গেছে। সামনে অন্ধকার। গেটের কাছে য়ুক্যালিপটাস গাছের দীর্ঘ ডালপালা থমথম করছে। ভুলু বিশাখার পায়ের কাছে কুণ্ডুলি পাকিয়ে শুয়ে। তারাগুলোয় নতুন পালিশ। বাতাসে মিষ্টি শীত। পূব-আকাশ নিঃশব্দে তোলপাড় করে এবার চাঁদ উঠলো: খানিকটা তার অন্ধকার, বাকিটা আশ্চর্য উজ্জ্বল। সবে যেন আগুণের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো এক তাল সোনা। উদ্ধত লালচে-চাঁদ। য়ুক্যালিপটাসের পাতাগুলো সিরসির করে উঠলো, আর সুধাময়ের হঠাৎ মনে হোলো এ-রকম চাঁদকে উঠে আসতে অনেক দিন সে দেখেনি। চাঁদকে সে ভুলেছিলো।—বল, কী করে ভুলেছিলো বল।—এখানে আজ অনেক বছর পরে আকাশটা যেন হাত বাড়িয়ে তাকে ছুঁতে এসেছে! সে-দিন আর নেই, নইলে হয়তো বিশাখাকে একটা গান গাইতে বলতো।. গান: আশ্চর্য, কতদিন সে বিশাখার গান শোনেনি।

অন্ধকারের প্রচ্ছদপট ক্রমশ স্বচ্ছ হয়ে এলো। এখানের ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠছে। চেনা না-চেনা, খানিক-মনে-পড়া, খানিক-ভুলে-যাওয়া ছবি।

হাত-ঘড়িতে তখন দশটা বেজে দশ মিনিট। সুধাময় বললো, "চল,

"এবার শোয়া যাক। সমস্ত দিন ট্রেনে এসেছি; তোমার ক্লান্ত লাগছে না?"

"নাঃ, এমন আর কি!" একটু থেমে বিশাখা উত্তর দিলো, "চলো।" সে উঠে দাঁড়ালো। আর পরক্ষণেই পাশের ছোটো বাড়িটা থেকে প্রচণ্ড কাশির শব্দ এলো: খক্-খক্ খক্-খক্। শেষহীন, বুকভাঙা কাশির শব্দ। সুধাময় আর বিশাখা এ ওর মুখের দিকে চাইলো। এর আগেও, তাদের মনে পড়লো, ওখানে কাশির শব্দ শুনেছে। তখন বিশেষ খেয়াল করেনি। কিন্তু এ-কাশি যেন থামতে চায় না। মিনিট পাঁচেক পরে শব্দ থামলো। মিনিট পাঁচেক তারা স্তব্ধ হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে রইলো। পাশের ঘরের আলো বিশাখার মুখে এসে পড়েছে। উদ্বেগে ফ্যাকাশে সমস্ত মুখ। শব্দ থামতেই বিশাখা বললো, "না বাপু, আমার মোটেই ভালো মনে হচ্ছে না। ইসমাইলকে ডাকো তো একবার।"

বসার ঘরে তারা এলো। ইসমাইলকে খবর দেওয়া হয়েছে। অস্বস্তিতে অস্থির হয়ে উঠেছে সুধাময়। আর একটা সিগারেট ধরালো।

ইসমাইলের আসতে দেরি হোলো না। তাকে দরজার কাছে দেখেই বিশাখা তীব্র গলায় চেঁচিয়ে উঠলো, "পাশের ছোটো বাড়িটা কাকে ভাড়া দিয়েছো?"

নিমেষে ইসমাইলের মুখের রঙ বদলে গেলো, "আজ্ঞে ও একটা বড় ভুল হয়ে গেছে। কোথাও ওনারা বাড়ি পাচ্ছিলেন না, তাই···।"

"তাই তুমি এক টি-বি রুগিকে ভাড়া দিয়েছো!" বিশাখা আবার সম্পূর্ণ বদলে গেছে। ফিরে এসেছে সেই সকালের চেহারা।

"আজ্ঞে, আগে তো ঠিক জানতুম না ওনার অসুখ আছে, তবে তিন-চারদিন ধরে দেখছি বাবু মাঝেমাঝে কাশে, লাঠি ধরে অল্প বেড়াতে যায়। জিগগেস করলে সোজা উত্তর দেন না।"

"কত দিন ওঁরা এসেছেন?" সুধাময় প্রশ্ন করলো।

"এই তো দিন সাত-আট হবে, বাবু।"

"যেমন তুমি," ঝাঁঝাঁলো গলায় সুধাময়ের দিকে চেয়ে প্রায় চীৎকার করে উঠলো বিশাখা, "তেমনি বে-আক্কেলে তোমার লোকজন। এ-আমি কিছুতেই হতে দোবো না। ইসমাইল গিয়ে এখুনি ওদের বার করে দিয়ে আসুক।"

"একটু আস্তে···।"

"আস্তে কি? লোক ঠকিয়ে বাড়ি ভাড়া করা! ওদের পুলিশে দিয়ে ছাড়বো। টি-বি রুগিকে ঘর-ভাড়া দিচ্ছো শুনলে এ-বাড়ি তোমার কখনো আর ভাড়া হবে? কালকে সকালেই আমি গিয়ে অন্য বাড়ির লোকেদের বলে আসবো তাঁরা যেন চলে যান।"

ইসমাইল পায়ের নোখ দিয়ে মেঝে খুঁটতে লাগলো।

"কী, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? কথাগুলো কানে গেলো না?"

"তুমি পাগল হলে নাকি? আজ রাতেই কখনো ওঁদের যেতে বলা যায়? এই রাতে কোথায় যাবেন?"

"সে কি আমার জানার কথা? আমরা তো আর এখানে টি-বি'র হাসপাতাল খুলিনি! যে-বিয়ের যা মন্তর। এখুনি ওদের বেরিয়ে যেতে বল।"

এক নিমেষে রূপালি আবহাওয়া চুরমার হয়ে গেলো! সুধাময় জানে সারা রাত ধরেই এই বকাবকি চীৎকার চলবে, যতক্ষণ না ভাড়াটেরা ফটক পেরিয়ে বেরিয়ে যায়। বিশাখা ক্রমশ হিসটিরিক হয়ে উঠবে, শুনবে না কোনো যুক্তি-তর্ক। সমস্ত দোষ যেন সুধাময়েরই।

"এই করতে আমাকে এখানে নিয়ে এলে? টি-বি রুগির সঙ্গে থাকবার জন্যে এখানে এলুম? যেমন মনিব, তেমনি চাকর। দু-পয়সা বেশি ওর হাতে গুঁজে দিলেই যাকে-তাকে ভাড়া দেবে! ঝেঁটিয়ে বিদেয়

করে দাও অমন লোককে। বিশ্বাসী লোক, পুরোনো লোক! এই না করলে আর বিশ্বাসী লোক বলে! ও হতভাগা সব বাড়িই হয়তো রুগিদের ভাড়া দিয়েছে। এ-বাড়িও নিশ্চয়ই দিয়েছিলো··· ।”

“না মা, সত্যি বিশ্বাস করুন, কখনো এমন কাজ করিনি। আগে জানলে কি আর ওনাদের ভাড়া দিতুম? বড়বাবুকে সকালেই ওনাদের কথা বলতুম।”

“তা হলেই হোলো আর কি! কাল সকালই বলতুম!—মাথা কিনতে আমার!” বিশাখা দস্তুরমতো কুৎসিত হয়ে উঠেছে। “চোর, বদমাইস, উল্লুক··· ।”

“নানা, অমন করছো কেন? রাতটা যেতে দাও···।”

“সখ করে করছি, না? মাঝরাতে চীৎকার করতে আমার খুব ভালো লাগছে!—এই মুহূর্তে ওদের দূর করে দাও। নয় তো এই আমি চললুম। এমন কথা তো বাবা-মা লেখাপড়া করে দেননি যে টি-বি রুগির সঙ্গে থাকতে হবে?”

“আহা, বাড়াবাড়ি করছো কেন? ও-বাড়ি তো খানিক তফাতে আর এক রাতে কি আর··· !”

“থামো,” রীতিমতো ধমক দিয়ে উঠলো বিশাখা, “বাড়াবাড়ি করছি? বলতে লজ্জা হোলো না?—তুমি যাবে, নাকি আমিই গিয়ে তাদের বার করে দিয়ে আসবো?”

সুধাময় শঙ্কিত হয়ে উঠলো। এখুনি কি-যে কেলেঙ্কারি হয় কে জানে। “লক্ষ্মীটি, শোনো। আজ রাতটা যেতে দাও। কাল সকালে আমি ব্যবস্থা করবো।”

আরো অনেক বোঝাবার পর বিশাখা খানিক ঠাণ্ডা হোলো। সে-রাতে আর কারুর ঘুম এলো না। একটার পর-একটা সিগারেট ধরিয়ে সুধাময় বারান্দায় পায়চারি করলো সারারাত। বসার ঘরের

চেয়ারে বসেই বিশাখা খানিক ঘুমুলো, খানিক বকাবকি করলো।

এ-রকম দুশ্চিন্তা আর উৎকণ্ঠায় সুধাময়ের কোনো রাত কাটেনি।

সূর্য তখনো ওঠেনি। শিশিরে সমস্ত মাঠ ভিজে। মুখ-হাত না ধুয়েই সেই ছোটো বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়ালো সুধাময়। নেহাৎ ছোটো বাড়ি। থাকার মতো দুটো মাত্র ঘর। ভাড়া টাকা দশেক।

সজোরে সে কড়া নাড়ালো। "কে আছেন ভেতরে ?"

দরজা খুলে খানিকটা ঘোমটা টেনে এক বিধবা মাহিলা বেরিয়ে এলো। "আমরাই এ-বাড়ি ভাড়া নিয়েছি।"

"শুনে খুব সুখী হলুম। এই মুহূর্তে বাড়ি খালি করে করে বেরিয়ে যান। এ্যাডভান্স যা দিয়েছেন তা আর ফেরৎ পাবেন না। বেরিয়ে যান, শিগগীর।"

থরথর করে মেয়েটির সর্বাঙ্গ কাঁপতে লাগলো। "বেরিয়ে কোথায় যাবো বাবা ? দু-দিন আবার খোকার কাশিটা বেড়েছে। এখানে তো আর বাড়ি পেলুম না। অনেক খুঁজে অল্প টাকায় এখানে পেলুম··· ।"

"কোনো কথা আমি শুনতে চাই না। বেরিয়ে যান এই মুহূর্তে। আপনারা মরুণ-বাঁচুন আমাদের তা দেখবার কী দরকার ? আমরা তো আর মরতে পারি না আপনাদের জন্যে !"

সুধাময়ের কি মাথা খারাপ হোলো ?

তার চীৎকারে কাঁথা মুড়ি দিয়ে বছর কুড়ির একটি ছেলে ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো। গাল দুটো ভাঙা। চোখ কোটরে ঢুকেছে। সরু, লম্বা চেহারা। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না।

"এই যে! আপনারই অসুখ বুঝি?"

উত্তেজিত হয়ে এতোটা উঠে আসায় বেজায় হাঁপাচ্ছে ছেলেটা, ঠোঁটগুলো থরথর করছে। সেখানে অসুস্থ আরক্ত আভা। অতি কষ্টে বললো, "আজ্ঞে হ্যাঁ। দেখুন স্যার, আপনি রাগ করবেন না। আমার অসুখটা একটু কমলেই বাড়ি ছেড়ে দোবো। দেখছেন তো," সে হাঁপাতে লাগলো, "দেখছেন তো আজ আমি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছি না···। আর স্যার, সব রকম প্রিকশন নিয়েছি। স্পুটাম পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে। ব্লিচিং পাউডার আর ফিনাইল···।" মুখে কাপড় দিয়ে প্রাণপণ কষ্টে কাশির একটা ধাক্কা সামলে নিলো সে। কিন্তু আর দাঁড়াতে পারলো না। দরজা ধরে কোনো রকমে হাৎড়াতে-হাৎড়াতে চৌকাঠের উপর সে বসে পড়লো।

"অমন করুচ্ছিস কেন বাবা? জল আনবো?"

"না মা," ছেলেটি ততক্ষণে অনেকটা সামলে নিয়েছে, "না মা, ঠিক আছি।" তারপর সুধাময়ের দিকে চেয়ে হাসতে চেষ্টা করলো। "একটু উইক হয়ে পড়েছি স্যার!···ডাক্তারে বললে কলকাতার বাইরে কোথাও যেতে। টাকাকড়ি তো আর বেশি কিছু নেই, তাই যাতে কম খরচে হয়···মাকে বললুম, যা হবার তাতো হবেই, তবে আর অনর্থক পয়সা খরচা করে কলকাতার বাইরে যাই কেন? কিন্তু মা···"তার কোটরের মধ্যে ঢুকে-যাওয়া চোখ দুটো মেলে সুধাময়ের দিকে চেয়ে আবার হাসতে চেষ্টা করলো।

আর একটা সিগারেট ধরিয়ে সুধাময় প্রস্তুত হয়ে নিলো। "বাজে কথা শোনার সময় নেই। জানেন আপনাদের পুলিশে হ্যাণ্ড-ওভার করতে পারি চিটিং চার্জে? আমি বেড়াতে চললুম। ফিরে এসেও যদি আপনাদের দেখি তা হলে বার করে দিতে বাধ্য হব।"

ছড়িটা দোলাতে-দোলাতে হনহন করে সুধাময় বেরিয়ে গেলো।

ছেলেটি মাটির উপর হিজিবিজি কাটতে লাগলো। তার মা দরজা ধরে তখনো থরথর করে কাঁপছে।

এমন সময় দেখা গেলো একটি সুন্দর বছর পঁয়ত্রিশ বছরের ফরসা মেয়ে তাদের বাড়ির দিকে আসছে : সে বিশাখা। বিধবা মেয়েটি তাকে আন্দাজে চিনতে পারলো।

বিশাখা বললো, "সারা রাত ধরে কত বললুম—ওঁদের তুমি সকালে যেতে বোলো না। থাকুন না! সাবধানে থাকলে আর ভয় কি? আর এই বিদেশ-বিভূঁয়ে চট করে যাবেনই বা কোথায়? তা উনি কি আর শোনেন! বেজায় রগচটা মানুষ। কাল রাতেই বলেন চললুম থানায়। হাতে-পায়ে ধরে থামাই।" বিশাখা একটু থেমে আঁচল থেকে দুটো দশ-টাকার নোট বার করে বললো, "এই নিন দিদি। আপনারা কলকাতাতেই ফিরে যান। আমি গাড়ি ডাকতে পাঠিয়েছি। আমার বিশেষ অনুরোধ দিদি, উনি ফেরবার আগেই আপনারা রওনা হয়ে পড়ুন। নইলে যা রগচটা লোক, কি-যে করে বসবেন কেউ জানে না।"

কৃতজ্ঞতায় বিধবা মেয়েটি ঝর-ঝর করে কেঁদে ফেললো। "নাঃ, খোকাটাকে আর বাঁচাতে পারলুম না। কী আর করবো দিদি, আমার কপাল!"

ইসমাইল জানালো গাড়ি এসেছে।

বিশাখা চোখে কাপড় দিয়ে জল মুছলো। বিধবা মেয়েটির আঁচলের খুঁটে বেঁধে দিলো নোট দু-টো। সে বললো, "আপনার ঋণ দিদি জীবনে শোধ করতে পারবো না।—খোকা, ওঠ বাবা, জামা-জুতো পরে নে।"

ইসমাইলকে বিশাখা আদেশ দিলো জিনিসগুলো যেন গাড়িতে তুলে দেয়। মিনিট পনেরোর মধ্যে ইসমাইল তাদের গাড়িতে তুলে দিলো। রওনা হোলো তারা। আশ্বিনের আকাশে তখন সূর্য সোনা ছড়িয়েছে,

মাঠের শিশির এবারে শুকিয়ে যাবে।

বেলা বারোটা নাগাদ সুধাময় ফিরলো। সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গিয়েছে। মুখের উপর রক্ত উঠে এসেছে, টকটকে লাল।

বিশাখা পাখা নিয়ে হাওয়া করতে এলো। বললো, "ওমা, একি মূর্তি হয়েছে? ছিলে কোথায়?"

"থাক, হাওয়ার দরকার নেই," সুধাময় আর একটা সিগারেট ধরালো।

"ওরা চলে গেলো। আহা বেচারা, এমন কষ্ট হচ্ছিলো! আমি কুড়িটে টাকা দিয়ে দিয়েছি। ছেলেটা বোধ হয় আর বাঁচবে না। বিধবার একমাত্র ছেলে—তুমি কিন্তু অতটা কড়া করে না বললেই পারতে! আমারি খারাপ লাগছিলো।"

"হুঁ," সুধাময় শুধু ছোট্ট একটি শব্দ উচ্চারণ করলো।···পৃথিবী প্রতি মুহূর্তে কত মাইল ছুটছে?···বাড়িটা সারাতে হবে।···আর কতদিন তারা বাঁচবে?···গতকাল সন্ধে থেকে এখন পর্যন্ত সে আড়াই টিন সিগারেট টেনেছে।···কোথায় যেন আগুন ধরেছে।···সমস্ত আকাশ কি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে?···সে কি কোনোদিন প্রেমে পড়েছিলো?··· জীবনে কতদিন প্রেম বেঁচে থাকে?···আজ আবার চাঁদ উঠবে?···

"ইসমাইলকে বল এক পেয়ালা চা দিয়ে যাক।" হঠাৎ তার মনে পড়লো এ-পর্যন্ত কিছু খাওয়া হয়নি।

কানামাছি

এক-একটি দিন শুধু ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তি। কিসের যেন ঘূর্ণিতে সে পড়ে গেছে। ক্রমাগত ঘুরছে: বিশ্রাম নেই, বিরাম নেই। অথচ মহিম জানে এই ঘূর্ণাচক্রের বাইরেই রয়েছে নীল গভীর জলের প্রশান্তি, স্রোতের মসৃণতা; আর বাতাস যা সমস্ত শরীরে একটা নেশার মতো ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘূর্ণচক্রের ঠিক পাশেই রয়েছে বিশ্রাম, চিৎ হয়ে আকাশ দেখার বিলাসিতা। ইচ্ছে করলে তুমি এক-একটি রূপুলি আগুনের ফুলকির মতো তারা গুনতে-গুনতে অন্যমনস্ক হয়ে যেতে পারো। তার কথা ভাবতে পারো যার উপরের ঠোঁট পাতলা আর তলারটি ফোলা। অনুভব করতে পারো সেই পাতলা ও পুরু ঠোঁটের যুগ্ম উষ্ণ-মধুর স্বাদ। সে বুঝতে পারে এই সব। তবু একটা ভোঁতা অনুভূতি সমস্ত মাথার মধ্যে ভোঁ-ভোঁ শব্দ করে, গ্রীষ্মমধ্যাহ্নের একটি নিঃসঙ্গ মাছির মতো, ক্রমাগত যে আছাড় খায় বন্ধ কাচের সার্সির উপর, পথ খুঁজে পায় না—একটা ক্লান্তিকর ভোঁ-ভোঁ একটানা আর্তনাদ করে চলে। সেই আর্তনাদ শুনতে-শুনতে তোমার সমস্ত চেতনা একটি জড়তায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। অন্য কিছু ভাবতে পারো না। বুঝতে পারো না কখন তুমি ঘুমিয়ে পড়েছো। তারপর জেগে উঠে দেখো ঘামে সমস্ত শরীর ভিজে গেছে, মুখের ভিতরটা বিস্বাদ, জিভটা জুতোর শুকনো শুকতলার মতো। ঘুমিয়ে ওঠো, অথচ নতুন একটা অবসাদ তোমাকে জড়িয়ে ধরে। আর সেই গ্রীষ্মক্লান্ত ঘুম থেকে জেগে উঠেও শোনো সেই মাছিটার শব্দ। ভোঁ-ভোঁ ভোঁতা আর্তনাদ। জানালা খুলে সেটাকে দূর করে দিলেই

পারো। কিন্তু পারো না উঠে জানালার সার্সি খোলবার শক্তি সঞ্চয় করতে। শারীরিক ও মানসিক—এই উভয়শক্তির কোনো একটি।

অবশ্য মহিমের মনে দিবানিদ্রার স্মৃতি ফিকে হয়ে এসেছে। কতদিন সে ভালো করে ঘুমুতে পায়নি। দিনে তো নয়ই, এমন কি রাত্রেও নয়। একটা অদৃশ্য ঘোলা ঘূর্ণচক্রের বিশ্রামহীন চক্রান্তে তার সময় কাটে। কোনো দিকে চাওয়া যায় না। উপরের নীল আকাশটাও ঘুলিয়ে যায়।

খুব সকালে ঘুম ভাঙবার পর সবাই যখন আর একবার পাশ ফিরে ঘুমোয় ঠিক সেই সময় মহিমকে উঠতে হয়। নইলে সে জানে সময় তার কম পড়ে যাবে। আর ঠিক সেই সময় থেকেই কে যেন একটা সুইচ টিপে দেয় আর সুরু হয় সেই ভোঁ-ভোঁ আর্তনাদ, সেই ঘোলা ঘূর্ণচক্রের আস্বাদ। প্রথমে একটু জড়তা থাকে; সমস্ত শরীরে কেমন একটা আঠা-আঠা চটচটে জড়তা। মুখ ধোবার সঙ্গে-সঙ্গে সেটা কেটে যায়। একটা অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রতা কোথা থেকে যেন ছুটে আসে; অসুস্থ অস্বাভাবিক একটা গতি। সমস্ত দিনের ছবি তার মনের মধ্যে দ্রুত পটপরিবর্তন করে। কোনো রকমে জামাকাপড় বদলে, মেসের পুরোনো তক্তপোষের এক কোণে বিছানাটাকে গোল করে পাকিয়ে মহিম দ্রুত পায়ে পথে নেমে আসে। তারপর বড় রাস্তা ছেড়ে একটা গলির মধ্যে দিয়ে এসে পৌছয় আর একটি পথে: গলিটার চেয়ে বড় কিন্তু ট্রামরাস্তার চেয়ে ছোটো। তারপর সেই পথ দিয়ে মিনিট পনেরো হাঁটবার পর অনাদিবাবুর বাড়ি। বাড়ির সামনে গলায় ও পায়ে দড়ি বাঁধা শীর্ণ গরুটার তখন দুধ দোয়া হচ্ছে। অনাদিবাবুর হৃষ্টপুষ্ট চাকরটা গোয়ালাটাকে পাহারা দিতে-দিতে নিজের ময়লা গা নোখ দিয়ে খসখস শব্দ করে চুলকোয়। মহিমকে দেখে পানের ছোপধরা দাঁত বার করে হাসে। বলে, "সোজা চলে যান মাস্টেরবাবু। কত্তাবাবু বাইরের ঘরে বসে আছে।" গরু ও বাছুরটা মহিমকে চেনে যেন। তার বড়-বড়

কালো চোখ দিয়ে গরুটা মহিমকে দেখে, তার ক্লান্ত চাউনি দিয়ে মহিমের সমস্ত শরীরকে যেন চাটে। বাছুরটা দুধ খাবার জন্যে ছটফট করে। মহিমকে দেখে যেন হাসে। মহিম বুঝতে পারে, অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে বাছুরটা তাকে দেখে হাসছে। সে-হাসির মধ্যে আনন্দ নেই—শুধু ক্লান্তি ও করুণা। বাছুরটা বেশিদিন বাঁচবে না এ-কথা মহিমও জানে, বাছুরটাও জানে। এ-হাসি সেই আসন্ন মৃত্যুসংবাদের! আর দিন পনেরো পর থেকে বাছুরটা হাসবে না, ছটফটও করবে না। তার খড়ে-ঠাসা দেহটা গোয়ালা দড়ি দিয়ে হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে আসবে। দুধ দুইবার সময় অনাদিবাবুর বাড়ির মেছেতা-পড়া বাইরের দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখবে।

মহিম বাইরের ঘরে ঢুকে পড়ে। অনাদিবাবু যথানিয়মে পুরোনো ইজিচেয়ারে শুয়ে। কত বয়স হয়েছে কে জানে। একটা চোখ নষ্ট হয়ে গেছে। আর একটির জ্যোতিও ক্ষীণ। তিনি নিজে খবরের কাগজ পড়তে পারেন না। কিন্তু সকালে উঠে কাগজ পড়ার গত সত্তর বছরের অভ্যেসটা ছাড়তে পারেননি। মহিমকে পড়ে শোনাতে হয়। মাসে দশটাকা এইজন্যে অনাদিবাবু খরচ করেন। শুধু এইজন্যে অবশ্য নয়। অনাদিবাবুর বাজারও মহিমকে করে দিতে হয়। চাকরকে বিশ্বাস নেই। খবরের কাগজের প্রথম পাতা শেষ হবার আগেই চাকর দু-পেয়ালা চা নিয়ে আসে। ধূমায়িত তাম্রাভ চা। বাছুরকে বঞ্চিত করে যে-দুধ দোয়া হোলো সেই দুধ দিয়ে তৈরি। এ-কথা মনে হলেই মহিমের কাছে সকালের প্রথম পেয়ালা চা তামা-গোলা জলের মতো বিস্বাদ লাগে। মাথার ভিতরের ভোঁ-ভোঁ শব্দ আরো যায় বেড়ে। পেয়ালায় ঢেলে ফুঁ দিয়ে একটা অস্পষ্ট চুকচুক শব্দ করে সে তাড়াতাড়ি চা-টা গিলে ফেলে। পেয়ালায় ঢেলে চা পান অনাদিবাবু দেখতে পান না—এই যা সান্ত্বনা।

কাগজ পড়া শেষ হতে-না-হতে চাকরটা বাজারের থলি হাতে এসে

দাঁড়ায়। বলে, "নেন মাস্টেরবাবু, উঠে পড়ুন। ঢের বেলা হয়েছে।" মহিম উঠে পড়ে। কাগজটা নিজের হাতে ভাঁজ করতে-করতে অনাদি-বাবু হেসে বলেন, "মহিমবাবু, আজ যেন একটু দেরি হয়েছিলো। কাল যদি আর একটু সকাল-সকাল···।"

"নিশ্চয়। খুব চেষ্টা করবো···" বলতে-বল্লতে মহিম পথে নেমে আসে। অনাদিবাবু প্রত্যহই এই একটু ক্ষীণ অভিযোগ করেন, যত সকালেই কেন মহিম আসুক না। এটা তাঁর মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়েছে। বার্দ্ধক্যের কালো রাত, অনাদিবাবুর ভালো ঘুম হয় না। একটিমাত্র ক্ষীণ চোখ মেলে অন্ধকার দেখতে তিনি ভয় পান। মহিম স্পষ্ট বুঝতে পারে অনাদিবাবুর ভয়ের কথা। সে-ভয় আসলে অন্ধকারের নয়, আসন্ন অন্ধকার মৃত্যুর। তবু কাগজ ভাঁজ করতে-করতে অভিযোগ করার সময় দন্তহীন মুখে তিনি অমন শিশুর মতো হাসতে পারেন কী করে ভেবে মহিমের প্রতিদিনই নতুন করে অবাক লাগে।

প্রতিদিনকার মতো বাজার করা পর্যন্ত আজকের দিনটাও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। বাজার করে মেসে ফিরে স্নানাহারের জন্যে অল্পই সময় থাকে অবশিষ্ট। সেই অবসরটুকুর মধ্যেই আজ গ্রাম থেকে তার মা-র চিঠি এসেছে: মহিমের বাবার হয়েছে মৃত্যু। সাধারণত মানুষের মৃত্যু-সংবাদ টেলিগ্রামেই আসে। কিন্তু মহিমের মা জানেন আজকাল চিঠি ও টেলিগ্রাম প্রায় একই সময়ে পৌঁছয়। তাই অযথা অর্থব্যয় করেননি। মহিমের বাবাকে এই মৃত্যুর সময়েও দেখাননি বেশি খাতির বেশি অর্থব্যয় করে।

খবরটা পড়েই তার মাথার মধ্যেকার সেই ভোঁতা আর্তনাদ, আশ্চর্য, কয়েক মুহূর্তের জন্যে যেন থেমেছিলো। আর কী অপরূপ প্রশান্তিতে

ভরে গিয়েছিলো তার সমস্ত মন! কিন্তু মাত্রই কয়েক মুহূর্তের জন্যে। আবার ফিরে এলো সেই আর্তনাদ। অনেক জল ঢেলেও কমলো না। আশ্চর্য, এক সঙ্গে মানুষ কত কথাই না ভাবতে পারে! ঝাঁকে-ঝাঁকে ভাবনা উড়ে আসছে মহিমের মাথায়। তার ছোটো মাথায় অত ভাবনা ধরবে কী করে? তার বাবার পঁয়ত্রিশ টাকার পেনসেন বন্ধ হোলো, তার মানে মহিমকে অন্তত আরো পঁয়ত্রিশ টাকা যেমন করে হোক প্রতি মাসে পাঠাতে হবে। তা-ছাড়া দুটি বোনের বিয়ে ও আরো তিনটি ছোটো ভাই-এর পড়ার খরচ তো আছেই। বোনেদের বিয়ের টাকা এখুনি লাগবে না, কিন্তু ভাইদের পড়ার খরচ তো এখন থেকেই দিতে হবে। একটি ভাই ইস্কুলে পড়ে। আগামী বছর সে ম্যাট্রিক দেবে। তারপর আছে সে-ভায়ের কলকাতায় কলেজে পড়ার খরচ। অন্য দুটি ভাইকেও আর দেরি না করে এখুনি ইস্কুলে ভর্তি করে দেওয়া উচিত। গত তিন-চার মাস ধরে সে ভাবছিলো এ-কথা—বাবার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে এখুনি কেন যে তার মনে হোলো কালকেই তাদের ইস্কুলে ভর্তি করার টাকা না পাঠালে চলবে না মহিম তা জানে না। তা-ছাড়া শ্রাদ্ধের জন্যেও আছে খরচ এবং খরচের চেয়েও বেশি দরকার ছুটির। একাধিক তার প্রভু: সকালে অনাদিবাবু, দুপুরে সদাগরী আপিস, রাত্রে প্রেসে প্রুফ দেখা।

আর তা-ছাড়া সেই মেয়েটি: যার উপরের ঠোঁট পাতলা আর তলারটি ফোলা! তার মুখোমুখি আজ দাঁড়াবে কী করে মহিম?

গত ক-দিন থেকেই কলকাতায় আশ্চর্য এক ঝড় বইছে। এই গ্রীষ্মকালে কলকাতায় প্রতিবছরেই জোরালো দক্ষিণে বাতাস বয়। এ-ঝড়ও আসছে দক্ষিণ সমুদ্র থেকে। আশ্চর্য ঝড়। আকাশে মেঘ নেই। শুধু উন্মত্ত

হু-হু শুকনো হাওয়া। সর্বদা ধূলোবালি উড়ছে, ঘরে-ঘরে গাছের শুকনো পাতা এসে পড়ে, ঝাঁট দেবার পরের মুহূর্তেই মেঝেয় নতুন এক-পুরু ধুলো জমা হয়। বুকের ভিতর যেন শুকিয়ে যায়। জানালা বন্ধ করলে ঘামে ভিজে যায় সমস্ত শরীর। জানালা খুললে ভালো করে কিছু ভাবা যায় না। মরুভূমির ধূ-ধূ শূন্যতায় বুকের মাঝখানে যেন হাঁপ ধরে।

আজ সকালে অনাদিবাবুকে কাগজ পড়ে শোনাবার সময় এই ঝড়ের খবর মহিমকে চমকে দিয়েছিলো। বাংলা দেশের 'কোনো এক জায়গায়' এই ঝড়ের বেগ এতো প্রবল হয়েছিলো যে একটা মিলিটরি লরিকে উড়িয়ে ফেলেছিলো বম্বারের উপর, আকাশে পেট্রলের বড়-বড় ব্যারেলগুলো ভেসেছিলো হালকা ছিপির মতো। মহিম কোথায় ছিলো? এই ঝড় যদি তাকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারতো এই জীবনের হাত থেকে, মাথার ভিতরকার অহরহ এই ভোঁতা ভোঁ-ভোঁ শব্দের হাত থেকে, তারা থেকে তারায়, আলোহীন-বাতাসহীন অন্ধকার মহাশূন্যে—যেখানে জীবন নেই, মৃত্যু নেই, সময় নেই—যেখানে শুধু আছে তীব্র একটি গতি, আর কিছু নয়! যদি পারতো!

আপিস থেকে তাকে আজ দশদিনের ছুটি মঞ্জুর করেছে। রাত্রে প্রেস থেকে ছুটি করিয়ে নিতে পারলেই কাল বারোটার ট্রেনে সে গ্রামে যেতে পারবে।

কিন্তু সেই মেয়েটির কাছে সে ছুটি নেবে কী করে? যার উপরের ঠোঁট পাতলা আর তলারটি ফোলা! ছুটি নিতে হবে শুধু কয়েক দিনের নয়, সমস্ত জীবন থেকে। দেশে আরো পঁয়ত্রিশটি করে টাকা বেশি পাঠানোর মানেই হচ্ছে তাই। অন্য পথ নেই।

দিনগুলো অদ্ভুত বড় হয়েছে। মহিম যখন মেস থেকে পথে এসে নামলো

তখনো রীতিমতো রোদ্দুর। বিকেলের সেই আশ্চর্য আলো আসতে বেশ খানিকটা দেরি আছে—যে-আলোর রঙ খানিকটা চাঁপাফুল, খানিকটা জাফরানের মতো; যে-আলো বছরের আর-কোনো সময়ে দেখা যায় না। যার স্পর্শে সমস্ত সহরকে হঠাৎ এক রূপকথার রাজ্য বলে মনে হয় আর যার তলায় দাঁড়িয়ে হঠাৎ তুমি দুঃসাহসী হয়ে উঠতে পারো।

মহিম যখন পথে নামলো তখনো সে-আলোর দেরি আছে। কিন্তু সেই ঝোড়ো হাওয়া একটুও কমেনি। শুধু টুকরো-টুকরো মেঘ আসছে ভেসে। আকাশটা আর একেবারে পরিষ্কার নয়।

ফুটপাত দিয়ে চলতে-চলতে মহিমের প্রায়ই মনে হয় তার চলার পথ হঠাৎ যেন খুব সরু হয়ে গেছে। সার্কাসে-দেখা সেই ছাতি-হাতে-তারের-উপর-সাবধানে-চলা মেয়েটির মতো মহিমের পথও খুব সংকীর্ণ। খুব সাবধানে সে চলে। কোনো রকমে একটু টলে গেলেই সে যে কোন অতলে তলিয়ে যাবে তার ঠিক নেই। খুব সাবধানে সে চলে। তার পা ফেলতে একটু ভুল হলে ক্ষমা কেউ করবে না। ঠাণ্ডা সাপের মতো ভয় তার মনের মধ্যে পাকিয়ে শুয়ে থাকে। শুধু যদি মাথার ভিতর সর্বদা এই ভোঁতা শব্দটা সে না শুনতে পেতো তা হলে তার কোনো ভয় ছিলো না!

কিন্তু আরো পঁয়ত্রিশ টাকা বেশি সে পাঠাবে কী করে? অনাদিবাবুর কাছে দশ, আপিস থেকে বাহান্ন, আর প্রুফ দেখে কুড়ি—মাসে এই মোট বিরেশি টাকা সে রোজগার করে। নিজের জন্যে পঁয়ত্রিশ টাকা রেখে প্রতি মাসে সাতচল্লিশ করে সে মা-র কাছে পাঠায়। পঁয়ত্রিশের কমে কলকাতায় আজকাল চলতেই পারে না। পঁয়ত্রিশেই বা সে যে কী করে চালায় ভেবে অনেকেই আশ্চর্য হয়েছে। তবু তাকে যেমন করেই হোক আরো পঁয়ত্রিশ টাকা বেশি রোজগার করতে হবে। নইলে গ্রামে তার মা-ভাই-বোনেরা তিল-তিল করে মরবে: শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক মৃত্যু।

. . . .

এই ট্রামরাস্তা ধরে তাকে সোজা এখন দক্ষিণ দিকে যেতে হবে। অনেকটা পথ। দোকানগুলো প্রায় মুখস্ত হয়ে গেছে। ইলেকট্রিকের দোকানের সুইচবোর্ডে কম-পাওয়ারের লাল বাল্‌বটা ঠিক জ্বলছে। প্রৌঢ় লোকটি একমুখ খোঁচা-খোঁচা দাড়ি নিয়ে ঝুঁকে পড়ে কী যেন লিখছে। কাপড়ের দোকানে অনেক নতুন শাড়ি এসেছে। ছাপা-শাড়ি আজকাল খুব চলে। উপর থেকে শাড়িগুলো পাশাপাশি ঝোলানো। ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। পছন্দ করে কিনতে হলে কোনটা সে কিনতো? জুতোর দোকানে ভালো একজোড়া মজবুত কাবলিজুতো আজ প্রায় তিন-মাস ধরে একই জায়গায় রয়েছে সাজানো। প্রত্যহই সেটাকে যেন আরো বেশি চকচকে দেখায়। জুতোটার বয়স বাড়ে না নাকি? মিষ্টির দোকানে টিনের সবুজ চাকতিটা ঠিক জায়গাতেই টাঙানো রয়েছে। তার উপর সাদা অক্ষরে লেখা: 'চিনি দধি'। নীচে খড়ি দিয়ে হাতে লেখা: 'দেড় টাকা সের'। পাশেই ওষুধের দোকান। আজ তালা বন্ধ। সেই দোকানের সিঁড়ির উপর উবু হয়ে বসে এক ভদ্রলোক: চুল পরিষ্কার করে আঁচড়ানো, ধুতি ও পাঞ্জাবি ধোপ-ভাঙা। পথের ধারের নাপিতকে ডেকে তিনি দাড়ি কামিয়ে নিচ্ছেন। পাশেই সিঁড়ির উপর নামানো শালপাতার ঠোঙায় নিশ্চয়ই মিষ্টি ও নোনতা খাবার রয়েছে। দু-টো দোকান পরে আর একটা কাপড়ের দোকান। সাইনবোর্ডে লেখা: 'অল্প লাভে অধিক বিক্রয় আমাদের উদ্দেশ্য।' অল্প লাভে অধিক বিক্রয় না অধিক লাভে অল্প বিক্রয়—কোনটা বেশি লাভজনক? মহিম বারবার মনে-মনে উচ্চারণ করতে লাগলো: অল্প লাভে অধিক বিক্রয় না অধিক লাভে অল্প বিক্রয়? অল্প বেতনে অধিক জীবন না অধিক বেতনে অল্প জীবন?

একটা ফুলের দোকানও আছে। বালতির মধ্যে অনেক রজনীগন্ধা, আশ্চর্য তাজা দেখাচ্ছে। লোকটা একমনে বেল ফুলের মালা গেঁথে

চলেছে। তার পাশের দোকানেই বিক্রি হচ্ছে পাঁঠার মাংস। তলায় রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে, উপর থেকে ঝোলানো রয়েছে দু-টো পাঁঠার মৃতদেহ। কেটে-কেটে সমস্ত দিন মাংস বিক্রি হয়েছে। এখনো দু-জন ক্রেতা সামনে দাঁড়িয়ে। অনাবৃত দেহ লুঙ্গিপরা জোয়ান লোকটা কাঠের পাটার উপর মাংস ফেলে ধারালো দা দিয়ে ক্ষিপ্র গতিতে কিমা তৈরি করছে।···তারপরেই রয়েছে একটা পানের দোকান। দোকানটা ছোটো। উপরে পান বিক্রি হচ্ছে, নীচে তিনজন লোক বসে অদ্ভুত ক্ষিপ্র গতিতে বিড়ি পাকিয়ে চলেছে। যে-লোকটা ফুলের মালা গাঁথ-ছিলো আর যারা বিড়ি পাকাচ্ছে তাদের ভঙ্গিতে রয়েছে একটা আশ্চর্য মিল। মহিম একটু অবাক হয়ে ভাবলো এতোদিন এটা তার চোখ এড়িয়ে গিয়েছিলো কী করে?···তারপরেই সেই বকুলগাছ। ঝড়ে রাশিরাশি ছোটোছোটো ফুল বিছিয়ে রয়েছে সমস্ত ফুটপাথের উপর। প্রতিদিনকার মতো তার তলায় সেই ফতুয়াপরা লোকটা এনামেলকরা গামলায় অতিরিক্ত মসলা দেওয়া বাসি ডিমের তরকারি নিয়ে রয়েছে বসে আর হিন্দুস্থানী লোকটা ঘর্মাক্ত শরীরে একমনে ভেজে চলেছে পেঁয়াজের ফুলুরি। এরপরেই মোড়। তারপর পূবমুখো চলতে হবে মহিমকে।

মোড়ের উপর ফুটপাথেই মহিম দাঁড়িয়ে রইলো। তার হাতে যেন অনেক সময়। সমস্ত দিন তার যেন কিছু করার ছিলো না। এখন যেন তার এই দুরন্ত বাতাসের স্বাদ গ্রহণ করা আর আকাশের ছেঁড়াছেঁড়া মেঘগুলোর দিকে চেয়ে থাকা ছাড়া অন্য কোনো কাজ নেই!

সূর্য অনেকটা নেমেছে। কিন্তু এখনো সেই আশ্চর্য আলোর অনেক দেরি।

পাশ দিয়ে ক্রমাগত লোক চলেছে। তাদের কাটাকাটা কথা মহিম চেষ্টা না করেও শুনতে লাগলো:

···মেয়ে পছন্দ হয়েছে তা হলে ?—হয়েছে কিন্তু·

···আর তিন হাজার ঢালতে পারলেই···

···একটা গামছার দাম সাড়ে-বারো আনা ?···

···পক্ষাঘাত হয়েছিলো···

···যুদ্ধ আরো চার বছর···

···আজকাল তো সবাই চাকরি···

···মেয়েটার আঁটো শরীর, আর···

···মিলিটরি লরি দিয়েই আমাদের শেষ করবে··

মোড় ছেড়ে মহিম পুবমুখো চলতে লাগলো। ট্রাম বাস আর মিলিটরি লরির ভিড় এ-পথে অনেক কম। গোলমালও কমেছে। চলতে গেলে গায়ে-গায়ে ধাক্কা লাগে না। ভালো জামাকাপড় পরা লোকের চলাচল এ-পথে। কোথায় এরা চলেছে কে জানে। হাসিহাসি মুখ : এদের কারুর মাথাতেই একটা ভোঁ-ভোঁ ভোঁতা শব্দ সর্বদা নিশ্চয়ই আর্তনাদ করে না।

এ-পথও ছাড়তে হোলো। খানিক উত্তরমুখে চলে আবার পূবদিকে চললো মহিম। সামনেই পুকুর। অনেক লোকের ভিড়। 'ওয়াটার-পোলো খেলা হচ্ছে। কৃষ্ণচূড়া গাছের ফাঁকে-ফাঁকে সূর্যের আলো ভেঙে ছড়িয়ে পড়েছে পুকুরের জলে। ভিজে বলটার পিছনে তিনজন সাঁতারু প্রাণপণে এগিয়ে চলেছে। দর্শকদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দিলো। খানিকটা জল ও চামড়ার বলটা পুকুর থেকে কয়েক হাত উপরে উঠলো। পরমুহূর্তেই চীৎকার শোনা গেলো : গো-ও-ও-ল।

কাঠের বেঞ্চে লোক নেই। সবাই খেলা দেখতে ব্যস্ত। মহিম

খালি বেঞ্চিটায় আরাম করে বসলো। একটু বিশ্রাম নেওয়া যাক। অনেকটা পথ হেঁটে এসেছে। তা-ছাড়া সূর্য অস্ত যেতে ও সেই আশ্চর্য আলোর বন্যায় সমস্ত সহর ভেসে যেতে এখনো তো দেরি রয়েছে। মহিম একটা বিড়ি ধরালো।

কতদিনকার চেনা এই পুকুর। যখন সে প্রথম হাঁটতে শেখে তখন থেকেই এখানে চাকরের সঙ্গে বেড়াতে আসতো। সবুজ রেলিঙের ফাঁক দিয়ে সেই লাল রঙের দোতলা বাড়িটা দেখা যায়। এই বাড়িতে সে জন্মেছিলো, তার বাবার জন্মও এই বাড়িতে। মহিমের ঠাকুদা এই বাড়ি তৈরি করিয়েছিলেন।

ষোল বছর আগে মহিমরা এই বাড়িতেই থাকতো। ওটা ছিলো তাদের নিজেদের বাড়ি। সে-সব দিনগুলির কথা স্পষ্ট তার মনে পড়ে। গত ষোল বছর ধরে যখনই এ-পথে গিয়েছে তখনই একটি বিষাদমধুর ভাব দোলা দিয়েছে তার মনকে।

…মহিমের বাবা এমনিতে ভালোমানুষ ছিলেন। দোষের মধ্যে ছিলেন অত্যন্ত খেয়ালী। সাধারণ বাঙালী ভদ্রলোকদের মতো সকালে বাজার করতেন, দুপুরে আপিস যেতেন, সন্ধেয় ছেলেদের পড়াতেন, মাঝেমাঝে স্ত্রীকে সিনেমাতেও যেতেন নিয়ে। শুধু একমাত্র তাঁর বাতিক ছিলো অসুখের। অসুখকে তিনি মৃত্যুর চেয়েও বেশি ভয় করতেন। এই অসুখের দুশ্চিন্তায় রাশি-রাশি ওষুধ নিজে খেতেন, পরিবারের সবাইকেই এক রকম জোর করে খাওয়াতেন। কারুর আপত্তি টিঁকতো না।

সে-রাত্রির কথা মহিমের স্পষ্ট মনে পড়ে। তখন সে থার্ড-ইয়ারের ছাত্র। ইণ্টারমিডিয়েটে স্কলারশিপ পেয়েছিলো। খুব উৎসাহ নিয়ে পড়াশুনো করছিলো বি-এ পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাস পেতেই হবে বলে। রাত প্রায় তখন দশটা। হঠাৎ মা-র আর্তনাদে সে ছুটে গেলো। দেখলো

তার বাবার চোখের দৃষ্টি কি রকম যেন উদভ্রান্ত: জানালার কাছে মেঝের উপর বসে। মহিমের মা প্রাণপণে তাঁকে চেপে ধরে রয়েছেন আর তিনি ঝাঁকিয়ে ফেলে দেবার চেষ্টা করছেন। মহিমকে দেখেই তার মা বলেছিলেন, "খোকা, শিগগীর জানলাটা বন্ধ করে ডাক্তার ডাকতে পাঠা।"

বিস্মিত হয়ে মহিম তাড়াতাড়ি জানালাটা বন্ধ করলো। পরে শুনেছিলো বেড়িয়ে ফিরে হঠাৎ তার বাবা খোলা জানালা দেখে বলেন, "ওগো, আমার বড় ভয় করছে। আমি কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারছি না। কেবলি মনে হচ্ছে ওই জানলার মধ্যে দিয়ে আমি পড়ে যাবো।" এই বলে তিনি হামা দিয়ে সেই জানালার দিকে এগিয়ে যান। চোখে উদভ্রান্ত দৃষ্টি

সে-রাত্রে ডাক্তার এলো। পরের দিনও এলো। সব নামকরা ডাক্তাররাই এসেছিলেন একে-একে। সারবার আশা কম সবাই জানালেন। মহিমের বাবা উন্মাদ হয়ে গেছেন। শোনা যায় মহিমের ঠাকুর্দার বাবাও ছিলেন উন্মাদ।

সেই রাত থেকে সুরু হোলো অন্য এক ইতিহাস। মহিমের বাবার চিকিৎসার জন্যে অনেক খরচ করা হোলো। বাড়িটা প্রথমে দেওয়া হোলো বন্ধক এবং পরে বাধ্য হয়ে করতে হোলো বিক্রি। আপিস থেকে মহিমের বাবা ইনভ্যালিড পেন্সেন পেলেন পঁয়ত্রিশ টাকার। মহিমের পড়াশুনো করাও হোলো বন্ধ। কলকাতায় খরচ চালানো দায়। তাই মহিমের মামার বাড়ির গ্রামে সবাইকে নিয়ে যাওয়া হোলো। ষোল বছর আগে তারা এই বাড়ি ছেড়েছে। মহিমকে ছাড়তে হয়েছে পড়াশুনো এবং খরচ চালাবার জন্যে একে-একে এতোগুলি চাকরি এখন করতে হয়।

শয়তানের কাছে কি মহিমকে তার আত্মা বিক্রি করতে হয়েছে? প্রথম-প্রথম সেই কথাই মহিমের মনে হয়েছিলো। আজকাল অনেকদিন

মনে হয়নি ! সবই অভ্যেস হয়ে যায়। শুধু মাথার ভিতরকার সেই একটানা ভোঁ-ভোঁ শব্দটা যে এখনো কেন অভ্যেস হয়ে গেলো না সে-কথা ভেবে মহিমের অবাক লাগে বৈকি !

সবুজ রেলিঙের ফাঁক দিয়ে তাদের দোতলা লাল বাড়িটা দেখে একবার যেন সে শিউরে উঠলো—গ্রামে থাকবার তিন বছর পরে তার ছোটো ভাই-এর ভূমিষ্ঠ হবার সংবাদের বীভৎসতায় যে-রকম সে শিউরে উঠেছিলো। তবু এ-ঘটনাও অভ্যেস হয়ে গেছে। আজ সে তো সমস্ত দিন ভেবেছে তাকে ইস্কুলে ভর্তি করার কথা। যেমন করেই হোক তাকে এই বাড়তি খরচের একটা উপায় করতেই হবে।

হাওয়ার জোরটা আরো যেন বাড়ছে। কৃষ্ণচূড়া গাছের তলাগুলো লাল ফুলে লাল হয়ে গেছে। হাতের বিড়িটা পুড়তে-পুড়তে কখন যে নিভে গেছে মহিম তা লক্ষ্যও করেনি। হঠাৎ আকাশের দিকে নজর পড়ায় চট করে বেঞ্চি ছেড়ে উঠলো। সেই আশ্চর্য আলোর আর দেরি নেই। সূর্য একেবারে নেমে গেছে। যে-কোনো মুহূর্তে সেই চাঁপা ও জাফরানী আলোয় সমস্ত সহর অপরূপ হয়ে উঠবে, রূপকথার দেশের মতো কয়েক মিনিটের জন্যে হয়ে উঠবে বিস্ময়কর।

এখনো ওয়াটার-পোলো শেষ হয়নি। দর্শকরা ক্রমশই উত্তেজিত হয়ে উঠছে। মহিম লোহার দরজা ঠেলে আবার পথে এসে পড়লো। সমস্ত মাথার মধ্যে একাধিক মাছি সেই ভোঁ-ভোঁ শব্দ করে চলেছে।—বলতেই হবে তাকে, যেমন করে হোক বলতেই হবে। সেই আশ্চর্য আলোর মধ্যে যে-কোনো দুঃসাহসের কাজ করা যায়।

বিড়বিড় করে সে বলতে লাগলো : অল্প লাভে অধিক বিক্রয়, না অধিক লাভে অল্প বিক্রয় ? অল্প বেতনে অধিক জীবন, না অধিক বেতনে অল্প জীবন ? অল্প আলোয় অধিক সাহস, না অধিক আলোয় অল্প সাহস ?

তাদের লাল বাড়িটা পেরিয়ে গেলো মহিম। কারা সে বাড়ি ভাড়া

নিয়েছে মহিম জানেও না। শুধু দেখে ছোটো প্যারামবুলেটারে একটি রুগ্ন শিশুকে বাড়ির সামনে ধীরে-ধীরে ঠেলে নিয়ে বেড়ায় এক বুড়ি ঝি।

বাড়িটা ছাড়িয়ে আরো মিনিট পাঁচেক হাঁটবার পর এক পেট্রোল পাম্পের ঠিক আগের একতলা বাড়ির কড়া নাড়লো মহিম। সে স্থির করে ফেলেছে তার মন। যে-মেয়েটি দরজা খুলে দিলো তার বয়স কত আন্দাজ করা কঠিন। হয়তো কুড়ি, হয়তো বা চব্বিশ। সাধারণ মিলের শাড়ি পরনে। গায়ে আধ-ময়লা ব্লউজ, খালি পা। কিন্তু তার উপরের ঠোঁট পাতলা, তলারটি ফোলা।

"হঠাৎ এখন যে? ভেতরে এসো?"

"এমনি এলুম। না-না ঠিক এমনি নয়," বলতে-বলতে মহিম দেখলো মেয়েটির মুখ এক অপরূপ আলোয় ঝলমল করছে, ঘরের ভিতরের রঙ হঠাৎ গেছে বদলে। চেনাই যায় না, মনে হয় যেন এক নতুন জগতে এলুম। ঈশ্বরকে অজস্র ধন্যবাদ, ঠিক সময়টিতে সে এসে পৌঁছেছে। সেই আশ্চর্য আলোয় সব কিছুরই রঙ গেছে বদলে।...এ এখন কলকাতা সহর নয়, যে কথা কইছে সে সামান্য কেরানী মহিম নয় যার আত্মাকে শয়তানের কাছে বিক্রি করা হয়েছে। সে আজ পায়নি তার উন্মাদ বাবার মৃত্যুসংবাদ। তাদের পরিচয়ও আজ ছ-বছরের নয়। আজ এই মুহূর্তে, এই শুভমুহূর্তে তাদের প্রথম শুভদৃষ্টি। তারপর তারা দুজন দুদিকে চলে যাবে। ভবিষ্যতে কোনোদিন কেউ আর কাউকে চিনবে না। তারা জানে না, চেনে না পরস্পরকে। অন্ধকার সমুদ্রের দুটি জাহাজের মতো তারা একবার শুধু কাছাকাছি এসেছিলো। ভবিষ্যতে আর কোনোদিন আসবে না।

একটা অদ্ভুত কাটা-কাটা স্বরে মহিম বলতে লাগলো, "আমাকে তুমি চেনো? চেনো না, কখনই চেনো না। যাকে চেনো না তাকে বিয়ে করবে কী করে? ছ-বছর ধরে তুমি মিথ্যে ভেবেছো আমাদের বিয়ে

হবে। আমিও মিথ্যে ভেবেছি: শেষে একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে। সব ঠিক হয় না। আমার বাবা মারা গেছেন, আজ খবর পেয়েছি। মাসে-মাসে আমাকে আরো পঁয়ত্রিশ টাকা বেশি পাঠাতে হবে।…আমার কথা বুঝতে পারছো? তুমি আর অপেক্ষা করে থেকো না। আমার আত্মা শয়তানকে বিক্রি করা হয়েছে।…শুধু একটা উত্তর দিতে পারো: অল্প লাভে অধিক বিক্রয় ভালো না অধিক লাভে অল্প বিক্রয়? না-না, অল্প বেতনে অধিক দিন বাঁচা ভালো, না অধিক বেতনে অল্পদিন?…"

বলতে-বলতে মহিম দেখতে পেলো মেয়েটির ঝলমলে মুখ যেন সিসের মতো বিবর্ণ হয়ে আসছে। মেয়েটিকে দেখাচ্ছে এখন একেবারেই সাধারণ। এমন কি তার উপরের ঠোঁট যে পাতলা আর তলারটি ফোলা সেটা পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে না ভালো করে। তার চোখের নীচের হাড়গুলো এখন আরো স্পষ্ট। তার গালের উপর কয়েকটি রেখা। ঘাড়ের কাছে ঘামে কতকগুলো চুল আটকে রয়েছে। মেয়েটিকে রীতিমতো একটি শুকনো সাধারণ মেয়ের মতো দেখাচ্ছে।

সেই আশ্চর্য আলো মন্ত্রবলে যেন একেবারে অদৃশ্য হয়েছে। মহিমের কেমন যেন ভয় করতে লাগলো। সে আর দাঁড়ালো না। হঠাৎ যেমন দরজা ধাক্কা দিয়েছিলো তেমনি হঠাৎ পথে নেমে এলো। তারপর হনহন করে চললো এগিয়ে।

খানিক চলার পরে একটি কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় সে থমকে একবার দাঁড়ালো। ঝড়টাও থেমেছে যে! আকাশে মেঘগুলো আর ছুটোছুটি করছে না। যেন থমকে দাঁড়িয়ে কিসের প্রতীক্ষা করছে। বাতাস একেবারেই হয়েছে বন্ধ। আবার সে ঘামতে সুরু করেছে।

প্রেসের কাছে যখন পৌঁছল তখন বেশ অন্ধকার। ঠুলিপরা আলোগুলো উঠেছে জ্বলে। মেঘের চাপে থমথম করছে চারিদিক। এই

আলোয় সমস্ত কলকাতা একটা কালো শয়তানের মতো চাপা হাসছে। এই শয়তানের কাছেই কি সে বিক্রি করেছে তার আত্মাকে?

এক কোণে তার বসার চেয়ার-টেবিল। অনেক প্রুফ স্তূপীকৃত। মহিম চুপচাপ সেখানে গিয়ে বসলো। প্রত্যহ যে-ভঙ্গীতে বসে ঠিক সেই ভাবে। কাজকে তার ভয় নেই। শুধু যদি মাথার ভিতরকার সেই মাছিটাকে বার করে দিতে পারতো!

একবার যেন মনে হয়েছিলো আজকের দিনটা অভূতপূর্ব। কিন্তু এমন আশ্চর্য ঘটনা কী-ই বা ঘটেছে! মহিমের উন্মাদ পিতার মৃত্যু হয়েছে এটা ঠিক। কিন্তু আসলে যে-কোনো দুটি মানুষের সঙ্গে সত্যিই কি কোনো সম্বন্ধ আছে? শুধু হয়তো কিছুদিন পাশাপাশি চলা, কিছুদিনের জন্যে চেনাশুনো। তাই-বা কতটা কে কাকে চিনতে পারে? নিজেকেই তো নিজে সে মাঝে-মাঝে চিনতে পারে না! সেই যে কলেজের ছাত্রটি আই-এ পাস করে উঠে-পড়ে পড়াশুনো করছিলো খুব ভালো করে বি-এ পাস করবে, এম-এ পাস করবে, বিলেত যাবে বলে—তাকেই কি আজ মহিম চিনতে পারে নাকি? কোনোদিন কি সেই ছেলেটির সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিলো যাদের ছিলো একটা লাল বাড়ি? তার বাবা একদিন ছিলেন, একদিন পাগল হয়েছিলেন, এতোদিন তো পাগল হয়েই ছিলেন বেঁচে। আজ তাঁর মৃত্যু-সংবাদ এসেছে। কিন্তু এমন কত লক্ষ-লক্ষ লোকের আজ মৃত্যু হয়েছে সমস্ত পৃথিবীতে — তাদের মৃত্যুসংবাদ তো মহিমের কাছে আসেনি। এলে সে কি বেশি অসুখী হোতো? নিশ্চয়ই না। কারণ প্রত্যহই লক্ষ-লক্ষ লোকের মৃত্যু হচ্ছে। সবাইকার জন্যে দুঃখিত হতে হলে বাঁচা যায় না—যেমন বাঁচা যায় না প্রত্যহই লক্ষ-লক্ষ মানুষের জন্মবার্তা শুনে আনন্দ প্রকাশ করতে গেলে।

মহিমের তবু তার বাবার কথাই মনে পড়তে লাগলো। দিব্যি তো সুস্থ ছিলেন। হঠাৎ কেন তাদের লাল বাড়ির দোতলার ঘরের জানালা

দেখে তিনি ভয় পেলেন ? কেন সেই জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ার জন্যে তাঁর আগ্রহ অত বেড়ে উঠেছিলো ?···প্রায় সাত মাস আগে মহিম তাঁকে শেষবার দেখেছে। ইস্টিশানের বাইরে শিরিষ গাছের ছায়ায় বসে বেল খাচ্ছিলেন। চুল উস্কো-খুস্কো, রুক্ষ, কাঁচাপাকা। দাড়িতে বেলের আঠা। অনাবৃত ময়লা দেহ। কোমরে একটা ময়লা কাপড় জড়ানো। শুধু চোখ-দুটো কয়লার মতো কালো আর সূর্যের মতো উজ্জ্বল। মহিমকে ইস্টিশানের ভিতর থেকে সুটকেস হাতে আসতে দেখেও দেখেননি প্রথমে। তারপর কি মনে করে উঠে দাঁড়িয়ে মহিমের আগে-আগে যেন পথ দেখিয়েই চলেছিলেন অত্যন্ত ভারিক্কি চালে। মহিম কয়েকবার কথা বলতে চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু কোনো ফল হয়নি।···তাঁর মৃত্যু হয়েছে। ভালোই হয়েছে। অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। অনেক দিন আগেই ঘটা উচিত ছিলো।

প্রেসের ম্যানেজারের অনেক বন্ধু-বান্ধব। সন্ধে থেকে তারা আড্ডা দিতে আরম্ভ করে। তুমুল আড্ডা চলে : চা-সিগারেট-তর্ক আর খিস্তি। রাত দশটা পর্যন্ত চলে। কোনো-কোনো দিন আরো বেশি রাত হয়। তাদের কথাবার্তা শুনতে-শুনতেও মহিম চমৎকার প্রুফের ভুল ধরতে পারে : কোথায় টাইপ ভাঙা, কোথায় বানান ভুল, কোথায় একারের বদলে আকার বসেছে—প্রায় কিছুই তার চোখ এড়িয়ে যায় না।

আজকেও আড্ডা বসেছে যথারীতি।

ঘোষকে সবাই ধরেছে ব্রডওয়েতে একদিন হোয়াইট-লেবেল খাওয়াতেই হবে। এক কোপে তিরিশ হাজার লাভ! সোজা কথা নাকি ?

ধরণী বিলেত-ফেরৎ। আপাতত কলকাতায় কোথায় যেন সাড়ে তিনশো টাকা পাচ্ছে। অবিবাহিত। ক্রমাগত সিগারেট টানে। ঠোঁটে সিগারেট আটকেই কথা বলে। সবসময় ভালো মেয়ে আর ভালো

চাকরির খোঁজে থাকে। টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে সে বলছিলো, "আর ভালো লাগে না—এবারে কমিউনিস্ট হয়ে যাবো। তাদের হাতে অনেক ভালো-ভালো মেয়ে আছে।"

ওদের হল্লা ক্রমাগতই উঠছে বেড়ে। মহিম একমনে খানিক প্রুফ দেখলো। তারপর প্রুফের উপর চোখ রেখেই হয়ে গেলো অন্যমনস্ক।··· কোথা থেকে এক আশ্চর্য জলস্রোতের শব্দ আসছে ভেসে। মেঘের মতো, সমুদ্রের মতো সে শব্দ। উদাস বেলাভূমি। বাতাসে ক্যাকটাসের ঝাড়ে বালি উড়ে পড়ছে। দক্ষিণের বাতাসে নীল-নীল সমুদ্র, শাদা আর বাদামী ফেনা। জলজ উদ্ভিদের গন্ধ বাতাসে রয়েছে লেগে। চিকচিক করছে তার দেহ সূর্যের আলোয়: কখনো সবুজ, কখনো নীল, কখনো রূপুলি কখনো চাঁপা রঙ। উদাস অথচ আত্মসচেতন, নির্জন অথচ মৃদঙ্গের গম্ভীর শব্দময়। এর তীরে দাঁড়ালে তুমি নিজেকে হারিয়ে ফেলো। সময়ের কথা যাও ভুলে। সময়কে জয় করেছে এই সমুদ্র। আর তার তীরে এসে দাঁড়িয়েছে একটি মেয়ে। তার চোখে ঝড়ের আভাস। উপরের ঠোঁট পাতলা, তলারটি ফোলা।···ওয়াস দিস্ দি ফেস···কোথায় যেন মহিম পড়েছিলো! কবে যেন পড়েছিলো! এই কি সেই মুখ: যার জন্যে সমুদ্রের বাতাসে হাজার-হাজার পাল একদিন উঠেছিলো ফুলে, পুড়েছিলো ট্রয়ের প্রাসাদগুলি? এই কি সেই মুখ?···ওয়াস্ দিস্ দি ফেস্? কবে যেন মহিম পড়েছিলো একদিন!

···এ-বছরেও দেখো আবার দুর্ভিক্ষ হবে। আরো মারাত্মক দুর্ভিক্ষ। কিন্তু সহরে থেকে তোমরা বুঝতে পারবে না। ভিখিরিদের সহরে আসার পথ বন্ধ। বাইরে তারা মরবে। তাদের খাবে শেয়ালে আর কুকুরে আর শকুনিতে···

···আমার দাঁতের নিন্দে করছো? জানো মেরিয়া কী বলেছিলো বিলেতে?···

…একটা সিগারেট দে তো…

…চা আনা। মাইরি তুই দারুণ কিপটে হচ্ছিস দিনকে দিন…

…তিন তাসে বসা যাক ?…

…মেয়েটার জ্বর। তাড়াতাড়ি ফিরবো…

…সেকেণ্ড ফ্রন্ট কবে খুলবে ভগবান জানেন! রাশিয়া কিন্তু জার্মানদের দূর করে দিয়ে চুপ মেরে বসে থাকবে। দে উইল সিট টাইট।…

…এ-বছরেই দেখো য়ুরোপিয়ান ওয়ার খতম।…

…কিন্তু জাপান ?…

…বেস্ট পোরশন অফ আওয়ার লাইফ এই যুদ্ধে খরচ হয়ে গেলো। মাই গড…

…যুদ্ধের পর আমি তো নিশ্চয়ই আর একবার বিলেত যাবো। উই শ্যাল রিপ দি হার্ভেস্ট। একটাও ছেলে থাকবে না। আর কত মেয়ে চাও ?…

ওয়াস দিস্ দি ফেস ? মহিম ভাবতে লাগলো, ওয়াস দিস্ দি ফেস ? জাফরানী আর চাঁপা রঙের আশ্চর্য আলোয় দেখলে বিশ্বাস হয় হয়তো এরই জন্যে একদিন জাহাজের পালে লেগেছিলো হাওয়া, পুড়েছিলো ট্রয়। কিন্তু সেই আশ্চর্য আলোর পরের মুহূর্তে যে দাঁড়িয়েছিলো তার রঙ সিসের মতো বিবর্ণ, চোখের নীচের হাড়গুলো স্পষ্ট, গালের উপর কয়েকটি রেখা: রীতিমতো একটি শুকনো সাধারণ মেয়ে। ওয়াস দিস দি ফেস ?

অন্ধকার পথে মেসে ফেরবার সময় মহিমের গতি ক্রমশ দ্রুত হয়ে আসতে লাগলো। বাইরে ঝড় থেমেছে কিন্তু সেই ঝড় কোন ফাঁকে পথ করে নিয়ে সেঁধিয়ে গেছে মহিমের মাথায়। এখন সেখানে কেবল আর ভোঁতা একটানা শব্দ নয়: হাজার-হাজার কথা ঝড়ের মতো ঘুরে

বেড়াচ্ছে। ক্রমশ লাল হয়ে উঠছে তার চোখ। মুখের ভিতর টাকরাটা শুকিয়ে গেছে, জিভটা জুতোর পুরোনো শুকতালার মতো। থমথমে মেঘের তলায় ঠোঙাপরা আলোর সমস্ত সহর তীক্ষ্ণ চাপা হাসি হাসছে: শয়তানের হাসি। এর কাছেই বাঁধা আছে মহিমের আত্মা। শুধু মহিমের নয় আরো কত সংখ্যাতীত মানুষের।

জোরে তীক্ষ্ণ আলো জ্বালিয়ে, রাস্তা কাঁপিয়ে কয়েকটা মিলিটারি লরি চলে গেলো। সার্চলাইট এসে পড়লো পথের পাশে মন্থরগতি মোষের গাড়ির উপর। চালক ঢুলছে। মোষগুলোর সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে, তাদের চোখ লাল। কিন্তু চাউনি উগ্র নয়: করুণ, ক্লান্ত, প্রায় মৃত। তাদের ঠোটের দুপাশে শাদা ফেনা ফোঁটা-ফোঁটা পড়ছে পিচের কালো পথের উপর। এই চাউনি মহিমের চেনা। তার বাবার চোখে এই চাউনিই সে দেখেছিলো!

···নেন মাস্টেরবাবু উঠে পড়ুন···কাল যদি আর একটু সকাল-সকাল ···নিশ্চয়, খুব চেষ্টা করবো···মেয়ে পছন্দ হয়েছে তা হলে···আর তিন হাজার ঢালতে পারলেই···একটা গামছার দাম সাড়ে বারো আনা?··· পক্ষাঘাত হয়েছিলো···যুদ্ধ আরো চার বছর···আজকাল তো সবাই চাকরি···মেয়েটার আঁটো শরীর, আর···মিলিটারি লরি দিয়েই আমাদের শেষ করবে···হঠাৎ এখন যে? ভেতরে এসো?···এমনি এলুম, নানা এমনি নয়···আমাকে তুমি চেনো?···আমার আত্মা শয়তানকে বিক্রি করা হয়েছে···অল্প লাভে অধিক বিক্রয়, না অধিক লাভে অল্প বিক্রয়? না-না, অল্প বেতনে অধিক দিন, না অধিক বেতনে অল্পদিন?···অল্প আলোয় অধিক সাহস, না অধিক আলোর অল্প সাহস?···ওয়াস দিস দি ফেস দ্যাট লঞ্চড এ থাউসেণ্ড শিপস···ওয়াস দিস দি ফেস···আবার দুর্ভিক্ষ···জানো মেরিয়া কী বলেছিলো?···একটা সিগারেট···চা আনা··· তিন তাসে বসা যাক···মেয়েটার জ্বর···সেকেণ্ড ফ্রন্ট···এ-বছরেই যুদ্ধ

শেষ···কিন্তু জাপান ?···যুদ্ধের পর আমি তো বিলেত যাবো···ওয়াস দিস দি ফেস···

মেসের তিন তলার ঘরের দরজা খুলে ঢুকেই প্রায় চীৎকার করে উঠলো মহিম। রাস্তার দিকের বড় জানালাটা খোলা রয়েছে কেন ? কী সর্বনাশ ! এই জানালা দিয়ে তার বাবা চলে গেছেন অন্য পৃথিবীতে, এই জানালা দিয়ে ঢুকেছে ঝড়, এসেছে আশ্চর্য আলো। এই জানালা তাকে টানে। এই জানালা মহিমকে তিনতলা থেকে ছুঁড়ে ফেলবে নীচের শান-বাঁধানো ফুটপাথে। চুরমার হবে তার হাড়গুলো। এ-জানালার দিকে সে চাইতে পারে না, চাইতে পারে না !

মেসের অন্য লোকেরা মহিমকে যখন ধরে ফেললো তখন সে হামা দিয়ে জানালাটার কাছে প্রায় পৌঁছেছে।